থিওডোর ড্রাইজারের

সিস্‌টার ক্যেরী

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

অনুবাদক

মিত্রালয়

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—চার টাকা—

মিত্রালয় : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি—১২ হইতে জি, ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও
মানসী প্রেস : ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট, কলি—৬ হইতে এস. এন্. ব্যানার্জী কর্তৃক মুদ্রিত।

ছোট্ট ট্রাঙ্ক, চামড়ার একটা হ্যাণ্ডব্যাগ আর হলদে রঙের একটা পার্স। এরই মধ্যে আছে ওর সব কিছু। সম্পত্তি বলো, পাথেয় বলো সব। পার্সটায় রয়েছে ট্রেনের টিকিটখানা, দিদির ঠিকানা লেখা একটুকরো কাগজ আর গোটা চারেক ডলার হাতখরচা।

চাকরী খুঁজতে চলেছে ক্যেরী চিকাগো সহরে। ক্যেরী; ক্যেরী ওর পুরো নাম নয়, ক্যেরোলিন মীবার। মা বাবা আদর করে ডাকতেন ক্যেরী বলে, ভাই বোনেরা ডাকতো ক্যেরী বোন্‌টি।

সময়টা ১৮৮৯ সালের আগষ্ট মাস। আঠারো বছরের ঝক্‌ঝকে ভীরু একটি মেয়ে। কীইবা তার অভিজ্ঞতা, কতটুকুই বা তার জ্ঞান? কিশোর-বয়সের মোহ আর কৌতূহল জড়ানো রয়েছে চোখে মুখে।

বিদায় নেবার মুহূর্তে কষ্ট লেগেছিলো বৈকি ওর। কিন্তু ভালো কিছু ফেলে যাবার দুঃখ তো সেটা নয়। মায়ের বিদায় চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে যে চোখ দুটো জলে ভরে এসেছিলো, বাবার কারখানাটার পাশ দিয়ে আসার সময় গলাটায় যে কী একটা ঠেলে ঠেলে উঠছিল, বহুদিনের চেনা শ্যামল গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে আসার সময় যে বেদনা জেগেছিল, সে শুধু ছোট বেলার সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার একটা তীক্ষ্ণ অনুভূতি মাত্র। সব কিছুই চিরকালের মত ভেঙে গেলো এবার।

এই তো পরের স্টেশন, পরেরটা, তারো পরেরটা, কতই তো রয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে করলেই তো সে ফিরে যেতে পারে। এইতো সামনে বড় শহরটাও বয়ে গিয়েছে। রোজ আনাগোনা করে এই ট্রেনগুলো সেখান থেকে এখানে, এখান থেকে সেখানে। এ শহরটা কত ঘনিষ্ঠ মনে হয়। কলাম্বিয়া কতদূরই বা? চিকাগো শহরেও তো সে আর একবার গিয়েছে। কয়েকটা ঘণ্টা, কয়েক শো মাইল মাত্র। এ আর কী এমন? দিদির ঠিকানা লেখা কাগজটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার আশ্চর্য্য লাগে।

বাইরের সবুজটা কত তাড়াতাড়ি পার হয়ে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ এসব ছেড়ে তার মনটা চলে গেল চিকাগোয়। কেমন লাগবে তার শহরটা? ভালো চাকরী

একটা পেয়ে যাবে কি-সে? কে জানে কেমন লোকগুলো শহরের। এলোমেলো ভাবনা।

আঠারো বছর বয়সে যখন কোনো মেয়ে বাড়ী ছেড়ে একা বেরোয় দু'রকম ঘটনাই ঘটতে পারে। হয় কোনো ভালো লোকের আশ্রয়ে এসে সে আরো ভালো হয়ে ওঠে, নয়তো চরম পন্থাটাই তাকে বেছে নিতে হয় ও দ্রুত অধঃপতনের পথে নেমে যায় সে। এই অবস্থার মাঝামাঝি কিছুর সম্ভাবনা নেই। হাজারো রকমের খেয়াল, ধূর্ত্তামি, আর ফাঁদ আছে শহরের। সহানুভূতি দেওয়ার, দয়া করার লোক ক'টা? কেউ কেউ প্রলুব্ধ করে মহৎ আবেগ-ভরা উচ্ছ্বাস দিয়ে। সে উচ্ছ্বাস হয়তো গভীর কোনো প্রণয়ীর অন্তরঙ্গ অনুভূতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আবার মোহময় দু'টো আবেগভরা চোখের চেয়ে হাজার বাতির জৌলুষও তো কম প্রলুব্ধকর নয়। মানুষেরই বা প্রয়োজন কী? তার চেয়েও বড় অনেক শক্তি আকর্ষণ করে সহজ অপাপবিদ্ধ মনকে। ধ্বনির একটা বিশাল তরঙ্গ, জীবনের গর্জ্জন, বিভিন্ন মানুষের বিরাট্ চলমান সমাজ, সব কিছুই ঘা দেয় অবাক মানুষের বোধ-শক্তিকে। হিতৈষী বন্ধুব সাবধান বাণী ছাড়া এই সবের প্রলোভন থেকে কে বাঁচিয়ে রাখবে? আসল রূপটী চিনিয়ে দেবে কে? এদের আপাত-সৌন্দর্য্যটা, সঙ্গীতের মতই ঝিমিয়ে আনবে তোমাকে, তারপর দুর্ব্বল করে ফেলবে, তারপর তোমার সহজ বোধশক্তি লোপ পেয়ে যাবে, বিষে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তুমি।

ক্যেরীর মনটা ছিল কাঁচা। দেখে শেখা বা বোঝার শক্তি তখনো তার আসেনি। নিজের স্বার্থটা সে বোঝে বেশী কিন্তু স্বার্থের ধারণাটাও তার খুব গভীর, মজবুত নয়। সে যাইহোক, নিজের স্বার্থ টাই তার কাছে আসল।

কিশোর বয়সের রঙীন কল্পনা, উঠন্ত যৌবনের মাধুর্য্য, আধফোটা দেহ সৌষ্ঠব, সরল বুদ্ধিতে উজ্জ্বল দুটো চোখ। এই নিয়ে ক্যেরী। দুই পুরুষ আগে দেশ ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটুকরো উদাহরণ যেন। লেখাপড়া বই পত্রে কোন আগ্রহ নেই ক্যেরীর। কী হবে বই পড়ে? জ্ঞান? কী লাভ হবে ওতে?

মেয়েদের সহজ সংস্কারে যে গুলো আসে সেভাব পর্য্যন্ত হয়নি ক্যেরীর।

কেমন করে মিষ্টি করে ঘাড় দোলাতে হয় তাও পর্য্যন্ত জানে না ও। হাত দু'টোও অভিনব করে তুলে ধরতে শেখেনি, ছোট্ট পা দু'টোও ওর সুন্দর করে পড়ে না। তা হলে কী হবে, তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ক্যেরী বেশ সজাগ। জীবনের গভীর আনন্দ সে বোঝে বৈকি, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উচ্চাশা সেও করে বৈকি। স্বল্প পুঁজি ওর। তাই নিয়েই ক্যেরী বেরিয়েছে রহস্যময় শহরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে। উপযুক্ত সাজসজ্জা না করেই যেন মধ্যযুগের কোন নাইট বেরিয়েছে বিজয় অভিযানে। চোখে তার আবছা স্বপ্নময় আকাঙ্খা, শহরটা তার পায়ে নিজেকে লুটিয়ে দেবে।

হঠাৎ তার কানের কাছে কে বললে:—উইস্‌কনসিনের একটা চমৎকার বেড়াবার জায়গা এটা।

ক্যেরী একটু সচকিত হয়ে উঠলো।—ও! তাই নাকি?

ট্রেনটা তখন ওয়াওকেশা ছেড়ে আসছে। কিছুক্ষণ থেকেই লোকটির উপস্থিতি ক্যেরী অনুভব করছিল। তার সুন্দর চুলগুলো যে লোকটি বেশ মনোযোগের সঙ্গে দেখছিল, সেটা ক্যেরী বুঝতে পেরেছিল আগেই। লোকটিকে একটু যেন অস্থির মনে হচ্ছিল ক্যেরীর, একটু আগ্রহও যেন জাগছিল তার লোকটির সম্বন্ধে।

প্রথমে অবশ্য সে চায়নি কথা বলতে। অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়াটা তার মত কিশোরী মেয়ের এক্ষেত্রে উচিত নয়। কিন্তু লোকটির এবিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে মনে হলো। একটা কী আকর্ষণী শক্তিও আছে যেন তার। ক্যেরীকে শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো।

ক্যেরীর সীটের পিছনে হাত দু'টো রেখে লোকটি ঝুঁকে এলো—হ্যাঁ, চিকাগোর লোকেরা এখানে খুব আসে বেড়াতে। হোটেল গুলো সব ভর্ত্তি হয়ে গেছে। আপনি বুঝি এদিকটা চেনেন না ঠিক?

—না। চিনি বৈকি। আমি কলাম্বিয়া সিটিতে থাকি, তবে ঠিক এখানে আসিনি কখনো।

—তা হলে, এই আপনি প্রথম চিকাগো যাচ্ছেন?

চোখের পাশ দিয়ে ক্যেরী দেখতে পাচ্ছিল ওর মুখের খানিকটা অংশ—

স্বাস্থ্যবান্ পুরুষের চক্‌চকে উজ্জ্বল মুখের একটা আভাস, একটা সুন্দর টুপি।
মুখ ফিরিয়ে সামনা-সামনি এবার ক্যেরী দেখলো লোকটিকে। আত্মরক্ষার একটা সহজাত বুদ্ধি আর দুষ্টুমি করার ইচ্ছেটা মাথার মধ্যে গোল পাকাচ্ছে ওর।

বাঃ আমি সে কথা বল্লাম কখন ?

মিষ্টি করে হেসে লোকটি বললো—ও আমি ভাবলাম, বুঝি—। যেন একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছে।

লোকটি বড় কোনো ফার্মের ভ্রাম্যমান্ এজেণ্ট। সে সময় লোকে বলতো, দালাল। লোকটিকে কিন্তু ঠিক দালাল বলা যায় না, একটু উঁচু দরেব সে। ১৮৮০ সাল থেকে এদের আর একটা নতুন নাম গজাচ্ছিল, রিপ্রেজেণ্টেটিভ, প্রতিনিধি। অল্পবয়সী বোকাসোকা মেয়েদের তাক লাগিয়ে দিতো এরা পোষাক পরিচ্ছদের বহরে আর অচার-ব্যবহারে কথা-বার্ত্তায়। লোকটির পরণে ছিল চেক্-প্যাটার্ণের উলের স্যুট, তখনকার দিনে নতুন উঠেছে। কোটের ভিতরদিকে দেখা যাচ্ছে সাদার ওপর গোলাপী ডোরাকাটা সার্টের শক্ত ইস্ত্রী। হাতাটা আটকানো আছে সোনার পাত দেওয়া দামী বোতাম দিয়ে, তার ওপর আবার একটা পাথর বসানো। আঙ্গুলে রয়েছে অনেকগুলি আংটি, বুকপকেটে ঝুলছে সোনার একটা ঘড়ি চেন।

যে ধরণের কাজ সে করে তার পক্ষে বেশ বুদ্ধিমান্ বলেই মনে হয় লোকটিকে। এতসব মিলিয়েও কি ক্যেরীর মনের ওপর কোন দাগ ফেলেনি সে ? ফেলেছে বৈকি, প্রথম বার দেখেই ক্যেরী অনুভব করেছে একটা আকর্ষণ।

এ ধরণের মানুষ দাগ কাটে কিসে ? ভালো পোষাকে, আর চেহারায়। সুবেশ স্বাস্থ্যবান্ সুন্দর চেহারা, আর—আর মেয়েদের ওপর একটা টান। আরো কী ? জীবনের কোনো সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না এরা, লোভও যে খুব আছে তা নয়। সুখ আনন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে বেড়ায়, তাতেই খুসী। রীতিটা খুব সহজ। প্রধানতঃ সাহস, এগিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস। তার সঙ্গে মেয়েদের সম্বন্ধে একটা তীব্র আকাঙ্খা, সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠবের প্রতি প্রশংসমান মনোভাব। কোনো যুবতী মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে সে চটকরে ভাব জমিয়ে ফেলবে, ধীরে ধীরে তাকে আয়ত্বেও আন্‌বে, থাক না তার মৃদু

আপত্তি। একটু প্রশ্রয় পেলেই সে হয়তো মেয়েটির স্কার্টটা বা হাতাটা ঠিক করে দেবে। আরো একটু, দেখবে মিস্ ছেড়ে বাপমার দেওয়া নাম ধরে ডাকতে শুরু করেছে। হয়তো দেখবে বড় দোকানে সে কাউণ্টারের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে। বিশেষ কোনো সামাজিক পরিবেশে, স্টেশনে বা ওয়েটিং রুমে একটু ধীরে চলে সে। আগে বুঝে নেয় মেয়েটি কেমন, তারপর হয়তো দিনটা কেমন তাই নিয়ে আলাপ শুরু করবে, তারপরে হয়তো হাত ধরে রেষ্টুরেণ্ট-কারে নিয়ে যাবে। অথবা তা যদি নেহাৎ না পারে, তবে পাশের সীটটায় গিয়ে বসবে। রাস্তায় যেতে যেতে কতটুকু এগোনো যায় দেখা যাক না। বালিশটা ঠিক করে দিতে পারে, ব্যাগটা খুলে দিতে পারে, লাইটটা নামিয়ে দিতে পারে, কত কিছুই তো করার রয়েছে। মেয়েটি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেলে সেও যদি না নেমে পড়ে, বুঝতে হবে হেরে গেছে। সুবিধা হবে না এখানে বুঝে নিয়েছে।

পেষোকের দর্শন সম্বন্ধে মেয়েদেরই কারো বই লেখা উচিত। যত অল্প বয়সীই হোক্ না কেন, যতটুকু সে বোঝে, তার মধ্যে পোষাকটাই বোধ হয় প্রধান। মানুষের পোষাকে কী যেন একটা মাপ কাঠি থাকে, দেখেই ওরা ঠিক করে নেয় কাকে আরো একটু ভালো করে দেখা যায়, কাকে উপেক্ষা করা চলে। কারো কারো পোষাকে আরো কী একটা থাকে, মেয়েরা নিজেদের পোষাক সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ক্যেরীর এবার তাই হলো। মনে মনে সে অনুভব করে তার পোষাকটা ওই লোকটির তুলনায় কিছুই নয়। কালো বর্ডার দেওয়া সাদা-মাটা নীলরংয়ের পোষাকটা তার যাচ্ছেতাই মনে হচ্ছে। জুতো জোড়াটাও তো কত পুরোনো।

লোকটি কিন্তু জমাতে চায়—আপনাদের শহরে তো আমি অনেককেই চিনি। ওইযে বড় কাপড়ের দোকান আছে মর্গেনরথ, গিব্‌সন—

ক্যেরীর মনে ভেসে উঠলো মর্গেনরথ কোম্পানীর শো-কেস। কী লোভই না লাগতো ওর চমৎকার পোষাকগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

ও তাই নাকি? কোরী বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

এতক্ষণে লোকটি যেন খেই ধরতে পেরেছে। এরপর আর শক্ত কী! কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল ক্যেরীর পাশাপাশি এসে বসেছে সে।

পোষাক বিক্রীই তো ওর চাকরী। গল্প করে সে তার পোষাক বিক্রীর কাজের আর দেশভ্রমণের কাহিনী শোনায়। তারপর আসে চিকাগোর কথা। চিকাগো শহরের হাজার মজার গল্প শোনায় সে ক্যেরীকে।

'আপনি তো যাচ্ছেনই। দেখবেন, খুব ভালো লাগবে। আপনার কোনো আত্মীয় আছেন নাকি ওখানে?'

ক্যেরী বলে, আমি দিদির কাছে যাচ্ছি।

লোকটি বলে, লিঙ্কন পার্ক আর মিচিগানের বুলেভার্ড অবশ্য দেখবেন যেন। বিরাট্ বিরাট্ বাড়ী তৈরী হচ্ছে ওখানে। দ্বিতীয় নিউইয়র্ক বানাবে ওরা। ওঃ, কত কী যে দেখার আছে। থিয়েটার, সিনেমা, কতরকমের লোক। কী ভীড়, ঠাসাঠাসি মানুষ, চমৎকার চমৎকার বাড়ী—বাগান, পার্ক, আপনার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।

লোকটির বর্ণনা অনুযায়ী কল্পনা করতে করতে ক্যেরীর মনে কোথায় একটু বেদনা বোধ হচ্ছিল। এত বিরাট্ বিশালের মধ্যে তার স্থান কোথায়? কত ক্ষুদ্র, কতো ছোট সে। তারপক্ষে অভিযানটা খুব আনন্দের হবে না বোধ হয়। তবু লোকটি যে সব চমকপ্রদ আশার কথা বলে যাচ্ছিল তার মধ্যে কিছুটা সান্ত্বনা পায় বৈকি সে। এই সুবেশ পুরুষটি তার সম্বন্ধে এত আগ্রহশীল, এতে কি খুসী হবার কিছু নেই?

লোকটি যখন বললো ক্যেরীকে দেখে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর কথা তার মনে হচ্ছে, ক্যেরী হাসলো। অত বোকা সে নয়। কিন্তু এই আগ্রহের দাম আছে বৈকি তার কাছে।

আলাপটা এখন সহজ হয়ে এসেছে। লোকটি বললো, আপনি চিকাগোতে কিছুদিন থাকবেন তো এখন, না?

উদাসীনভাবে ক্যেরী বললো—ঠিক নেই কিছু।—যদি চাকুরী না জোটে তার? হঠাৎ এই অশুভ সম্ভাবনাটা মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে তার।

ক্যেরীর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটি বললো—ক' সপ্তাহ আছেন তো নিশ্চয়ই?

শুধু কথার কথা নয় আরো কিছু যেন অর্থ আছে এর। সৌন্দর্য্য ছাড়াও

আর একটা যে কিছু আছে৹ ক্যেরীর, সেটা বুঝতে ওর কষ্ট হয়নি। ক্যেরীও বুঝতে পেরেছে এক বিষয়ে সে লোকটির আগ্রহের বস্তু। সেটা কী? সেটা চায়ও মেয়েরা, আবার ভয়ও পায়। তার নাম নেই। অত্যন্ত সহজ তার ভঙ্গী সরলতার ব্যবহার। মেয়েরা কেমন করে তাদের আসল ভাবটা লুকোয়, সে শিক্ষা যে তার হয়ই নি। সে যা করলো, কারো কারো কাছে সেটা অসম-সাহস। বুদ্ধিমতী কোন সঙ্গী তো তার নেই। কে বলে দেবে তাকে, কোনো পুরুষের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কখনো তাকিও না।

—কেন? একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন আপনি?—ক্যেরী বললো।

—আমি কয়েক সপ্তাহ থাকবো তো চিকাগোয। আমাদের নতুন মাল সব দেখে নিতে হবে, নমনা বাছতে হবে। তাই বলছিলাম আপনাকে আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবো।

—সেটা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারছি না। মানে আমি আপনার সঙ্গে বের হতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না। দিদির কাছে থাকবো তো—আর—

—ওহ্ হো, তাতে কী হয়েছে? সে আমরা ঠিক করে নেবো এখন।

ছোট পকেট বইটা বের করে, পেন্সিল হাতে নিয়ে সে বললো—আপনার ঠিকানাটা বলুন তো। যেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

পার্সটা হাতড়ে ক্যেরী ঠিকানা লেখা কাগজটা বের করলো।

প্যাণ্টের পকেট থেকে লোকটি বার করলো একটা মোটা পার্স। রাজ্যের টুকরো কাগজ, ছোট্ট বই, আরো কতো কী সব। ক্যেরীর অবাক লাগে। তার সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত যারা ভাব করতে চেয়েছে, তাদের কারো এত বড পার্স ছিল না। এমন একজন অভিজ্ঞ কাজের লোকের এত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আর কখনো সে আসে নি। মোটা পার্সটা, চক্‌চকে জুতো জোডা, দামী স্যুটটা, তার চাল চলন ভঙ্গী সব কিছু মিলিয়ে ক্যেরী একটা উজ্জ্বল সুখী ভবিষ্যতের আশা গডে তুললো—সে ভবিষ্যতের কেন্দ্র এই লোকটি। লোকটি যা করে তাই ওর ভালো লাগে।

পরিষ্কার একখানা কার্ড বের করলো সে। ঝকঝকে করে এনগ্রেভ করা আছে তাতে—বার্টলেট ক্যারীও এণ্ড কোম্পানী। বাঁপাশে নীচের দিকে, সি, এচ, ড্রুয়েট্।

কার্ডখানা ক্যেরীর হাতে দিয়ে তার নামটা দেখিয়ে সে বললো—এইটা আমার নাম। উচ্চারণ কিন্তু ড্রুয়েট্ নয়, ড্রুয়ে। আমার পূর্ব্ব পুরুষদের বাড়ী ছিলো ফ্রান্সে।

ড্রুয়ে পার্স'টা গুছিয়ে রাখলো। ক্যেরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কার্ডখানা।

কোটের পকেট থেকে একখানা লেটার হেড বার করে ড্রুয়ে এবার ছবিটা দেখিয়ে বলে—এই যে ছবিটা দেখছেন না, আমার কোম্পানীর বাড়ী, স্টেট্ আর লেকের কর্ণারে।—কথাটা বললো সে বেশ গর্ব্বের সঙ্গে। এমন একটা বাড়ীর সঙ্গে জড়িত থাকা গর্ব্বের কথা বৈকি? ক্যেরীরও তাই মনে হলো।

—হ্যাঁ, আপনার ঠিকানাটা?—পেন্সিলটা তুলে নিয়ে ড্রুয়ে শুধালো।

ক্যেরী ওর হাতটার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে—ক্যেরী মীবার। ৩৫৪ ওয়েষ্ট ভ্যান্ ব্রুয়েন স্ট্রীট। কেয়ার এস. সি. হ্যান্সন্।

ধরে ধরে লিখলো সে ঠিকানাটা। তারপর পার্স'টা আবার বের করে বললো—সোমবার রাত্তিরে যদি আমি আসি বাসায় থাকবেন তো?

ক্যেরী বললো—বোধ হয় থাকবো।

আমরা যা ভাবি আর অনুভব করি কথায় তার কতটুকু প্রকাশ হয়? শোনা যায় না দেখা যায় না এমন সহস্র অনুভূতি আর বাসনাগুলোকে বেঁধে বেঁধে অর্থ সৃষ্টি করে এই ধ্বনি তরঙ্গ। ও মনে মনে কী ভাবছে অপর লোকটি কী নিশ্চিতভাবে তা বুঝতে পারে? তার প্রলোভন কতখানি সফল হয়েছে ড্রুয়ে বুঝতে পারে না। ঠিকানাটা দিয়ে ফেলার আগে পর্য্যন্ত ক্যেরীও জানতে পারে নি সে তলিয়ে যাচ্ছে। এখন সে বুঝলো সে ধরা দিয়ে ফেলেছে, ড্রুয়েও বুঝলো সে জিতেছে। ওরা দুজনেই অনুভব করছে যে জড়িয়ে পড়েছে তারা। ড্রুয়ের কথাগুলো সহজ। ক্যেরীর ভঙ্গীটাও সহজ, যেন ছেড়ে দিয়েছে সে নিজেকে।

চিকাগোর কাছে এসে পড়েছে ওরা। চারিদিকে তার স্পষ্ট ঘোষণা। একটার পর একটা ট্রেণ চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘন ঘন টেলিগ্রাফের তার দেখা যাচ্ছে। পোস্টগুলো যেন পা ফেলে ফেলে বিরাট্ শহরটার দিকে এগিয়ে চলেছে। চিমনীর ধোঁয়া উঠছে আকাশ বেয়ে।

শহরতলীর আভাস। দু'তিন তলা বাড়ীর কাঠামো মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে; সামনের অসংখ্য বাড়ীগুলোর অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির মতো মনে হচ্ছে।

শিশুর কাছে, শিল্পীর কাছে বা যে আগে কখনো দেশভ্রমণ করেনি তার কাছে কোনো বড় শহর চোখে দেখার আগের মুহূর্তটা আশ্চর্য্য অনুভূতি আনে। আর যদি সে মুহূর্তটা হয় আলো আঁধারের সন্ধিক্ষণ, যখন জীবনটা একঠা সুর থেকে আর এক সুরে বদলে যাচ্ছে তবে তো কথাই নেই। আঃ রাত্রি আসছে সামনে। শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষের কাছে কী তার আবেদন। কতো আশা, কতো আকাঙ্ক্ষা না ঘনিয়ে আসে মনে। সারাদিনের পরিশ্রান্ত মানুষের মন বলে, 'এই তো আমার বিশ্রাম আনন্দের সময় এগিয়ে এলো। খুসী মানুষের ভীড়ে এবার এক হয়ে যাবো আমি। সজীব আলোকোজ্জ্বল রাস্তাঘাট, সান্ধ্য আহারের হাতছানি, এসব আমারো, আসবে তো! সিনেমা-থিয়েটার, সান্ধ্য সমাবেশের নাচ-গান, বিশ্রম্ভালাপ এসবের মধ্যে আমিও তো এক হয়ে যেতে পারবো এবার।' তখনো হয়তো কারখানার অফিসে কাজ শেষ হয়নি। কিন্তু এই অনুভূতিটা নাড়া দিয়ে যাচ্ছে মনকে। কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই যে মানুষের সেও কিছু একটা অনুভব করে, কাজের ভারটা তো এবার নামলো মাথা থেকে!

ক্যেরী জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলো। তার অনুভূতিটা ড্রুয়ের মনকেও বোধ হয় স্পর্শ করেছে। সে-ও নতুন আগ্রহ নিয়ে শহরটাকে দেখ্‌ছে, ক্যেরীকে দেখিয়ে দেখিয়ে চিনিয়ে দিচ্ছে।

ড্রুয়ে একসময় বললো—দেখেছেন, কী বিরাট্‌ হচ্ছে শহরটা। অনেক কিছু দেখবার আছে এখানে।

কথাগুলো ক্যেরী শুনলো না ভাল করে। ওর মনে একটা ভয় ভয় করছে। এত বড় একটা জনসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলেছে সে একা একা! বুকটা দুড়দুড় করে ওর, দমটা যেন বন্ধ হয়ে আসছে। চোখ বুজে সে ভাবতে চেষ্টা করে, এতো ভয় পাবার কী আছে? এই তো কলাম্বিয়া শহরটা কত দূরই বা?

দরজটা হঠাৎ খুলে গেল। কে একজন চেঁচিয়ে বলে ওঠে চিকাগো! চিকাগো! আরো তাড়াতাড়ি লাইনগুলো মিশ্‌ছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। ঘট্‌ ঘট্‌ ঘটাং শব্দ উঠছে ঘন ঘন। জিনিষপত্রগুলো ক্যেরী গুছিয়ে নিতে শুরু

করে, ছোট্ট পার্স টা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে জোরে। ড্রুয়ে উঠে পা দু'টো ঝাড়া দিয়ে ট্রাউজারটা ঠিক করে নিলো, তারপর নিজের ব্যাগটা তুলে নিয়ে বললে—

' আপনার কেউ লোক আসবে তো নিশ্চয়ই। দিন্ আপনার ব্যাগটা আমাকে।

—না না থাক্। দিদির সামনে এখুনি আপনার সঙ্গে, এক সঙ্গে—ঠিক হবে না।—ক্যেরী বিব্রতভাবে বলে।

—আচ্ছা, বেশতো। আমি অবশ্য কাছে কাছেই থাক্‌ছি। যদি তিনি না আসেন, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো, কেমন ?

ক্যেরী অভিভূত হয়ে বলে—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

এবার সেই লোকটি টেনে টেনে বললো, চি-কা-গো। শেডের তলায় ট্রেনটা ঢুকছে ধীরে ধীরে। অন্য যাত্রীরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে ভীড় করছে।

দরজার কাছে এসে ড্রুয়ে এবার বললো—এসে গেলাম আমরা। আচ্ছা, সোমবারে আবার দেখা হবে।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে। শেক্‌হ্যাণ্ড করে ক্যেরী বললো—আচ্ছা।

—আপনার দিদি না আসা পর্য্যন্ত আমি দেখছি কিন্তু, ভুলে যান্‌নি তো ?

ক্যেরী শুধু হাসলো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, তারপর নামলো একা একা। রোগা অত্যন্ত সাধারণ গোছের এক মহিলা ক্যেরীকে দেখে এগিয়ে এলেন।

—ক্যেরী, এসেছিস্। মহিলাটি ক্যেরীকে জড়িয়ে ধরলেন, স্থূল আপ্যায়নের ভঙ্গীতে।

স্নেহমায়া হৃদয়াবেগের অভাবটা ক্যেরীর বুঝতে একটুও দেরী হলো না। এই নুতন, তীব্র কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সে বুঝতে পারলো, কঠিন বাস্তবের রূঢ়তা। হাসিখুসী, আনন্দ-গানের জগৎ নয়, কঠোর জীবন সংগ্রামের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায় ওর দিদির চেহারায়, আচরণে, ভঙ্গীতে।

দিদি বললেন—কেমন আছে সব বাড়ীতে ? মা-বাবা ভালো আছেন তো ?

উত্তর দিলো বৈকি ক্যেরী, কিন্তু ওর দৃষ্টিটা দিদির দিকে নেই। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ড্রুয়ে, পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। চোখাচোখি হতে ড্রুয়ে

একটু হাসলো, সেটা শুধু ক্যেরীই দেখেছে। ডুয়ে চলে যেতে ক্যেরীর মনে হলো কিছু একটা হারিয়ে গেছে ওর।

দিদির সঙ্গে বড্ড একা একা লাগছে।

উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে সে যেন ভাসছে একটি মোচার খোলার মতো।

দুই

ভ্যান্ ব্রুয়েন স্ট্রীটটা শ্রমিক আর গরীব কেরাণীদের পাড়া। মিন্নিদের ফ্ল্যাট্‌টা চারতলায়। সামনের জানালা দিয়ে রাস্তাটা দেখা যায়; রাত্রিরে মুদিখানার দোকানে বাতি জ্বলে, তারই আলোয় খেলা করে ছেলেরা। ক্যেরীর কাছে ঘোড়ার গাড়ীর ঠুনঠুন্ আওয়াজটা বেশ মিষ্টি লাগে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্যেরীর আশ্চর্য্য লাগে লোকজন, গাড়ী ঘোড়ার চলা ফেরা, সব জড়ানো অদ্ভুত একটা কোলাহল, মাইলের পর মাইল ছড়ানো এই শহরটার গুঞ্জন ধ্বনি।

আপ্যায়নের প্রথম পর্ব্বটা শেষ হতে ক্যেরীর কোলে ছেলেটাকে দিয়ে মিসেস হ্যান্সন্ রান্নাঘরে চলে যান খাওয়ার জোগাড় করতে। মিন্নির স্বামী দুএকটা সাধারণ প্রশ্ন করে আবার ডুবে যান খবরের কাগজখানা মধ্যে। কথাবার্ত্তা কম বল্লেন হ্যান্সন্। হ্যান্সনের বাবা ছিলেন সুইডিশ, উনি কিন্তু জন্মেছেন এখানেই। কাজ করেন স্টক-ইয়াডে। রেফ্রিজারেটর গাড়ীগুলো ঠিকঠাক পরিষ্কার রাখাই ওঁর কাজ। স্ত্রীর বোন পাশে বসে আছে কি নেই, তা নিয়ে ওঁর কিছুই যায় আসে না। ক্যেরীর চেহারাটার ওঁর কাছে কোন মূল্যই নেই। চিকাগোতে কাজ পাওয়া যাবে কিনা এটাই একমাত্র চিন্তা ওঁর।

হ্যান্সন্ বল্লেন—মস্ত বড় শহর এটা। একটা কিছু পেয়ে যাবে মনে হয়। সবাইতো পায়।

ক্যেরী যে চাকরী করে খাওয়া থাকার খরচটা দেবে, এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। হ্যান্সন্ বড় হিসেবী মানুষ। এরমধ্যেই ওয়েষ্ট সাইডে দুটো জমি কেনার জন্য মাসে মাসে কিস্তি শোধ করে যাচ্ছেন—একদিন একটা বাড়ী তুলবেন।

ক্যেরী ফ্লাট্‌টাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। আর সব মেয়ের মতোই

ওরও সহজাত বুদ্ধিটা তীক্ষ্ণ। অল্পক্ষণের মধ্যেই সংকীর্ণ জীবন যাত্রার ইতিহাসটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো ওর কাছে। কৃচ্ছতার ছাপ আঁটা আছে দেওয়ালে, মেঝের ফার্ণিচারগুলোয়। নোংরা সস্তা জোড়াতালি দেওয়া নগণ্য তুচ্ছ সব কিছুই।

রান্নাঘরে গিয়ে বসলো সে ছেলেটাকে নিয়ে। ছেলেটা কাঁদতে শুরু করলো এবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে ভোলাতে লাগলো সে ছেলেটাকে। কাগজ পড়ার ব্যাঘাত ঘটায় হ্যান্‌সন্ উঠে এসে ছেলেটাকে কোলে নিলো। ছেলেটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে হ্যান্‌সন্ বলে, এই যে এই যে, কী হয়েছে কী হয়েছে? লক্ষীটি, সোনা আমার।

বেশ ধৈর্য্য আছে তো? ছেলেটাকে খুব ভালোবাসে হ্যান্‌সন্। একটা মস্তবড় গুণ বৈকি? ক্যেরী ভাবে।

খেতে বসে মিন্নি বলে, শহরটা তো দেখবি আগে তুই—চল্ রবিবারে লিঙ্কন পার্কটা দেখাবো তোকে।

ক্যেরী লক্ষ্য করলো, হ্যান্‌সন্ কিছুই বললেন না, এ সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবছে সে।

ক্যেরী বললো,—আমি তো ভাবছি কালই বেরিয়ে পড়ি। শুক্রবার শনিবার দুটো দিন রয়েছে, বসে থেকে কি হবে? অফিস কারখানাগুলো কোনদিকে সব বলতো।

মিন্নি বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছিলো, হ্যান্‌সন্ বাধা দিয়ে নিজেই শুরু করলো—এই দিকটায় মানে পূবদিকে। তারপর চিকাগো শহরটার প্ল্যান বোঝাতে লাগলো সে, এত বড় বক্তৃতা বোধ হয় হ্যান্‌সন্ আর কখনো দেয় নি। শেষে বলল—তুমি বরং ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রীটে বড় বড় কারখানাগুলোর খোঁজ নাও। অনেক মেয়ে কাজ করে ওখানে। আর এখান থেকে কাছেও হবে, আসা যাওয়ার সুবিধে।

ক্যেরী ঘাড় নাড়লো। তারপর দিদির কাছে পাড়াটার গল্প শুনতে লাগলো। মিন্নি খুব আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলো। হ্যান্‌সন্ ছেলেটাকে খেলা দিতে দিতে এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে তাকে মায়ের কোলে দিয়ে বলে উঠলেন—

সকাল সকাল উঠতে হবে আমাকে, শুতে যাচ্ছি আমি।—তারপর সটান অন্ধকার ঘরটার মধ্যে মিশিয়ে গেলো।

—স্টক-ইয়ার্ডে কাজ করেন তো, সেই সাড়ে পাঁচটায় উঠতে হয়। মিন্নি যেন কৈফিয়ৎ দেয়।

ক্যেরী জিজ্ঞাসা করে, তুমি ক'টায ওঠো? মিন্নি বলে, এই প্রায় পাঁচটা কুড়িতে আর কি?

দুজনে মিলে কাজ সেরে নেয় ওরা। ক্যেরী লক্ষ্য করে মিন্নি কেমন যন্ত্রচালিতের মতো করে সব কিছু। দিনের পর দিন খাটতে খাটতে এমনি হয়ে গেছে।

ক্যেরী বুঝতে পারে ড্রুয়েরর সঙ্গে সম্পর্ক তাকে ছাড়তে হবে। হ্যান্‌সন্ আর মিন্নির ভাবভঙ্গী, ফ্ল্যাট্‌টা, সব কিছুই তাকে বলে দিচ্ছে, শুধু পরিশ্রম করা ছাড়া আর কিছুরই স্থান নেই এখানে।

না, ড্রুয়ে এখানে আসতে পারে না।

মিন্নি শুতে গেলে ড্রুয়েকে লিখলো সে—আপনি এখানে আসবেন না। আমি না বলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবেন দয়া করে। দিদির বাসাটা ভীষণ ছোট্ট।

আর কি লেখা যায় চিঠিতে? ট্রেনে আলাপের কথা সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌বে না কি? না, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। শেষ পর্য্যন্ত কোন রকমে ড্রুয়ের দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিটা শেষ করলো সে। কিন্তু নামটা সই করার আগে কী লিখবে? 'আপনার বিশ্বস্ত' লিখে অনেকক্ষণ ভাবলো সে। না বড্ড কাঠখোট্টা হয়ে গেল। সেটা কেটে দিয়ে শেষে শুধু নামটা সই করেই চিঠিটা এঁটে ফেললো সে। তারপর জানালার ধারে চেয়ারটা টেনে নিয়ে রাতের চেহারা দেখতে লাগলো। অনেক পরে ভাবতে ভাবতে পরিশ্রান্ত হয়ে এক সময় সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো ক্যেরীর, তখন আটটা। হ্যান্‌সন্ বেরিয়ে গেছে, মিন্নি বসে বসে সেলাই করছে খাওয়ার ঘরে। সেটাই তো আবার বসবার ঘরও। নিজের ব্রেকফাস্টা নিজেই তৈরী করে খেয়ে নিলো ক্যেরী। তারপর দিদিকে জিজ্ঞাসা করলো কোন দিকে বেরোবে সে। মিন্নির কতো

পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে এখন। লম্বা রোগা খাটিয়ে চেহারার সাতাশ বছরের একটি মহিলা। জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা তার স্বামীর চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে।

ক্যেরীকে সে এখানে আসতে লিখেছিল ওকে ভালোবেসে কাছে রাখার জন্য নয়। বাড়ীতে ক্যেরীর ভালো কাজ ছিল না বরং এখানে এসে একটা চাকরী বাকরী করলে তার থাকা খাওয়ার খরচটা তো দিতে পারবে ও মিন্নিকে। ওকে দেখে খুসী হয়েছে বৈকি সে, কিন্তু কাজের সম্বন্ধে সে তার স্বামীর কথাটাই ভাবছিল।

টাকা পাওয়া গেলে যে কোন চাকরীই হোক্ না কেন, সবই ভালো। প্রথম প্রথম পাঁচ ডলার, তাই মন্দ কি? নতুন মেয়ের পক্ষে দোকানের চাকরী একমাত্র সহজলভ্য। বড় কোন একটা দোকানে ঢুকে পড়বে সে, তারপরে একরকম করে চলতে থাকবে, তারপর একটা কিছু। একটা কিছু কি? পদোন্নতি? না সে কথা তারা ভাবে না।

বিয়ে? না তাও নয়। এমনি করেই চলবে আর একটা বড় কিছু না ঘটা পর্য্যন্ত। এখানে এসে এত পরিশ্রম কষ্ট করার পুরস্কার একদিন না একদিন সে পাবেই।

এমনি একটা আশার কথা ভাবতে ভাবতে ক্যেরী কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লো।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি চিকাগোর তখন উন্নতির-যুগ সবে শুরু হয়েছে। দ্রুত একটার পর একটা ব্যবসা গড়ে উঠছে। অফিস কারখানা বাজার বেড়েই চলেছে। সে সময়ে মেয়েদের পক্ষে একটা চাকরী খুঁজে নেওয়া খুব শক্ত ছিল না। আশাহত আর উচ্চাভিলাষী সবাই আসতো চিকাগোয় ভাগ্যান্বেষণে। পাঁচলক্ষ অধিবাসী, পঁচাত্তর বর্গ মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে চিকাগো সহরে। শুধু ব্যবসা নয়, শিল্প সমৃদ্ধির সম্ভাবনাই ডেকে আনতো হাজার হাজার মানুষকে। আরো আরো বড় হবে চিকাগো, সেই আগামী দিনের পদধ্বনি শোনা যেত মিস্ত্রী মজুরের হাতুড়ীতে, রাস্তাঘাটের প্রসারে, রেল লাইনের পত্তনে। সহরতলী ছাড়িয়েও মাঠের মাঝে মাঝে তারই আভাস।

শহরের মাঝখানে বড়ো বড়ো দোকান পসার, অফিসের ভীড়। চাকরী খুঁজতে যারা আসতো তারা ঘোরাফেরা করতো এই অঞ্চলেই। ফার্ম্মগুলোর সব নিজের নিজের বাড়ী ছিল, তখনো তো এত জমির অভাব হয় নি। শো-রুমে কাঁচের বড় বড় দরজা জানালা তখন সবে উঠেছে। ঝক্‌ঝকে করে মাজা কাঁচের জানালা দিয়ে অফিসগুলোকে বেশ জমকালো মনে হতো। নতুন কোন লোকের ভয়ই করবে, ফার্ম্মগুলোর দিকে তাকিয়ে।

ভয়ে ভয়ে ক্যেরী এইদিকেই এগোলো। ভ্যান্ ক্রয়েন স্ট্রীট ধরে চলতে চলতে একসময় ক্যেরী দেখলো কয়লা গুদামের কাছে এসে পড়েছে সে, তারপরেই নদীটা। সাহস করে এগোলো ক্যেরী, চাকরীতো একটা পেতেই হবে তাকে। দ্রুত চলা যায় না, নতুন নতুন পরিবেশটাকেও তাকিয়ে দেখতে হয় বৈকি। এই বিরাট্ বিরাট্ বাড়ীগুলো কিসের? এত লোকজন ইলেট্রিকের যন্ত্রপাতি এসব কিসের জন্য? কলাম্বিয়ার পাথর খোদাইয়ের বিস্তীর্ণ কারখানা তার চেনা আছে, তার একটা অর্থ পাওয়া যায়; কিন্তু বিরাট্ বিরাট্ পাথর যখন ট্রাক বোঝাই হয়ে, ক্রেনে চড়ে চলে যায়, তখন তার মানে খুঁজে পায় না ক্যেরী।

রেলইয়ার্ড-টাও কী অদ্ভুত বড়ো। কী হবে এতো এতো মালগাড়ী দিয়ে, কারখানাটার মধ্যে এতো অসংখ্য লোকই বা কী করছে? বড়ো বড়ো রাস্তাগুলো দেওয়ালে ঘেরা রহস্যের মতো মনে হয়, বিশালকায় অফিসগুলো যেন এক একটা ধাঁধা। কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষের হাতে এর চাবিকাঠি কে জানে? এখানকার লোকেরা বোধ হয় শুধু টাকা গোনে, ভালো ভালো পোষাক পরে, আর গাড়ীতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। এছাড়া ক্যেরী আর কিছু ভাবতে পারে না এদের সম্বন্ধে। কিসের ব্যবসা ওদের, কী বা ওদের করতে হয়, আর কেমন করেই বা টাকা আসে, এসব সম্বন্ধে ক্যেরীর কোন ধারণা নেই। অস্পষ্ট আব্ছা আব্ছা একটা আঁচ করে নেয় শুধু। এতো বিরাট, বিশাল আশ্চর্য্য সব কিছু ধরা ছোঁয়ার বাইরে! ক্যেরী দমে যায়। এই বিশাল অফিসের কাছে একটার মধ্যে ঢুকে গিয়ে চাকরী চাইতে হবে তাকে—কিছু একটা, যাহোক কিছু দিন্ আমাকে! সাহস হারিয়ে ফেলে ক্যেরী, বুকটা ওঠানামা করে অস্বাভাবিক ভাবে।

তিন

নদীটা পার হয়ে অফিস কোয়ার্টারে এসে পড়ে ক্যেরী এদিক ওদিক দেখে। কোন্ দরজায় ঢুকবে সে? বড় বড়ো জানালা আর জমকালো সাইন-বোর্ডগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ক্যেরী বুঝতে পারে, তার দিকে লোকে তাকাচ্ছে। ওরা বুঝে নিয়েছে সে চাকরী খুঁজতে বেরিয়েছে। আর কখনো এমন কাজ করেনি সে, সাহস হারিয়ে ফেলে ক্যেরী। চাকরী খুঁজতে বেড়ানোর মধ্যে এক ধরণের লজ্জা আছে। ক্যোরী তাড়াতাড়ি পা চালায়। না, এসব দেখছে না সে, নিজের কাজে যাচ্ছে। এমনি ভাবে এগিয়ে যাব ক্যেরী একটার পর একটা অনেকগুলো অফিস। কোনটার দিকে ভালো করে তাকানোই হলো না। অনেকগুলো ব্লক পেরিয়ে এসে মনে হলো, না এমন করে তো চলবে না। চলার গতিটা না কমিয়েই সে তাকাতে লাগলো আবার। খানিক দূরে গিয়ে একটা বড় গেট নজরে পড়লো। কী জানি কেন ওর মনে হলো, এখানটায় চেষ্টা করা যেতে পারে। ছোট্ট পিতলের একটা ট্যাবলেট। এটাইতো দরজা। হয়তো ওদের লোকের দরকার আছে। রাস্তাটার এপারে এলো সে, দেখা যাক্ না। ছাই রঙের চেক সার্ট গায়ে একজন যুবক জানালা দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে। এখানকারই কেউ কিনা ঠিক বুঝতে পারে না ক্যেরী। কিন্তু লোকটা যে তার দিকেই তাকাচ্ছে! ক্যেরী আবার সাহস হারিয়ে ফেলে। ভীষণ লজ্জা করে, তাড়াতাড়ি পা ফেলে পালিয়ে যায় ও। রাস্তার ওপাশে ছ'তলা একটা বাড়ী নজরে পড়লো আবার। কী যেন নামটা? স্টর্ম এণ্ড কিং। আবার কেন যেন আশা জাগে ওর। অনেক মেয়ে কাজ করে তো, ওপরের তলায় ওইতো ওদের দেখা যাচ্ছে। এখানে একবার চেষ্টা করবেই সে। রাস্তা পার হয়ে সোজা দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ক্যেরী। দুজন লোক বেরিয়ে এলো ঠিক এই সময়, আর একজন টেলিগ্রাফ পিওন ঢুকে গেল ভেতরে। তারপর দ্রুতবেগে সিঁড়িগুলো টপ্‌কে মিলিয়ে গেল ওপর তলায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে ক্যোরী তখনো ভাবছে, ঢুকবে তো। কয়েকজন লোক চলে গেল পাশ দিয়ে। অসহায়ভাবে তাকাতে লাগলো সে। তারপর বুঝতে পারলো সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। নাঃ ভীষণ শক্ত কাজ, ওর দ্বারা হবে না। পা চালিয়ে এগিয়ে গেল সে আবার।

এতবড় একটা পরাজয়ে ভীষণ দমে গেল ক্যোরী। যন্ত্র চালিতের মত পাগুলো পড়ছে তার, তবু ভালো লাগছে যেন ওখান থেকে পালিয়ে আসতে। একটার পর একটা ব্লক পার হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার কোণে কোণে স্ট্রীট্ ল্যাম্পের গায়ে লাগানো নামও পড়ে যায় সে—ম্যাডিসন, মন্‌রো, লা স্যাল, ক্লার্ক, ডিয়ারবর্ণ, স্টেট্—তবু চলেছে সে এগিয়ে। পা দুটো ব্যথা করছে এবার। রাস্তাগুলো কী পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে। সকালবেলাকার রোদটা আস্তে আস্তে কড়া হয়ে উঠছে। ছায়াই বরং ভালো লাগছে এখন। আকাশের দিকে তাকালো সে। আঃ কী চমৎকার আকাশটা। এর আগে কোন দিন আকাশকে এতো ভালো লাগেনি ক্যোরীর।

ভয় পেয়ে পেছিয়ে এসে তার খারাপ লাগছিল, আবার ফিরলো সে, নাঃ স্টর্ম্স এণ্ড কিং-এ একবার চেষ্টা করবেই সে। যেতে যেতে রাস্তায় পড়ে একটা বড়ো জুতোর দোকান। ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে ভিতরকার অফিসটা। পার্টিশনের বাইরে বসে আছেন এক বুড়ো ভদ্রলোক, একটা মোটা লেজার খাতা নিয়ে। দোকানটার আশেপাশে অনেকক্ষণ ঘুরলো ক্যোরী। কেউ দেখছে না তো! দরজার পর্দ্দাটার কাছে এগিয়ে গেল সে শেষ পর্য্যন্ত, তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বুড়ো ভদ্রলোকটি বললেন,—কী চাই আপনার বলুন?

ক্যোরী যেন তোতলা হয়ে গেছে। থেমে থেমে কোন রকমে সে বলে—আমি, মানে আমি বল্‌ছিলাম, আপনাদের কোনো লোকের দরকার আছে?

ভদ্রলোক সহানুভূতির স্বরে মৃদু হেসে বলেন,—এখুনি তো নেই কিছু। এখন নয়, পরে আসবেন এক সময়। সামনের হপ্তায় একবার খোঁজ নেবেন। মাঝে মাঝে লোকের দরকার হয় বৈকি?

ক্যোরী নিঃশব্দে গ্রহণ করলো জবাবটা। তারপর বোকার মত চলে এলো

আর কোন কথা না বলেই। বুড়ো ভদ্রলোক এতো মিষ্টি করে কথা বললেন! ক্যেরীর আশ্চর্য্য লাগে। না, এ-তো শক্ত তেমন নয়। সে ভেবেছিল খেঁকিয়ে উঠবেন হয়তো, অথবা গম্ভীর কর্কশ কিছু একটা বলবেন। সে যে চাকুরী খুঁজতে বেরিয়েছে, একজন কৃপার পাত্রী মাত্র, কৈ সে রকম তাচ্ছিল্য করে তো কথা বললেন না উনি। তাকে যে লজ্জায় মিশিয়ে যেতে হয় নি চাকরী চাইতে গিয়ে, এটা কি কম কথা?

এখন খানিকটা সাহস হয়েছে কোরীর। আর একটা বড় বাড়ী দেখে ঢুকে পড়লো সে। কাপড় জামা পোষাকের ব্যবসা এদের। অনেক লোক দেখা যাচ্ছে রেলিং-এর ওপাশে। সুবেশ সুন্দর সবাই। চল্লিশের ওপরে বয়স নিশ্চয়ই ওঁদের।

একটা অল্পবয়সী চাপরাশী এগিয়ে এলো—কাকে চান আপনি?

ক্যেরী বলে, ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।

চাপরাশীটা গিয়ে খবর দিলো ওদিকের টেবিলটায়। একজন এগিয়ে এসে গম্ভীর ভাবে বললেন,—কী চান্ আপনি?

কথা বলার ধরণেই ক্যেরীর সাহস উড়ে গেছে। কোন রকমে সে বললো, —আপনাদের কোনো লোক দরকার আছে?

লোকটি সুধু একটি কথা উচ্চারণ করলেন, 'না'। তারপর গট্‌গট্ করে ফিরে গেলেন নিজের টেবিলে।

বোকার মতো ক্যেরী বেরিয়ে গেলো। চাপরাশীটা দরজাটা টেনে ধরলো সসম্মানে। ক্যেরী ভীড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে যেন বাঁচলো লজ্জার হাত থেকে। একটু আগে বেশ ভালো লাগছিল তার, হঠাৎ একটা সাংঘাতিক ঘা খেলো।

খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ালো সে। কতোই অফিস কতোই তো কারখানা, কিন্তু ক্যেরীর আর সাহস নেই। ভরা দুপুর, ক্ষিদেও পাচ্ছে এবার। ক্যেরী একটা ছোটখাট রেষ্টুরেণ্ট দেখে ঢুকে পড়লো। কিন্তু কী দাম জিনিষের? এক বাটি সুপ্ খেয়ে ক্যেরী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। খানিকটা জোর পাচ্ছে এখন, সাহসটাও একটু বেড়েছে।

কোথায় খোঁজ নেওয়া যায়? চলতে চলতে আবার সেই স্টর্ম এণ্ড কিং-এর কারখানাটা এসে গেলো। এবার সে ঢুকে পড়লো জোর করেই। কাছেই

কয়েকজন ভদ্রলোক কথা বলছেন, কিন্তু কেউ গ্রাহ্য করলেন না ওকে। মেঝের দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে এমনি সময় রেলিঙের ওপার থেকে একজন ডাকলো ওকে।

—কার সঙ্গে দেখা করতে চান আপনি?

—এই, যে কেউ আমি মানে—কোনো চাকরী খালি আছে কিনা জানতে চাই।

ক্যেরীর উত্তরে লোকটি বললো—ও, আপনি মিঃ ম্যাক্‌মানাস্‌কে চান তাহলে? আচ্ছা বসুন ওখানে।—পাশের দেওয়ালের ধারে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলো সে। তারপর আবার লিখে যেতে লাগলো।

খানিক বাদে ছোটখাট বলিষ্ট চেহারার এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন বাইরে থেকে। লোকটি তাঁকে ডেকে বললো—মিঃ ম্যাক্‌মানাস্‌, এই মহিলাটি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন ক্যেরীর দিকে। ক্যেরীব পোষাকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন একটু আশ্চর্য্য হয়েই তিনি বল্লেন—

আপনার জন্যে কী করতে পারি বলুন?

ক্যেরী উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে, বললো—কোনো চাকরী আপনাদের এখানে খালি আছে কি?

—কী ধরণের কাজ বলুন।

—কোনো বিশেষ কিছু নয়। যাহোক্ কিছু।

—ক্যেরী থতিয়ে গিয়ে বলে।

মিঃ ম্যাক্‌মানাস্ এবার জিজ্ঞাসা করেন—ড্রাই-গুড্‌সের কোনো কারখানায় আগে কাজ করেছেন কি?

—আজ্ঞে না।

—স্টেনোগ্রাফি বা টাইপরাইটিং জানা আছে?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে আমাদের এখানে কিছু নেই। কাজ জানা লোকের দরকার আমাদের।

দরজার দিকে পা বাড়ালো ক্যোরী। ওর করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে হয়তো ম্যাক্‌মানাসের দয়া হলো—আচ্ছা, এর আগে কী কাজ করেছেন আপনি?

—আগে কোন কাজ করিনি আমি। ক্যোরীর যেন কান্না পায়।

—তাহলে তো আমাদের মতো বড় হোলসেল ব্যবসায় আপনি চাকরী পাবেন না। আচ্ছা বড় দোকানগুলোয় চেষ্টা করেছেন?

ক্যোরী ঘাড় নাড়ে, না।

ওর দিকে সদয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ম্যাক্‌মানাস্‌ বলেন—আমি হলে ওখানে চেষ্টা করতাম। ওদের মাঝে মাঝে কেরাণীর বা সেল্‌স-গার্লের দরকার হয়।

ম্যাক্‌ম্যানাসের সদয় আচরণে ক্যোরী আবার ভরসা পায়। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সে দরজার দিকে পা বাড়ায়। ম্যাক্‌ম্যানাস্‌ বলেন, হঁ্যা, ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে চেষ্টা করুন, পেয়ে যাবেন।—তারপর অফিসের ভিতরে ঢুকে যান।

'ডেলি নিউজে'র বিজ্ঞাপন থেকে ক্যোরী কয়েকটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের নাম জেনেছিলো। এবার সেগুলোকেই খুঁজতে লাগলো। খোঁজা মানে এদিক ওদিক ঘোরা। মনে মনে আশা হঠাৎ হয়তো পেয়ে যাবে এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে। শেষে এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করে নিলো ক্যোরী। দু'টো ব্লক এগিয়ে গেলে 'দি ফেয়ার'।

বিভিন্ন ধরণের খুচরো জিনিষ এক একটা ডিপার্টমেণ্টে। কতো কেরাণী, কতো শপ্‌-গার্ল, ব্যস্ত-সমস্ত মানুষের ভীড়। পোষাক, স্টেশনারী, গহনা, কী ঝক্‌ঝকে করে সাজানো গোছানো মন মাতানো হাতছানি কাউণ্টারে কাউণ্টারে। আহা! ওই হারটা কেমন মানাতো ওকে, ওই পোষাকটায় কেমন দেখাতো তাকে? ক্যোরীর মনে জাগে কথাগুলো, কিন্তু দাঁড়ায় না সে। সুন্দর সুন্দর স্লিপার, নরম মোজাগুলো, স্কার্ট, পেটিকোট, ফিতে, চিরুণী, পার্স। সব কিছুই সে চায়, কিন্তু তার পার্সে কীই বা আছে? কোনো কিছুই কিনতে পারে না সে। সে তো চাকরী খুঁজতে এসেছে। যে কেউ তার চেহারা দেখে বলে দেবে বেকার মেয়েটা চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নার্ভাস, ভাবপ্রবণ একটা মেয়েকে নির্দয়ভাবে কঠোর জীবন সংগ্রামের

মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে একথা যেন কেউ না ভাবে, ক্যোরীকে দেখে। ক্যোরী তা নয়। সব মেয়েরই নিজের সাজগোজ সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে।

সুন্দর সুন্দর পোষাকগুলোর দিকে তাকিয়ে ক্যোরীর কষ্ট হয়। তার নয়, এসব তার নয়। যে সব সুবেশা মহিলারা এগুলো কিনছে তাদের প্রতি ঈর্ষ্যাও অনুভব করে ক্যোরী। শহরের মেয়েদের সম্বন্ধে ক্যোরীর ধারণা স্বল্পই। এমন কি দোকানের কাউন্টারে যে মেয়েগুলো কাজ করছে তাদের পোষাকও তার চেয়ে অনেক ভালো। অনেক দুরস্ত, চট্‌পটে, অনেক সুন্দর ওরা। তাদের কাছে ক্যোরী কী? কতো স্বাধীন বেপরোয়া, তাইতো এমন সাবলীল স্বচ্ছন্দ হতে পারে ওরা। ওর দিকে চোখ পড়লে ওদের চোখের একটা ভঙ্গী ওর নিজের গেয়ো চেহারা আর পোষাক সম্বন্ধে সজাগ করিয়ে দেয় ক্যোরীকে, মনে করিয়ে দেয় সে কী, কেন এসেছে এখানে। ঈর্ষ্যা জাগে মনে মনে। অস্পষ্ট ধারণা জাগে শহরে কী আছে?—ঐশ্বর্য্য, ফ্যাশান, আরাম, মেয়েদের সবকিছু কামনার বস্তু।

ভালো পোষাক আর সৌন্দর্য্যের জন্যে ক্যোরীর মনটা আকুল হয়ে ওঠে।

অফিসটা হলো তেতালায়। শুধিয়ে শুধিয়ে ক্যোরী উঠে গেলো। তার আগে থেকে আরো অনেক মেয়েরা এসে বসে আছে সেখানে। কিন্তু তার মতো কেউ নয়। স্বচ্ছন্দ সহজ ভঙ্গী, শহরের মেয়ে এরা। এরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ক্যোরীকে। ক্যোরীর অস্বস্তি লাগে।

প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট পরে এর ডাক পড়ে। জানালার ধারে ডেস্কের ও পাশ থেকে একটা লোক চট্‌পট্‌ জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ, এর আগে কোথায় কাজ করেছ?

—না, স্যার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা বলে—ও! করোনি কখনো।

—না, স্যার।—ক্যোরী আবার বলে।

—কাজ জানা চট্‌পটে মেয়ে দরকার আমাদের এখন। তোমাকে দিয়ে হবে না।

ক্যেরী দাঁড়িয়ে থাকে, ইণ্টারভিউটা শেষ হয়ে গেল কিনা বুঝতে পারে না সে।

লোকটি চেঁচিয়ে ওঠে এবার—দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখ্ছো না ভীষণ ব্যস্ত আমরা?

ক্যেরী তাড়াতাড়ি পা চালায় দরজার দিকে।

লোকটি বলে—দাঁড়াও তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও, মাঝে মাঝে লোক দরকার হয় আমাদের।

ক্যেরী যখন রাস্তায় এসে নামলো ওর চোখ দু'টো জলে ভরে উঠেছে। এই মাত্র যে ধাক্কা গেলো সেটার জন্য নয়। সারা দিনটাই কী গ্লানির মধ্যে দিয়ে কাটলো ওর। পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে, কান্না পাচ্ছে, দমে গেছে সে। আজ আর কোথাও চেষ্টা করবে না ক্যেরী। এলো মেলো ঘুরে বেড়ায় সে। রাস্তার ভীড়ে মিশে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

এমনি চলতে চলতে সে এসে গেলো জ্যাক্‌সন্ স্ট্রীটে। দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ দিয়ে যেতে যেতে এক টুকরা কাগজে আঁটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো ওর। 'প্যাকিং ও সেলাই-এর জন্য কয়েকজন মেয়ে চাই।' এক মুহূর্ত ভাবলো সে, তারপর ঢুকে গেল।

স্পিগেলহীম কোম্পানীতে ছেলেদের হ্যাট তৈরী হয়। গোটা তিন তলাটাই ওদের। কিন্তু বড় অন্ধকার মনে হয়, মেশিন আর বেঞ্চিতে ঠাসা ওদিকটা। অনেকগুলো মেয়ে আর কয়েকটা পুরুষ কাজ করছে ওখানে। তেল-কালি ধূলো মাখা মেয়েগুলোকে কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে, পোষাকগুলোও কী বিশ্রী, জুতোগুলোও আধা ছেঁড়া। অনেকেরই হাত গোটানো, আবার কেউ কেউ গরমে বুকের কাছটা খুলে দিয়েছে। শপ্-গার্লদের সবচেয়ে নীচু শ্রেণী বোধ হয় এরা। বোকা-সোকা ঢিলে-ঢালা বিবর্ণ কতকগুলি মেয়ে। ভীরু বা লাজুক নয় কিন্তু। কৌতূহল, সাহস আর অশ্লীলতা-প্রীতি তিনটেই তীব্র এদের।

ক্যেরী চারিদিকে তাকিয়ে দেখে, ভীষণ খারাপ লাগছে। এখানে কাজ করতে চায় না সে। শুধু আড় চোখে তাকাচ্ছিল মেয়েগুলো তাতেই অস্বস্তি লাগে ওর। তাকে কেউ গ্রাহ্যই করে না। একজন ফোরম্যান্ এগিয়ে এলো—

—তুমি কি আমাকে চাও।

সোজাসুজি কথা বলাটা শিখে ফেলেছে, ক্যেরী বলে—লোকের দরকার আছে আপনাদের ?

ফোরম্যান্টি প্রশ্ন করে—টুপি সেলাই করতে জানো তুমি ?

—না।

—এরকম কাজ আগে কখনো করেছ ?

—না।

কান চুলকোতে চুলকোতে একটু ভেবে ফোরম্যান্ বলে—

সেলাই-এর জন্যে একজন মেয়ের দরকার। কাজ জানা চাই। নতুন কাউকে কাজ শিখিয়ে নেওয়া তো সম্ভব নয়।

একটু থেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে সে আবার বলে—তোমাকে অবশ্য ফিনিসিং-এর কাজে একটা লাগিয়ে দিতে পারি।

লোকটির সহজ কথাবার্ত্তায় ক্যেরী একটু ভরসা পায়, সাহস করে বলে ফেলে—সপ্তাহে কতো করে দেন আপনারা ?

—সাড়ে তিন।

মোটে ?—কথাটা বেরিয়ে আসছিল মুখ থেকে, ক্যেরী সামলে নিলো।

লোকটি অন্যমনস্কভাবে বলে, লোকের ঠিক দরকার নেই···আচ্ছা তুমি সোমবার এসো। কাজে একটা বসিয়ে দেবো।

ক্যেরী যেন ক্যেরী নয়, একটা কাঠের বাক্সকে দেখছে এমনি ভাবে কথা-গুলো বলে লোকটা।

ক্যেরী আস্তে আস্তে বলে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—যদি আসো একটা য়্যাপ্রন সঙ্গে এনো। কথাটা বলে লোকটি চলে গেলো। নামটাও জিজ্ঞেস করলো না ক্যেরীর।

কারখানাটার চেহারা দেখে আর মাইনে শুনে ক্যেরী খুব আঘাত পেয়েছে। কিন্তু সারাদিনের এই হয়রানির পর একটা যে কিছু পেয়েছে এটাই কি কম কথা ? মনে মনে ভাবে সে। তবু এখানে চাকুরী করবে একথা ভাবতেই পারে না ক্যেরী। গ্রামের মাঠ-ঘাট খোলা জায়গায় মানুষ এই ঘিঞ্জি নোংরা

কারখানার পরিবেশ কেমন করে সহ্য করবে সে? এখানকার মেয়েগুলো কেমন রুক্ষ বেপরোয়া, ওদের মনটাও নিশ্চয় এমনি নীচু। কিন্তু একটা চাকরী তো দিতে চেয়েছে ওরা। একদিনেই যখন একটা চাকরী জুটে গেছে, তাহলে চিকাগো শহরটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ নয়। পরে আর একটা ভালো চাকরী পাওয়া খুব শক্ত হবে না।

পরের অভিজ্ঞতাগুলো কিন্তু খুব ভরসা দিল না ওকে। যেগুলো তার পছন্দ হয়, ভদ্র ঝকৃঝকে চেহারার বলে, সেখান থেকে কঠিন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে হয়। অন্য জায়গায় শুধু কাজ জানা লোক চায়। সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেলো কোট্‌ তৈরীর এক কারখানায়। খুঁজে খুঁজে পাচতলা পর্য্যন্ত উঠেছিল সে। রুক্ষ মোট্‌কা ফোরম্যান্‌টা যেন তেড়ে উঠল—না, না, কোন লোক-টোক চাই না আমাদের, ভাগো এখান থেকে।

বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার আশা, সাহস, শক্তি সব কিছু ফুরিয়ে আসে। এত আপ্রাণ চেষ্টা করলো সে, এর চেয়ে ভালো আর কিছু জুটলো না? পরিশ্রান্ত মন নিয়ে সে অনুভব করে বিশাল বিরাট্‌ এই অফিসগুলো। কত কঠোর, কত নির্ম্মম উদাসীন। ওদের দরজাগুলো তার কাছে বন্ধই থাকবে। ওখানে ঢোকার জন্যে যে সংগ্রামের প্রয়োজন, তার শক্তি নেই ক্যেরীর। এদিক ওদিক তাকায় সে আর কোথা চেষ্টা করা যায়। কোন দরজাতেই ঢোকার সাহস হয় না।

অবসন্ন মনে ক্যেরী এবার পশ্চিম দিকে চল্‌তে শুরু করে। এই দিকেই তো মিন্নিদের বাসাটা। ফিফ্‌থ্‌ এভিনিউ দিয়ে যেতে যেতে হোল্‌সেল একটা জুতোর কারখানা পড়ে। জানালা দিয়ে দেখা যায় মাঝারি বয়সের এক ভদ্রলোক ছোট্ট একটা টেবিলের ধারে বসে আছেন। পরাজিত হতাশ লোকের মনেও এক এক সময় হঠাৎ একটা বেপরোয়া ভাব জেগে ওঠে। ক্যেরী দরজা খুলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ভদ্রলোকটির সামনে। ওর শ্রান্ত চেহারাটার দিকে তাকিয়ে লোকটির বোধ হয় একটু কৌতূহল জেগেছে।

—কী চাও তুমি বলো।

ক্যেরী বলে—আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন কোনো?

সদয় কণ্ঠেই বলেন ভদ্রলোকটি — কাজ? ঠিক বলতে পারছি না তো। কী কাজ চাও তুমি? তুমি কি টাইপরাইটিং জানো? জানো না বোধ হয়?

—না। ক্যোরা জবাব দেয়।

—দেখো, আমাদের এখানে শুধু তো হিসেবের কাজ জানা লোক না হয় টাইপিস্টের দরকার। তুমি এক কাজ করো, ওপাশে চলে গিয়ে উপরে উঠে যাও। কদিন আগে ওরা লোক খুঁজছিল। গিয়ে মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে দেখা কোরো।

পাশের গেটে ঢুকে, লিফ্‌ট দিয়ে পাঁচ তলায় উঠে গেলো ক্যোরা। লিফটম্যানটি একটা বয়কে ডেকে বলে দিলো—উইলি, মিঃ ব্রাউনকে ডেকে দাও তো।

উইলি এক মুহূর্ত্তে ঘুরে এসে বললো—বসতে বল্‌লেন আপনাকে, মিঃ ব্রাউন এখুনি আসবেন।

এ ঘরটা গুদাম বলে মনে হচ্ছে। কী কাজ হতে পারে এখানে ক্যোরা ভেবে পায় না। মিঃ ব্রাউন ওর কথা শুনে বলেন—

ও, কাজ চাও তুমি? এর আগে কোনো জুতোর কারখানায় কাজ করেছো?

ক্যোরা বলে,—না।

মিঃ ব্রাউন ওর নামটা জিজ্ঞেস করেন তারপর বলেন, তোমার জন্যে কোন কাজ তো দেখ্‌ছি না এখন। আচ্ছা সাড়ে চারে কাজ করবে তুমি?

এত ঘা খেয়েও ক্যোরা আশা করেছিল ছ ডলারের কম বলবেন না ভদ্রলোক। তবু সাড়ে তিনের চেয়ে তো বেশী? সে রাজী হয়ে গেলো।

ওর নাম ঠিকানাটা লিখে নিয়ে মিঃ ব্রাউন বল্লেন—সোমবার সকাল ঠিক আটটায় এসো, তোমাকে এক জায়গায় বসিয়ে দিতে পারবো আশা করছি।

নিরাশ মনে আবার ভরসা জাগলো ক্যোরার। শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু পেয়েছে সে। ততো ক্লান্ত লাগছে না আর এখন, মনটাও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। রাস্তায় নেমে ক্যোরা দেখলো শহরের চেহারাটাই বদলে গেছে। নরনারীর হাসি ঠাট্টা টুকরো কথা কানে আসে এবার। হাল্কা লাগে সব কিছু। সবার মুখেই মৃদু হাসির রেশ, দিনের ভার নেমে গেছে।

মিন্নির বোধ হয় রান্না হয়ে গেছে এতক্ষণে। .ক্ষিদেও পেয়েছে। জোরে জোরে পা চালায় সে বাসার দিকে। মিন্নি কী বল্‌বে সব শুনে কে জানে।

আলোকোজ্জল হাসিখুসী চিকাগো। চিকাগোয় থাকতে পারবে সে। ওর অফিসটা বেশ ভালোই হয়েছে। কত বড় বড় ঝক্‌ঝকে কাঁচের জানালাগুলো। ভালোই কাটবে ওর এখানে। ড্রুয়ের কথা মনে পড়ে এবার। কী কী বলেছিলেন উনি? না, জীবনের একটা অর্থ আছে বৈকী? স্বচ্ছন্দ মনে একটা গাড়ীতে উঠে বসলো ক্যেরী।

চিকাগোয় থাকবে সে। সুখেই থাকবে।

চার

ড্রুয়ে সেদিন ক্যেরীর কাছে গেলো না। চিঠিটা পেয়ে তখনকার মতো ক্যেরীর কথাটা মন থেকে মুছে ফেললো সে। তারপর ফুর্ত্তির খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। ক্লার্ক স্ট্রীটের নাম করা রেষ্টুরেণ্ট-টায় সন্ধ্যার খাওয়াটা সেরে সে গেলো ফিজেরাল্ড এণ্ড ময়ের বারে। এক গ্লাস হুইস্কি টেনে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে গা এলিয়ে দিলো। অভিজাত জীবনের এক টুক্‌রো সে উপভোগ করছে।

ড্রুয়ে যে খুব বেশী মদ খেতো তা নয়। বড়লোক সে নয়। শুধু সবচেয়ে যা ভালো তার প্রতি ওর একটা অদম্য টান ছিল। এই যে আমোদ-আহ্লাদ ফুর্ত্তি, বারে বসে এক গ্লাস মদ নিয়ে গা এলিয়ে দেওয়া এ সেই 'সব-চেয়ে-ভালো'র এতটুকু। রেষ্টরের সাজ-সজ্জা আসবাব সবই দামী। দামী তার রেট্, আরো দামী নামী এর খরিদ্দাররা, বড ব্যবসায়ী, ডিরেক্টার, অভিনেতা-অভিনেত্রী। তার মতো উচ্চাভিলাষী সুখী জীবনের পিয়াসী আর কোথায় যাবে। ড্রুয়ে ভালোবাসে ভালো পোষাক, ভালো খাওয়া, বড়লোক কৃতী মানুষের সাহচর্য্য। জোসেফ জেফারসন এখানকার পেট্রন ছিলেন, অভিনেতা হেন্‌রী ডিক্সি তার টেবিল থেকে একটু দূরেই বসে আছেন, এইসব কথা ভেবে সে খুসী হতো। রেষ্টরে তার খুব ভালো লাগতো। কী নেই এখানে?

রাজনৈতিক নেতা, ব্রোকার, অভিনেতা অভিনেত্রী, ফুর্তিবাজ ধনী সবাই আসে। খায়, মদ টানে, এটাওটা সাধারণ কথাবার্ত্তা বলে, আড্ডা দেয়।

ওই যে ওখানে বসে আছেন, কে জানো? এই যে অমুক এসেছেন দেখ্‌ছি।—প্রায়ই শোনা যেতো এই ধরণের মৃদু আলাপ। কেউ নতুন লোক বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করেন—তাই নাকি? সত্যি অমুক?

তুমি চেনো না ওকে? গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউসের ম্যানেজার উনি।—আবার প্রথম জন হয়তো বললো।

এমনি সব টুক্‌রো আলাপ যখন ড্রুয়ের কানে আসে সে আরো একটু সোজা হয়ে বসে আরাম করে করে, খুসী মনে খেতে থাকে।

ফিজেরাল্ডে আসার পেছনেও এমনি একটা যুক্তি আছে ড্রুয়ের। ফিজেরাল্ড আরো ঐশ্বর্য্যশালী, আরো অভিজাত শ্রেণীর সেলুন, এখানকার মতো দামী ভালো মদ আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ফিজেরাল্ড ময়ের ম্যানেজার জি, ডব্লিউ, হার্স্টউডের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ড্রুয়ের রেক্টরে। বেশ কৃতী সুপরিচিত ব্যক্তি হার্স্টউড্। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, চমৎকার চেহারা, চোখে-মুখে, পোষাকে কর্ম্মদক্ষতা আর আত্ম-বিশ্বাসের ছাপ। সুন্দর স্যুট, দামী পাথর বসানো আংটি, সোনার রিস্টওয়াচ সবে মিলিয়ে হার্স্টউডকে একটা ঈর্ষ্যা করার মতো ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। প্রথম আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই ড্রুয়ে ঠিক করে ফেলেছিল এরকম লোকের সঙ্গে ঘনিষ্টতা থাকা ভালো। তারপর থেকে সে মদ খেতে হলে এখানে আসতো।

হার্স্টউডের চরিত্রটা অনুধাবন করার মতো। প্রথম আলাপেই ভালো লাগে ওঁকে। ছোটখাট অনেক ব্যাপারে বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ। ম্যানেজারের পদটা কিন্তু তাঁর নামেই, টাকা পয়সার ওপর ঠিক কতৃত্ব নেই। অধ্যবসায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ছোট একটা রেষ্টুরেন্টের মালিক থেকে আজ এই ফিজেরাল্ডের ম্যানেজার হয়েছেন তিনি। ছোট একটা চমৎকার অফিস আছে ওঁর, কত মাল এলো আর কতো খরচ হলো তার হিসাব রাখেন তিনি। সেলুনটাকে চালান আসলে ফিজেরাল্ড আর ময়, কোম্পানীর মালিক তাঁরা। টাকা পয়সার হিসাব রাখেন একজন ক্যাশিয়ার।

অধিকাংশ সময়ই হার্স্টউড্ ঘুরে ঘুরে বেড়ান ফিট্‌ফাট্ দামী স্যুট্ পরে, পেট্রনদের টেবিলের কাছে। অভিনেতা অভিনেত্রী, ব্যবসায়ী রাজনীতিক নেতা, শহরের সব কৃতী সন্তান সবাই তাঁর পরিচিত। সুপরিচিতই, নাম জানেন সবার। অনেককেই নাম ধরে ডাকেন তিনি। অবশ্য কার সঙ্গে কী ভাবে আলাপ রাখতে হয়, ভদ্রতা করতে হয় সে সব তাঁর দুরস্ত। কাউকে অভ্যর্থনা করেন—নমস্কার, ভালো আছেন তো? আসুন আসুন। আবার সুপরিচিত আলাপী কাউকে ডেকে নিয়ে এসে বসান, কীহে, কেমন আছ? খবর কী? তার মধ্যে বিখ্যাত ধনী বা বড় অভিনেতাও আছেন। এটা নির্ভর করে কে কতটুকু মিশতে চায় তাঁর সঙ্গে তার উপর।

ড্রুয়েকে পছন্দ করতেন হার্স্টউড্। ড্রুয়ের হাসিখুসী মিশুক ভাব আর চোস্ত সাজগোজ ভালোই লাগতো ওঁর। ড্রুয়ে একজন টুরিঙ্ সেল্‌সম্যান মাত্র সে কথা তিনি জানেন, তবে বার্টলেট ক্যারীও কোম্পানী বেশ বড় ফার্ম্ম আর ড্রুয়ের পজিসানও তো ভালোই। ক্যারীওকে চিনতেন হার্স্টউড্, তাঁর সঙ্গে দুএকবার এক টেবিলে মদও খেয়েছেন। ড্রুয়ের একটা গুণ ছিল চমৎকার আড্ডা জমানো গল্প করতে পারতো সে। আজ মনটাও ভালো ছিল, এবারকার টুরটায় ভালোই কাজ দিয়েছে, অফিসে কর্ত্তারা খুসী হয়েছেন।

ড্রুয়ে এসে ঢুকতে হার্স্টউড্ এগিয়ে গেলেন, আরে চার্লি যে। এসো এসো, কী খবর টবর কী? ড্রুয়ের খুব ভালো লাগে। হল ভর্ত্তি লোক দেখছে তার আপ্যায়নটা। শেকহ্যাণ্ড করে দুজনে বারের দিকে এগিয়ে যায়।

—ভালোই খবর, এই কেটে যাচ্ছে আর কী।

—মাস দেড়েক দেখিনি তোমাকে, কবে ফিরলে?

—শুক্রবার। বেশ ভালোই কেটেছে এবারে। ড্রুয়ে বলে।

—তোমার তো ভালোই কাটে হে—হার্স্টউড্ হাসেন। তারপর বারের লোকটা ঝুঁকে পড়তে বলেন—কী খাবে বলো, কী দেবে?

ড্রুয়ে বলে—বেশ পুরোনো পেপ্পার দাও আমাকে।

হার্স্টউড্ বেয়ারাটাকে বলেন—আমাকেও একটু দিও।

তারপর ড্রুয়েকে শুধান—হ্যাঁ, কদিন আছো এবার শহরে।

—এই তো, বুধবারেই আবার বেরুচ্ছি। সেণ্টপল্ যেতে হবে।

—গত শনিবার জর্জ্জ ইভান্স এসেছিল, বললো মিলওয়াকিতে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো ওর।

—হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছি। বৈকি। বেশ লোক ইভান্স, কী বলো? বেশ কাটিয়েছি তুজনে।

বারের লোকটা বোতল গ্লাস সাজিয়ে দিয়েছে কাউণ্টারে। মদ ঢেলে নিয়ে হার্স্টউড্ জিজ্ঞাসা করেন—ক্যারিও-র কী হয়েছে বলোতো, প্রায় দু'হপ্তা আসেন নি এখানে।

—বিছানায় পড়ে আছে, আবার কী। বাতে বাতে ভদ্রলোককে কাহিল করে ফেললো। ড্রুয়ে হাসতে হাসতে বলে।

—বেশ টাকা করেছেন, না?

—অঢেল অঢেল। বেশী দিন বাঁচবেন না মনে হচ্ছে, আজকাল তো অফিসেই আসেন না মোটে।

—একটাই তো ছেলে না?

—হ্যাঁ, ছেলে না অকাল-কুষ্মাণ্ড, উড়ে বেড়াচ্ছে।

—সে একা আর ব্যবসার কী ক্ষতি করতে পারবে।

—হ্যাঁ, তা সত্যি।

ঝকঝকে কোটের বুকটা, বাঁ হাতটা পকেটের মধ্যে ঢোকানো, হীরের উপর আংটিগুলোর পাথরে আলো পড়েছে, হার্স্ট উডকে দেখায় নিখুঁত কোন আরাম-বিলাসীর মতো।

মদ খাওয়া যাঁরা পছন্দ করেন না, একটু যাঁরা চিন্তাশীল তাঁদের কাছে এই সেলুনের অর্থহীন কলধ্বনি মোটেই ভালো লাগবে না। জীবন আর প্রকৃতির কী অদ্ভুত বিকৃতি বলে মনে হবে এই উজ্জলতা। আগুনের শিখায় আলো খুঁজতে আসে এখানে কীট পতঙ্গের দল। এখানে এসে কেউ গভীর কোনো চিন্তা করে না, আবেগ অনুভূতি নিয়ে কেউ আসে না এখানে; শুধু মৌখিক আপ্যায়ন অর্থহীন বাজে কথা। তবু এখানে যে এত লোক আসে, গল্প করে তার একটা কারণ আছে বৈকী। অদ্ভুত অদ্ভুত কোনো আবেগ আকাঙ্খার

পরিতৃপ্তির জন্যই বোধ হয় এই বার সেলুনের জন্ম, না হলে এই অনাবশ্যক সামাজিক আড্ডাটা এলোই বা কী করে ?

ড্রুয়ে এখানে আসে খুসীর সন্ধানে, অথবা তার চেয়ে উঁচুদরের লোকদের সঙ্গে মেশবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার আরো বন্ধুরা যারা আসে তারা হয়তো সবাই ভেবে দেখেনি কোনদিন। কিন্তু তারাও কামনা করে এই বড় লোকের সাহচর্য্য, এই পরিবেশের বুদ্বুদটাকে।

আয়েশী চেহারার মোটা সোটা গোছের এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। তাকে ইঙ্গিত করে হার্স্টউড্ বলেন, ভদ্রলোককে দেখ্ছো না ?

—কই, কার কথা বলছো ?

—ওই যে সিল্কের টুপি পরা, হার্স্টউড্ চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেন।

ড্রুয়ে বলে, ও হ্যাঁ, কে ভদ্রলোক ?

—জুলেস ওয়ালেস, আধ্যাত্মবাদী।

তাঁকে দেখতে দেখতে ড্রুয়ে বলে, কই সে রকম তো মনে হচ্ছে না দেখে, আত্মা-টাত্মা দেখেন না কি, সত্যি ?

—সে কে জানে। টাকা তো পায় , আবার কী চাই !

হার্স্টউডের চোখে একটা হাসি খেলে যায়।

—ওসব আমি বুঝি'টুঝি না, তোমার কী আসে নাকি ?

হার্স্টউড্ বলেন, কে বলতে পারে ? হযতো কিছু থাকতেও পারে। আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না কখনো। হ্যাঁ, আজ রাতে কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

ড্রুয়ে একটা থিয়েটারের নাম করলো।

—তাহলে উঠে পড়ো এক্ষুণি। সাড়ে আটটা বাজলো। হার্স্টউড্ ঘড়িটা দেখে বললেন।

ভীড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। কেউ সিনেমায় যাবে। কেউ ক্লাবে যাবে, কেউ যাবে মেয়ের সন্ধান। এখানে যারা আসে তাদের কাছে এর চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে ?

—আচ্ছা উঠি তাহলে, ড্রুয়ে বলে।

হার্স্টউড্ বলেন, শো-এর পর এসো, একটা ভালো জিনিষ দেখাবো তোমাকে।

উল্লসিত হয়ে ড্রুয়ে বলে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

—রাতে আর কিছু নেই তো হাতে?

—কিচ্ছু না।

—তাহলে আস্‌ছো ঠিক।

—শুক্রবার ট্রেনে আসতে আসতে একটা ঘরোয়া মেয়েকে পাকড়েছিলাম। ওহো, যাবার আগে তো একবার দেখা করতেই হবে।

হার্স্টউড্ বলেন, বাদ দাও ওসব।

—সত্যি বল্‌ছি, বেশ অল্পবয়সী, ভালো—

—ড্রুয়ে বন্ধুর মনে দাগ কাটার চেষ্টা করে।

—বারোটায় তাহলে, হার্স্টউড্ বলেন।

বাইরে যেতে যেতে ড্রুয়ে বলে, ঠিক আছে।

চিকাগোর প্রমোদমহলে এমনি করে ক্যেরীর নামটা উঠলো প্রথম। ক্যেরী তখন মিনির ফ্ল্যাটে বসে ওর সংকীর্ণ ভাগ্যটাকে ধিক্কার দিচ্ছে। কতো কিছুই না আশা করেছিলো সে।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যায় ক্যেরী যখন বাসায় ফিরলো ওর মনটা কেমন যেন আচ্ছন্ন। মিনি ভেবেছিল মোটামুটি ভালোই লেগেছে ক্যেরীর। হ্যান্‌সন্ ধরে নিয়েছিল ক্যেরী খুসী হবে।

অফিসের পোষাকটা না ছেড়েই হ্যান্‌সন্ এগিয়ে এলো—কেমন লাগলো তোমার?

ক্যেরী উত্তর দেয—ভালো নয়, আমার ভালো লাগছে না। তার কথার ভঙ্গীতেই সেটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

বাথরুমের দিকে যেতে যেতে একটু থেমে হ্যান্‌সন্ বলে, কী কাজ দিয়েছে তোমাকে?

—একটা মেশিন চালাতে হয়।

হ্যান্‌সনের তাতে কিছুই যায় আসে না, খরচাটা ক্যেরী দিতে পারলেই হলো। তবু একটু বিরক্ত হয় সে, ক্যেরী খুসী হতে পারেনি বলে। ক্যেরী আসার ঠিক আগে মিন্নির যে উৎসাহটা এসেছিল এখন একটু ঝিমিয়ে এসেছে সেটা। ক্যেরী চেয়েছিল একটু সহানুভূতি, একটা আশার কথা, সারাদিনের খাটুনির পর হাসিখুসী গল্প। সে সব কিছুই না! ক্যেরী বুঝতে পারে তার ভালো না লাগার অভিযোগে কেউ খুসী হয়নি এরা; এরা চায় সে মুখ বুঁজে কাজ করে যাবে, খুঁৎ খুঁৎ করবে না, যা পেয়েছে তাই নিয়ে খুসী থাকবে। তাকে চার ডলার করে দিতে হবে হপ্তায়, এদের সঙ্গে এভাবে থাকতে হলে কী রইলো জীবনে?

মিন্নি ওর সঙ্গী বা বন্ধু হতে পারে না, বড্ড বুড়িয়ে গেছে মিন্নি। কেমন চাপা চাপা, কঠিন ভাব। হ্যান্‌সনের যদি কোন সুখস্বাচ্ছন্দ্য আনন্দানুভূতি থাকেও, সেগুলোর কোন প্রকাশ নেই ওর কথায় বা আচরণে। ফাঁকা ঘরের মত নিস্তরঙ্গ হ্যান্‌সন্। অল্প বয়স ক্যেরীর, তার মনে কত কল্পনা, কত উচ্ছ্বাস। ভালোবাসার রঙীন দিনগুলোর সে স্বপ্ন দেখে এখন। কী দেখবে, কী পড়বে, কী করবে সবই তো তার কাছে কল্পনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসছে। কিন্তু এখানে তো কেউ নেই, তার এই আশা কল্পনার হাতছানিতে সাড়া দেবে কে?

সারাদিনের হিসাব মিলিয়ে দেখতে দেখতে সে ভুলেই গিয়েছিল ড্রুয়ে আসতে পারে। দিদি আর হ্যান্‌সনের ভাবভঙ্গী দেখে সে ভাবে না আসাই ভালো ড্রুয়ের এখানে। যদি আসে কী বলবে সে? খাওয়াদাওয়ার পর পোষাকটা বদলে নিলো সে। ফিট্‌ফাট পোষাকে ক্যেরীকে বেশ ভালোই দেখায়। বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখে আশা আর বিক্ষোভের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। খানিকক্ষণ ঘোরাফেরা করে ঠিক করলো সিঁড়ির কাছে নীচে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। ড্রুয়ে যদি আসে ওখানেই দেখা হয়ে যাবে। টুপিটা পরতে পরতে তাকে একটু খুসী দেখায়।

খানিকবাদে হ্যান্‌সন্ যখন কাগজটা নিয়ে এসে বসলো মিন্নি বললো, ক্যেরীর মনে হয় জায়গাটা পছন্দ হয় নি।

হ্যান্‌সন্ বলে—এখন তো কিছুদিন লেগে থাকতেই হবে, উপায় কী?—ওকি নীচে গিয়েছে?

মিন্নি বলে, হ্যাঁ।

—আমি হলে ওকে বলতাম লেগে থাকতে। আর একটা পেতে পেতে দেরীও তো হতে পারে।

মিন্নি বললো—হ্যাঁ তাই বলবো ওকে। হ্যান্‌সন্ আর কোন কথা বলে না, চুপচাপ কাগজ পড়তে শুরু করে।

খানিকবাদে হ্যান্‌সন্ কাগজের ওপর চোখ রেখেই বলে—আমি হলে ওকে নীচে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে দিতাম না, এসব ভালো নয়।

মিন্নি বলে—আমি বলে দেবো ওকে।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকজন গাড়ীঘোড়া দেখতে কোরীর ভালোই লাগে। কোথায় যাচ্ছে এরা? ওর চিন্তাধারাটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে। টাকা, ভালো পোষাক, গহনা, সিনেমা থিয়েটার, আমোদ ফুর্ত্তি, এসব ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না সে। এরা সব নিশ্চয়ই এরি একটা কিছুর সন্ধানে চলেছে।

নীচের তলায় একটা রুটির দোকান ছিল। ক্যেরী লক্ষ্যই করেনি হ্যান্‌সন্ রুটি কিনতে এসেছে। একেবারে কাছাকাছি আসতে চোখ পড়ায় হ্যান্‌সন্ বলে—এই রুটি কিনতে এসেছিলাম।

মাঝে মাঝে চিন্তাটাও সংক্রামক ব্যাধির মতো এমাথা থেকে ও মাথায় চলে যেতে পারে বোধ হয়। ক্যেরী বুঝতে পারে, ও কি করছে তাই দেখতেই এসেছিলো হ্যান্‌সন্। হ্যান্‌সন্ সত্যিই রুটি কিনতে এসেছে, কিন্তু ক্যেরী কী করছে ওখানে দাঁড়িয়ে সেটা দেখাও দরকার বৈকি।

কেমন করে যে কথাটা মাথায় এলো ক্যেরীর। হ্যান্‌সনের ওপর রাগ ধরে যায়, কি বিশ্রী সন্দেহ লোকটার।

মনের চিন্তাধারাই পৃথিবীর রঙ পাল্‌টে দেয়। ক্যেরীর ভাবনার সূত্রটা ছিঁড়ে গেছে। একটু পরে সে উঠে আসে। এখন আর ড্রুয়ে আসবে না। একটু রাগও হয় তার, ওকে অবজ্ঞা করছে ড্রুয়ে?

হ্যান্‌সন্ শুয়ে পড়েছে এর মধ্যেই, মিন্নি চুপ করে সেলাই করছে। বড্ড ক্লান্ত লাগে ক্যেরীর, ভনিতা না করেই বলে ফেলে ক্যেরী—আমি শুতে যাচ্ছি।

মিন্নি বলে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়ে পড় তুই। সেইতো ভোরে উঠতে হবে।

সকালটাও এমনি করেই গেলো। ক্যোরী যখন ঘর থেকে বেরুলো হ্যান্‌সন্‌ বেরিয়ে যাচ্ছে। চা খাবার সময় মিন্নি কথা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কী নিয়েই বা কথা বলবে ওরা? দুজনে দুকথা ভাবে। আগের দিনের মতো আজও ক্যোরী হেঁটেই যায়। চার ডলার থাকা খাওয়ার জন্য দিয়ে থাকে তো মোটে আধ ডলার। তা থেকে গাড়ী ভাড়া হবে কোত্থেকে? কী বিশ্রী লাগে। তবু, সকালবেলার রোদ্দুরে কিছুটা মালিন্য তার ধুয়ে যায় বৈকি।

কারখানায় আজও ঠিক তেমনি খাটুনি। তবে কালকের মতো নতুন লাগে না, হতো ক্লান্তিও আসে না। হেড্‌ ফোরম্যান্‌ ঘুরতে ঘুরতে ওর মেসিনের পাশে এসে দাঁড়ায়।

—তুমি কোত্থেকে এলে?

ক্যোরী বলে—মিস্টার ব্রাউন—

—ও তাই নাকি? দেখো, কাজকর্ম্ম ঠিকঠাক করছো তো?

মেসিনে অন্য মেয়েগুলোকে ক্যোরীর মোটেই পছন্দ হয় না। নিজের নিজের কাজ নিয়ে বেশ আছে ওরা; যা পেয়েছে তাতেই খুসী। কেমন করে পারে ওরা? ক্যোরীর মতো ওদের তো আর অতো আশাআকাঙ্ক্ষার রঙীন কল্পনা নেই। ক্যোরী ওদের মতো অশ্লীল ইয়ার্কি করতে পারে না, কাপড়-জামা সম্বন্ধেও তার দৃষ্টি খুব সজাগ। পাশের মেয়েটার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না ওর।

মেয়েটি তার পাশের মেয়েটিকে বলে, ছেড়ে দেবো আমি এ ছাতার চাকরী। ভারী মাইনে, সক্কালবেলা ওঠোরে, সারাদিন হটর-হটর খাটোরে, গতরে পোষাবে কেন?

কারখানার ছেলে মরদ সবার সঙ্গেই এরা বেশ মেশে, ইয়ার্কি করে, অশ্লীল ঠাট্টা করে, ক্যোরী প্রথম প্রথম চমকে ওঠে। তাকেও ওদেরই একজন ধরে নিয়েছে সবাই, ওর সঙ্গেও এমনি করে ইয়ার্কি করবে নাকি?

মোটা কব্‌জীওয়ালা সোজের মেশিনের লোকটা দুপুরবেলায় ক্যোরীকে বলে, এই যে, বাঃ তুমি তো একটি লক্কা পায়রা গো।

সে ভেবেছিল অনেকবারকার শোনা সেই জবাবটাই আসবে, আ মর

হতভাগা। তা যখন এলো না, ক্যেরী বরং বোকার মত হেসে পালালো সে থমকে অবাক হয়ে গেলো।

সেদিন রাত্রে বাসায় ওর আরো খারাপ লাগে। কারো সঙ্গে মেশে না, কোথাও বের হয় না। কেমন মানুষ এরা, তার দিদি আর হ্যান্‌সন্‌?

দরজায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষে চলতে শুরু করলো ক্যেরী। সহজ ভঙ্গীতে বেড়িয়ে বেড়াতে দেখে অনেকেরই নজর পড়লো ওর ওপর। বছর ত্রিশ বয়সের সুবেশ এক ভদ্রলোক যেতে যেতে হঠাৎ ওর কাছে এসে গতিটা কমিয়ে দিলেন। বল্লেন,—বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?

ক্যেরী অবাক হয়ে লোকটিকে দেখে, তারপর কোনমতে বুদ্ধি স্থির করে আসতে আসতে বলে,—আপনাকে তো চিনিনা আমি?

লোকটি বলে,—তাতে কী?

আর কোনো কথা না বলে ক্যেরী দ্রুত পা চালিয়ে ফিরে আসে। লোকটার চেহারায় কী একটা আছে ক্যেরী ভীষণ ভয় পায়।

সপ্তাহের বাকী কটা দিনও এমনি করেই কাটলো। দুদিন হেঁটে বাড়ী আসতে পারেনি ক্যেরী, গাড়ী ভাড়া খরচ হয়ে গেছে। খুব শক্ত শরীর নয় তার, সারাদিন বসে বসে পিঠটা ব্যথা করে। একদিন হ্যান্‌সনের আগেই সে শুতে চলে গেল।

ফুলের গাছ আর অবিবাহিত যুবতী মেয়ে! হঠাৎ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তুলে নিয়ে এলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো ফল হয় না। ভালো মাটি বা ভালো পরিবেশ দরকার হয়, সাধারণ বাড়টুকুর জন্যেই। একটু ধীরে ধীরে সইয়ে নিলে হয়তো ভালো হতো তার পক্ষে। এতো তাড়াতাড়ি চাকরীতে না ঢুকে কিছুদিন যদি সে শহরটা বেড়িয়ে নিতো তাহলেও বোধ হয় ভালো হতো।

প্রথম যেদিন সকালে বৃষ্টি পড়লো, ক্যেরীর খেয়াল হলো ছাতা নেই তার। মিন্নি ওর পুরোনো আধছেঁড়া ছাতাটা এগিয়ে দিলো, আমারটা নিয়েই যা।

ক্যেরীর আত্মসম্মানে বাধে, এই জরাজীর্ণ ছাতা! দেড় ডলার খরচ করে ক্যেরী একটা ছাতা কিনে ফেললো।

মিন্নি দেখে আঁৎকে ওঠে—এটা কী হলো ক্যেরী?

ক্যোরী জবাব দেয়, দরকার তো একটা। •

—কী বোকা মেয়ে তুই, এত খরচ করে ফেললি? ক্যোরী মনে মনে চটে কিন্তু জবাব দেয় না। সাধারণ শপ-গার্ল সে নয়, ও কথা তারা যেন না ভাবে।

প্রথম শনিবার রাত্রে ক্যোরী চার ডলার দিয়ে দিলো দিদিকে। টাকাটা হাতে নিয়ে মিন্নির বিবেকে একটু লাগে। কিন্তু এর থেকে কম দিলে হ্যান্‌সন্‌কে বোঝাবে কী বলে সে? হ্যান্‌সন্‌ সন্তুষ্ট হয়ে হাসে। চার ডলার কম দিলো সে এবার সংসার খরচা। আধ ডলারে জামাকাপড়, বেড়ানো, সিনেমা সবই সারতে হবে ক্যোরীকে। ক্যোরী ভাবে। ভেবে কূল পায় না। শেষ পর্য্যন্ত সব কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয় ওর।

খাওয়ার পর ক্যোরী বলে,—আমি একটু রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে আসছি।

হ্যান্‌সন্‌ বলে, একা?

ক্যোরী জবাব দেয়, এই তো এখানে।

মিন্নি বলে, আমি হলে যেতাম না।

ক্যোরী বলে, কিছু একটা দেখে আসি, ঘরে বসে বসে পাগল হয়ে যাবো যে। এমনিভাবে কথাটা বলে ক্যোরী যে ওরা তুজনে বুঝতে পারে ক্যোরী ওদের ওপর খুসী নয়।

সামনের ঘরে ক্যোরী টুপিটা আনতে গেলে হ্যান্‌সন্‌ বলে, কী হয়েছে কি ওর?

মিন্নি বলে, কী জানি বুঝছি না কিছু।

—একা একা বাইরে যাওয়া ঠিক না, এটুকু বুদ্ধি থাকা উচিত ওর।

ক্যোরী অবশ্য বেশী দূর গেল না। ফিরে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। পরদিন গারফিল্ড পার্কে বেড়াতে গেল সবাই মিলে। ক্যোরীর কিন্তু তাও ভালো লাগলো না। কেমন দেখায় তাকে এই পোষাকে? এই পোষাকে বেড়াতে যায় কেউ? পরদিন কারখানার অন্যান্য মেয়েরা তাদের মজার কথা শোনায় খুসী খুসী দেখায় ওদের, সুখী ওরা।

ক'দিনই বৃষ্টি পড়লো, গাড়ী ভাড়ায় বেরিয়ে গেলো অনেকগুলো পয়সা। একদিন বাস ধরতে ধরতে বৃষ্টিতে ভিজে গেল ক্যোরী। সারা সন্ধ্যেটা কাটলো

জানালার ধারে বসে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্যোরী অনেক কথাই ভাবে।

শনিবারে আবার চারডলার দিয়ে সে হতাশ হয়ে পড়ে। কারখানার মেয়েদের কাছে শোনে হাতখরচার পয়সা সবাই ওর চেয়ে বেশী পায়। তাছাড়া ওদের ছেলে বন্ধু আছে, তারা মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যায়, খাওয়ায় ফুর্তি করে। ড্রুয়ের মত বন্ধু? ক্যোরীর বুকটা একএকবার কেমন করে। কারখানার একটা ছেলেকেও ভালো লাগে না তার। রুক্ষ কর্কশ অভদ্র চ্যাংড়া সবগুলো। কারখানার মধ্যেই তো এদের দেখেছে সে শুধু।

শীতের আভাস দিয়েছে। ক্যোরী ভেবে পায় না কাপড় জামার কী হবে? একদিন সন্ধ্যাবেলা সে বলে ফেলে সবার সামনে। মিন্নি বলে, কিছু করে কমদিয়ে কিনলেই তো পারিস। কথাটা বলে ফেলে মিন্নির হুঁস হয়। ক্যোরী হঠাৎ টাকা কমিয়ে দিলে কী অবস্থা হবে।

—দু-এক হপ্তা তাই করবো ভাবছি, তোমাদের যদি খুব অসুবিধা না হয়, ক্যোরী বলে।

মিন্নি ভয়ে ভয়ে বলে, দুডলার করে পারবি তো দিতে?

ক্যোরী খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা পারবো। ওহ, কী একটা ভার নেমে গেলো। মিন্নি যে কী বলে বোঝালো হ্যান্‌সন্‌কে তা সেই জানে। হ্যান্‌সন্ কিছু বললো না বটে, তবে আভাসে ইঙ্গিতে একটা অপ্রীতিকর হাওয়া অনুভব করতে পারে ক্যোরী।

এই ব্যবস্থাই হয়তো চলতো কিন্তু ক্যোরী অসুখে পড়ে গেল ইতিমধ্যে। তখনো ওর গরম জামা কেনা হয় নি, ঠাণ্ডা লেগে গেলো হঠাৎ। মাথাটা ভীষণ ধরেছে, হাতপায়ে ব্যথা, বুকে সর্দি বসেছে। পরদিন বাসায় এসে ক্যোরী খেতে চাইলো না। মিন্নি জিজ্ঞেস করতে বললো, কী জানি, ভীষণ খারাপ লাগছে। পরদিন সকালে দেখা গেল বেশ জ্বর। মিন্নি খুব বিব্রত হয়ে পড়লো। হ্যান্‌সন্ বলে, বাড়ী চলে যাক্ ও।

তিনদিন পরে যখন ক্যোরী সেরে উঠলো, সবাই ধরে নিলে চাকরীটা ওর

গেছে নিশ্চয়ই। সামনে শীত এসে পড়েছে, গায়ে গরম জামা নেই, চাকরীটাও গেল! ক্যেরী বলে, দেখি সোমবার বেরুই।

এবার অবস্থা আরো খারাপ, গায়ে শীতের জামা নেই, হাতে যা ছিল টুপিটা কিনতে খরচ হয়ে গেছে। তিনদিন ক্যেরী এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালো। বাসাটার আবহাওয়া ক্রমশ অসহ্য হযে উঠছে। এমন করে আর কদিন চলে। হ্যান্‌সনের যা ভাব, আর দুদিন পরে হয়তো তাকে সব আশা ছেড়ে দিযে ফিরে যেতে হবে দেশে।

চতুর্থ দিন। মিন্নির কাছ থেকে কটা পযসা ধার নিয়ে ক্যেরী ঘুরে বেড়ায বস্তী-কারখানা অঞ্চলে। না, ছোটখাট সহরের চাকরীও নেই। একটা রেষ্টুরেণ্টে 'লোক চাই' কার্ড ঝুলছে, ক্যেরী ঢুকে পড়লো। না, তারা অভিজ্ঞ লোক চায। হায় ভগবান্!

এমনি সময় ওর পিছন থেকে কে ওর হাতটা ধরে ফেললো, আরে, তুমি কোথায়?

ক্যেরী ফিরে দেখলো ড্রুয়ে। উচ্ছ্বসিত হাসিখুসী বেপরোয়া ড্রুয়ে। ক্যেরীও হাসে, ড্রুয়ের হাসিটা যেন ছোঁয়াচে।

—কী, কেমন আছো ক্যেরী? কোথায় ছিলে এতদিন?

—বাড়ী গিয়ে ছিলাম্।

—ও। ওদিক থেকে দেখেই তোমাকে চিনেছি, আমি তো তোমার বাসায যাচ্ছিলাম। তারপর কেমন আছ?

ক্যেরী হেসে বলে, আছি ভালই।

ওর দিকে তাকিয়ে ড্রুয়ের কিন্তু মোটেই তা মনে হলো না।

তোমার সঙ্গে ক'টা কথা ছিল আমার। কোন কাজ নেই তো এখন তোমার? ড্রুয়ে বলে।

ক্যেরী বলে, না, এখুনি কিছু নেই।

—চলো ওখানে গিযে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্। ওঃ, তোমাকে দেখে ভীষণ খুসী হয়েছি আমি।

ওর উচ্ছ্বাসভরা হাসিখুসী সদয় ব্যবহারে ক্যেরীর মনটা হাল্কা হয়ে আসে, ক্যেরী রাজী হয়ে যায়, তবু একটু দূরত্ব রাখার চেষ্টা করে।

ক্যেরীর হাতটা ধরে ড্যুয়ে বলে, এসো। ক্যেরীর মনে আর দ্বিধামাত্র থাকে না। কেমন আপন করে নেয় ড্যুয়ে।

মনরো স্ট্রীটে পুরোনো উইণ্ডসর রেষ্টুরেন্টে ঢুকে পড়ে ওরা। রাস্তার দিকে একটা ছোট টেবিলে আরাম করে বসে ড্যুয়ে বলে, কী খাবে বলো?

মেনুর দিকে তাকিয়ে দাম দেখে ক্যেরী চমকে ওঠে।

ড্যুয়েই ডাক দেয় ওয়েটারকে। একটা নিগ্রো বয় এগিয়ে আসতে ড্যুয়ে বলে, চিকেন রোষ্ট, সুপ, কাটলেট। ঘাড় নেড়ে বয়টা চলে যায়, জী হুজুর।

ক্যেরীর চোখ কপালে ওঠে। দেড় ডলার, আধ ডলার, এক ডলার!

ড্যুয়ে আবার ডেকে বলে বয়টাকে, হ্যাঁ দেখো, কফি দিও একটু পরে।

ড্যুয়ে ক্যেরীর দিকে ফিরে বলে, সকাল থেকে ব্রেকফাষ্টের পর কিছু খাওয়াই হয় নি। এইতো রক্ আইল্যাণ্ড থেকে আসছি।

ক্যেরী শুধু হাসে।

—হ্যাঁ, কী করছ তুমি বলোতো। দিদি কেমন আছেন?

শেষ কথাটারই জবাব দেয় ক্যেরী, ভালই আছে।

ড্যুয়ে ওর দিকে তাকায়, বলে, তোমার অসুখ করেছিল মনে হচ্ছে।

ক্যেরী ঘাড় নাড়ে।

—না, তোমাকে বেশী ভালো দেখাচ্ছে না তো, কেমন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে যেন? কী করছিলে তুমি এতদিন?

— কাজ করছিলাম।

—কাজ? কোথায়?

ক্যেরী বলে কারখানার নামটা। ড্যুয়ে বলে, ও, ওদের তো চিনি আমি। ফিফ্‌থ এভিনিউতে ওই নোংরা বিল্ডিংটা, ওরা তো জানি ভীষণ পিশাচ, পয়সাকড়ি ভালো দেয় না। তা ওখানে গেলে কেন?

ক্যেরী খোলাখুলিই বলে এবার আর কোথাও পেলাম না, যা—

—সেকি। ওদের কোম্পানীতে কাজ করবে তুমি? ড্যুয়ে যেন আঁৎকে ওঠে।

অনেক কথাই জিজ্ঞেস করে সে। অনেক কিছু বোঝায় ক্যেরীকে, নিজের সম্বন্ধে, এই রেষ্টুরেন্টটা সম্বন্ধে।

বিরাট একটা ট্রে-তে খাবারগুলো সাজিয়ে নিয়ে এলো বয়টা। ড্রুয়ে পরিবেশন করে। ওর কড়া-ইস্ত্রী করা নতুন স্যুটটা, দামী আংটি সব যেন কথা বলে। কথাবার্ত্তায়, আচরণে ড্রুয়ে সংক্রামিত করে ক্যেরীর মনকে। ক্যেরী খুশী হয়ে ওঠে। ওর মনের ভারটা নেমে গেছে। ক্যেরীর মনটা সম্পূর্ণ জয় করে ফেলেছে ড্রুয়ে।

ভাগ্যান্বেষী ক্যেরী ঘটনাটাকে সহজ ভাবে নেয়। একটু কেমন কেমন লাগে এই অভিজাত আবহাওয়াটা, তবু রেষ্টুরেন্টটার প্রশস্ত সাজানো ঝক্‌ঝকে হল্‌টা তার মনটাকে ভরিয়ে তোলে। একটা খুসীর আমেজে। আহা, এখানে এসে যারা খায় তারা কতো ভাগ্যবান্। ড্রুয়ে কী সুখী, ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ায়, চমৎকার দামী দামী পোষাক পরে, কতো বলিষ্ঠ সুন্দর তার চেহারা, এইরকম নামকরা রেষ্টুরেন্টে ডিনার খায় যে! ড্রুয়ের মতো লোক কেন যে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, ক্যেরী ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

ড্রুয়ে বলে, তাহলে অসুখ হয়ে চাকরীটা গেল তোমার। তাহলে এখন কী করবে ভেবেছ?

বাইরের কঠিন জগৎটা আবার বাস্তব হয়ে ওঠে ক্যেরীর কাছে। বলে, দেখি খুঁজে টুঁজে।

ড্রুয়ে বলে, না, ওসব আর চলবে না। কদিন খুঁজছো এমনি করে?

—চার দিন হলো।

ড্রুয়ে যেন আর কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে বলে, শোনো, শুনলে তো? না, এসব কিছু করা চলবে না তোমার। এইসব কারখানা ফ্যাক্টারীর মেয়েরা কত পায়? চলবে ওতে তোমার?

ক্যেরীকে কত স্নেহ করে ড্রুয়ে, এমনি দাদার ভঙ্গীতে কথা বলে। এসব কথা বলার একটা উদ্দেশ্য ছিল ড্রুয়ের। মনে মনে খতিয়ে দেখেছে সে, ক্যেরীর ফিগারটা বেশ ভালোই, তাছাড়া বড় বড় চোখ দুটোয় বেশ শান্ত কমনীয়তা আছে। ক্যেরীর দিকে তাকায় ড্রুয়ে। ড্রুয়ের প্রশংসমান দৃষ্টি

ক্যোরীর চোখ এড়ায় না। ক্যোরী বুঝতে পারে ড্রুয়ের ভালো লেগেছে তাকে। প্রতি মুহূর্তে দুজনের চোখ মেলে, তারসঙ্গে দুজনের মনও বুঝি ধরা দেয়।

চেয়ারটা আর একটু সরিয়ে এনে ড্রুয়ে বলে, আজ থেকে যাও। চলো না, আজ একটা থিয়েটার দেখে আসি।

ক্যোরী বলে, তা কি করে হবে?

—কেন, কী হয়েছে, কোথাও ব'বার আছে নাকি রাত্রে?

—না তেমন কিছু নয়, ক্যোরী ক্লান্তভাবে বলে।

—তবে? যেখানে আছো, ওখানে নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না তোমার।

—কী জানি।

—আচ্ছা, কাজ না পেলে কী করবে তুমি?

—কী আর করবো, দেশে ফিরে যাবো।

কথাগুলো বলতে ক্যোরীর গলাটা কেঁপে গেলো। ড্রুয়ে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নীরবেই ওরা পরস্পরের মনোভাব বুঝে নিয়েছে। ড্রুয়ে বুঝেছে ক্যোরীর অবস্থা, ক্যোরীও বুঝেছে যে ড্রুয়ে সেটা জানে।

—না, তা হবে না। আমার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে চালাও তুমি এখন। ড্রুয়ে সত্যি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছে।

ক্যোরী চেয়ারে বসেই পিছিয়ে যায়, বলে, না না।

ড্রুয়ে বলে,—তবে কী করবে তুমি শুনি।

ক্যোরী বসে বসে ভাবতে থাকে, আর মাথা নাড়ে, না না না।

ড্রুয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে সমবেদনা অনুভব করে। পকেটে খুচরো বেশটা টাকা ছিল, নিঃশব্দে সেগুলো বার করে ড্রুয়ে হাতে নেয়, তারপর বলে, না এরকম করে চলতে দেবো না আমি তোমাকে। জামা কাপড় কিছু কিনে নাও তো। এসো আমার সঙ্গে।

এই প্রথম ড্রুয়ে ওর পোষাক সম্বন্ধে কথা বললো। ক্যোরী বুঝতে পারে, তার জামাকাপড় কী বেমানান, বিশ্রী। ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছে ড্রুয়ে। ক্যোরীর ঠোঁট দুটো একটু কাঁপে। ড্রুয়ে ওর বলিষ্ঠ হাত দিয়ে ক্যোরীর হাতটা ধরে।

—ক্যেরী, এমন করে কী হবে। একা কী করতে পারবে তুমি? আমার সাহায্য নিতে এতো আপত্তি কিসের তোমার।

ড্রুয়ে ওর হাতে চাপ দেয়। ক্যেরী সরিয়ে নিতে গিয়েও পারে না, বরং ড্রুয়ে এবার জোরেই চেপে ধরে ওর হাতটা। এবার আর ক্যেরী প্রতিবাদ করে না। ধীরে ধীরে টাকাগুলো ক্যেরীর হাতে গুঁজে দেয় ড্রুয়ে। ক্যেরী প্রতিবাদ করতে বলে।

—ধার, ধার দিচ্ছি তোমাকে। এতে কি আছে? পরে শোধ করে দিও তুমি, হয়েছে তো।

নিইয়ে ছাড়লো সে টাকাটা। ড্রুয়ের প্রতি একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করে ক্যেরী।

অনেক দূর এগিয়ে দিলো ড্রুয়ে। রাস্তায় চলতে চলতে একসময় সে বলে— তুমি এদের সঙ্গে থাকতে চাও না, না?

ক্যেরী শোনে বটে কথাটা, গ্রাহ্য করে না, না শোনার ভান করে।

—কাল এসো, ম্যাটিনী শোতে যাওয়া যাবে, কেমন?

ক্যেরী প্রথমে একটু আপত্তি করে, পরে রাজী হয়।

—তোমার তো কোন কাজ নেই এখন। একজোড়া ভালো জুতো, আর একটা গরম জামা কিনে নাও, বুঝেছ?

ড্রুয়ে চলে যাওয়ার পর যেসব সমস্যা উঠবে, সে কথা মোটেই ভাবে না ক্যেরী। এখন ড্রুয়ের সান্নিধ্যে সে রোদ পোহাচ্ছে।

বিদায় নেবার আগে ড্রুয়ে বলে, এদের কথা নিয়ে ভেবো না তুমি। আমি একটা ব্যবস্থা করবই।

ড্রুয়ে চলে গেলে ক্যেরীর মনটা ভীষণ খারাপ লাগে, কী যেন একটা হারিয়ে ফেললো সে। সামনে কী বিরাট সমস্যা।

টাকাগুলো দেখে ক্যেরী। দুটো দশ ডলারের নোট। চকচকে নতুন নোট।

ছয়

অর্থের আসল অর্থ সাধারণ মানুষ এখনো বুঝতে শেখে নি। যদি সব মানুষ বুঝতে পারতো যে নীতির দিক থেকে শুধু নিজের প্রাপ্য ছাড়া—অন্য কোন টাকা গ্রহণ করা উচিত নয়, যদি বুঝতো যে টাকা শুধু নিজের পরিশ্রমের সঞ্চিত বিনিময় মূল্য, অন্যায়ভাবে অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে উপভোগ করার জন্য নয়, তবে হয়তো আজকের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর ধর্মগত অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। অর্থের নীতিগত প্রশ্নটা ক্যোমীর কাছে খুব স্পষ্ট ছিলো না। সে বুঝতো—টাকা সবারই প্রয়োজন, আমারো প্রয়োজন, টাকা আমাকে পেতেই হবে। ব্যস্ এইটুকুই যথেষ্ট। কুড়ি ডলার রয়েছে তার হাতে। কুড়ি ডলারে তার অনেক কিছু হতে পারে। অনেক স্বচ্ছল সে এখন। অর্থই তো শক্তি। টাকাতেই তো সব কিছু করার ক্ষমতা আসে।

ক্যোমীর মতো কোনো মেয়েকে যদি একতাড়া নোট দিয়ে একটা মরুভূমির মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হতো, অনেক দিন না খেয়ে খেয়ে, তবে তাদের জ্ঞান আসতো যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে টাকার কোনো মূল্য থাকেও না। তবুও কিন্তু সে জিনিষটার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারতো না, সে ভাবতো। আহা, এত টাকা, এতো কিছু করার ক্ষমতা রয়েছে তার, শুধু উপভোগ করতে পারছে না সুযোগের অভাবে।

ড্রুয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে আসতে ক্যোমীর মনে একটা উত্তেজনা আসে। একটু লজ্জা লাগে, কেন সে টাকাটা নিয়ে ফেললো। কিন্তু প্রয়োজনটা তার এতো তীব্র যে খুসীই হয়েছে সে। একটা চমৎকার জ্যাকেট, একজোড়া সুন্দর জুতো কেনা যাবে এখন। একজোড়া মোজাও হবে। একটা স্কার্টও হয়ে যাবে। তাছাড়া আরো আরো একটা বড় কিছু সে পেয়েছে।

মনে মনে ড্রুয়েকে বিচার করে সে। চমৎকার উদার লোক। কোনো কিছু

খারাপ চোখে পড়ে না তার। ওর প্রয়োজন অনুভব করেই সে সাহায্য করার জন্য টাকাটা দিয়েছে।

অবশ্য ক্যেরী মেয়ে বলেই দিয়েছে, কথাটা ঠিক। কিন্তু একটা ভিখারীকেও সে দিতো যতটুকু ভিখারীকে দেওয়া যায়। অতোশতো ভাবে না সে। দর্শনের যুক্তি তার মাথায় আসে না।

মেয়েদের পিছনে ঘোরে ড্রুয়ে? হ্যাঁ, কিন্তু কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা তার নেই। মতলববাজ ক্রূর শয়তান সে নয়। মেয়েদের সে ভোলাতে ভালবাসে। এটাই তার চরিত্র, এইই তার প্রধান আনন্দ, জীবনকে উপভোগ করে সে এইভাবে। নিজেকে বাড়িয়ে দেখে, বাড়িয়ে বলে। ভালো পোষাক সম্বন্ধে তার দুর্ব্বলতা আছে, অল্পবয়সী মেয়েদের মতো। সে যেমন অল্পবয়সী শপ-গার্লদের ভোলাতে পারে, তেমনি মতলববাজ কোন শয়তান তাকেও ঠকাতে পারে। সহজে মিশতে পারে, তার কোম্পানীও বেশ নাম করা, সহজেই সে ভালো সেল্‌সম্যান হতে পেরেছে। চিন্তাশীলতা, জ্ঞান, মহত্ত্ব এসব তার নেই। তার বিচার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে তাতে তাকে ভালো লোকই বলা চলে।

ক্যেরী চলে গেলে সে অভিনন্দন জানায় নিজেকে। ক্যেরী তার সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা নিয়ে গিয়েছে। এইরকম একটা মেয়ে শীতকালে এমনি ভাবে ঘুরে বেড়াবে। তাকি কখনো হতে পারে? ক্যেরীর কথা ভাবতে তার ভালো লাগে। ফিজেরাল্ডে একবার যেতে হবে।

ক্যেরী বাসায় ফেরে বেশ খুসী মনে। অবশ্য কটা প্রশ্ন আছে। মিন্নি জানে টাকা নেই তার কাছে, কেমন করে জামা-কাপড়গুলো কিনবে সে, কী বলবে?

বাসায় পৌছতে পৌছতে সে ঠিক করে ফেলে, না কিছু বলে বোঝতে যাবে না মিন্নিকে।

মিন্নি শুধায়, কিছু হলোরে?

মনের ভাবটা গোপন রাখতে ক্যেরী শেখে নি এখনো। অন্য কেউ হলে লুকোতো। সে সোজাসুজি বলে, একটা আশা পেয়েছি।

—কোথায়?

—বোস্টন স্টোরে।

মিস্রি খুঁটিয়ে জানতে চায়—ঠিক পাবিতো ? কথা দিয়েছে ?

—কাল জানা যাবে পুরোপুরি, ক্যেরী বলে। মিথ্যে কথাটার জের টানতে ভালো লাগে না ওর।

ক্যেরীর হাব্বাভাব দেখে মিস্রিভাবে হ্যান্‌সনের মতামতটা এখন জানানো যায় বোধ হয়। সহজ করে কেমন করে বলা যায় ? একটু থেমে থেমে বলে—যদি না হয় এটা—

—শীগ্রি যদি কিছু না পাই তো বাড়ী চলে যাবো।

মিস্রি এবার সাহস পায়, উনি বলছিলেন, শীতটা বাড়ীতে থাকাই ভালো।

ক্যেরী মুহূর্ত্তের মধ্যে অবস্থাটা আঁচ করে নেয়। ওরা আর তাকে রাখতে চায় না। মিস্রিকে দোষ দেওয়া যায়না, হ্যান্‌সনকেই বা কী বলতে পারে সে ? কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মনে হয় ভাগ্যিস ড্রুয়ে টাকাটা দিয়েছিল।

এক মুহূর্ত্ত বাদে সে বলে, হ্যাঁ, আমিও তাই ভাবছিলাম।

কলাম্বিয়ায় ফিরে যাওয়ার কথায় তার মন বিদ্রোহ করে, সেই নোংরা ঘিঞ্জি সংকীর্ণ পরিবেশ। কিন্তু কী করা যায এখন ? কাপড জামাগুলো কেনাও যাবে না, এখানে কী করে পরবে সে গুলো ? তাছাড়া বাডী যাবার ভাড়াটা রাখতে হবে। কিন্তু সেটাই বা পেলো কোত্থেকে সে ? মিস্রিকে কী বলবে ? মিস্রির কাছে হাত পাততে ইচ্ছে করে না তার। ভাবতে থাকে সে। কাল সকালে ড্রুয়ে তাকে নতুন পোষাকে আশা করবে ; সে পারছে কৈ ? হ্যান্‌সনরা চায় কালই সে বাড়ী চলে যাক্, তাও তো সে চায় না। তারা দেখবে কাজ না করে টাকা পাচ্ছে সে। টাকা নেওয়াটা তার কাছে অন্যায় মনে হয়। দমে যায় ক্যেরী, পথ খুঁজে পায় না। টাকাটা হাতে রয়েছে অথচ খরচ করার উপায় নেই, ক্যেরীর অবস্থা শোচনীয়।

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করে সে টাকাটা ফেরৎ দেবে। ড্রুয়েকে বলতে হবে, ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে সে। তবু আশ্চর্য্য, টাকাটা হাতে থাকায় সে একটু আশ্বস্ত বোধ করছে। টাকা টাকা টাকা। টাকা থাকলে কী না করা যায়। তার যদি অনেক টাকা থাকতো, এসব সমস্যাই উঠতো না।

আমি বলছি কোনরকম বিরক্ত করবো না তোমাকে, ভয় পাবার কী আছে ?

ক্যেরীর মুখটা বেশ মিষ্টি। সাধারণ শপ্-গার্লদের মতো বোকা-সোকা মাথা-মোটা দেহসর্ব্বস্ব নয় ক্যেরী। ড্রুয়ের ভালো লেগেছে ওকে।

সত্যিই ক্যেরীর রুচিবোধ আছে, ড্রুয়ের চেয়ে অনেক বেশী কল্পনাশক্তি আছে তার। আছে বলেই এতো একা একা হতাশ লাগে তার। সস্তা হলেও পোষাকটা তার পরিচ্ছন্ন, মুখটায় তার একটা আশ্চর্য্য কমনীয়তা।

—আপনার কী মনে হয়, আমার একটা কাজ হবে ?

ওর কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে ড্রুয়ে বলে, নিশ্চয়ই, আমি তো আছি, আমিও দেখ্ছি।

ড্রুয়ের দিকে তাকায় ক্যেরী। ও আশ্বাস দিয়ে হাসে।

—শোনো, চলো পার্টরিজে গিয়ে যা যা দারকার কিনে নিই। তারপর একটা ঘর ঠিক করে ফেলি। জিনিষগুলো ওখানে রেখে তারপর চলো রাত্তিরে সিনেমায় যাই।

ক্যেরী ঘাড় নাড়ে।

—আচ্ছা, তাহলে বাসাতেই ফিরে যেও তুমি। নাহলে তোমার ঘরে নাই থাকলে রাত্তিরে। জিনিষগুলো রেখে চলে যেও।

ক্যেরী তখনো সন্দেহ দোলায় দুলছে।

খাওয়া শেষ হলে ড্রুয়ে বললো—চলো জামা-কাপড়গুলো দেখি এবার।

দোকানে এসে ঝল্‌মলে পোষাকের ভীড়ে ক্যেরী হারিয়ে ফেলে নিজেকে। সব কিছুই সে চায়। ড্রুয়ের সামনে এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটা সম্ভব বলেই মনে হয় তার। একটা জ্যাকেট পছন্দ করে সে, হাতে নিয়ে আরো সুন্দর মনে হয় সেটাকে। দোকানের মেয়েটা পরিয়ে দেয় জামাটা। বাঃ জামাটা ফিট্ করে গেছে চমৎকার। নতুন পোষাকে ক্যেরীকে দেখে ড্রুয়ে খুব খুসী হয়। কতো স্মার্ট সুন্দর দেখাচ্ছে আরো।

ড্রুয়ে বলে—দেখোতো, এই না হলে। ক্যেরী আয়নার দিকে ফিরে দেখে নিজেকে। বাঃ। কতো সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

ডুয়ে বলে, দেখেছো, নাও এবার দামটা দিয়ে দাও।

ক্যেরী বলে, ন' ডলার।

—ঠিক আছে, দিয়ে দাও।

ক্যেরী পার্স খুলে একখানা নোট বার করে দেয়।

এবার একটা জুতোর দোকানে গেলো ওরা। কেনা হয়ে গেলে ডুয়ে বললো, পরে ফেলোনা। ক্যেরী বলে, না, এখন না। ক্যেরী বাসায় ফিরে যাবার কথা ভাবছে।

একটা পার্স আর একজোড়া গ্লাভস্ কিনে দিলো ডুয়ে। মোজাটা ক্যেরী নিজেই কিনলো, ডুয়ে বলে, কাল এসে একটা স্কার্ট কিনে নেবে কিন্তু।

· ক্যেরী সব করে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত মনে নয়। যতই জড়িয়ে পড়ছে সে, ততই ভাবছে এইতো এটা তো আর করিনি, পথ তো খোলাই রয়েছে।

ওয়াবাশ এভিনিউতে ঘর পাওয়া যায় ডুয়ের সেটা জানা ছিল। বাইরে থেকে দেখিয়ে ক্যেরীকে বললো, এখন তুমি কিন্তু আমার বোন বুঝেছ তো। এমন ভাবে সে কথা বলে সত্যিই যেন ক্যেরী ওর বোন্। বাড়ীওয়ালীকে বলে ডুয়ে, কাল পরশু ওর ট্রাঙ্ক বিছানা সব এসে যাবে এখন।

জিনিষপত্রগুলো রেখে বাইরে এসে ডুয়ে বলে, আজই চলে এসো না কেন রাত্তিরে, দেরী করে কাজ কি?

ক্যেরী বলে। না না, এমনি করে হঠাৎ—

—ওসব ভেবোনা তুমি কিছু, তুমি চলে এলে ওদের কিছু বয়ে যাবে না। আমি তো সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এমনি করে বোঝায় ওকে ডুয়ে, আস্তে আস্তে ক্যেরীর দ্বিধা সন্দেহ কেটে যায়। সত্যিই ডুয়ে বিশ্বাস করে সে একটা কিছু করে দিতে পারবে ক্যেরীর।

ও বলে, সোজা চলে যাও জিনিষপত্র নিয়ে এসো। আরো খানিকক্ষণ ভাবে ক্যেরী তারপর মন স্থির করে ফেলে। সাড়ে আটটার সময় দেখা করবে সে ডুয়ের সঙ্গে।

বাড়ী ফিরতে মিন্নি বলে, তাহলে আজও হলো না কিছু?

আড়চোখে তাকিয়ে ক্যেরী উত্তর দেয় না। মিন্নি বলে, এ শীতটা আর

বোধ হয় হবে না কিছু। ক্যেরী কোন উত্তর দিলো না। হ্যান্সন্ বাড়ী ফিরলো, সেই এক ভঙ্গী। ডিনারে বসে ক্যেরীর কিন্তু কেমন কেমন লাগে।

একসময় হ্যান্সন্ হঠাৎ শুধোয়, কিছু হলো না?

—না।

আবার খেতে শুরু করে হ্যান্সন্। ঠিক করে ফেলেছে সে ক্যেরী বাড়ী চলে যাবে। একবার গেলে আবার ও আসছে, হুঁ।

ক্যেরী ভয় পায়, একি করতে যাচ্ছে সে? তবু স্বস্তি বোধ করে এই অসহ্য অবস্থাটার শেষ হবে তো।

খাওয়ার পরে বাথরুমে বসে বসে একটা চিঠি লিখে ফেললো ক্যেরী।

"বিদায় মিন্নি, আমি বাড়ী যাচ্ছি না এখুনি। এখানে থেকে আরো কিছু দিন চেষ্টা করবো। ভেবোনা। ভালই থাকবো।"

বাইরের ঘরটায় হ্যান্সন্ কাগজ পড়ছে। অন্যদিনের মতো আজও ক্যেরী দিদিকে সাহায্য করে কাপ প্লেটগুলো ধুয়ে ফেলতে। তারপর বলে, আমি একটু নীচে যাচ্ছি। গলাটা কেঁপে যায় তার।

মিন্নির মনে পড়ে হ্যান্সন্ নিষেধ করেছে। সে বলে, উনি বলেন নীচে অমন করে দাঁড়িয়ে থাকাটা ভাল দেখায় না।

ক্যেরী বললো, ও, আচ্ছা বেশ। এইবারটা শেষ, আর কখনো নীচে গিয়ে দাঁড়াবো না আমি।

টুপিটা মাথায় দিয়ে অস্থির ভাবে এদিক ওদিক করে ক্যেরী, চিঠিটা কোথায় রাখা যায়। শেষ পর্য্যন্ত মিন্নির চুলের ব্রুশটার নীচেই রাখলো চিঠিখানা।

হলের দরজাটা বন্ধ করে আর একবার চিন্তা করে ক্যেরী, ওরা কী ভাববে? তারপর আস্তে আস্তে নীচে নেমে যায় সে। নীচে গিয়ে আর একবার তাকায় সিঁড়িগুলোর দিকে। ধীরে ধীরে চলতে থাকে এবার; যেন বেড়াচ্ছে। তারপর কোণটার কাছে পৌছে তাড়াতাড়ি পা চালায়।

হ্যান্সন্ মিন্নিকে জিজ্ঞেস করে, ক্যেরী আবার নীচে গেল?

মিন্নি বলে, ও বললো এইবারটা শুধু, আর কখনো যাবে না।

হ্যান্সন্ ছেলেটার কাছে গিয়ে খেলা দিতে শুরু করে।

ভূয়ে অপেক্ষা করছিল রাস্তাটার মোড়ে। এই যে ক্যেরী, এসে গেছ তাহলে? চলো, একটা গাড়ী দেখি।

সাত

পৃথিবীতে কত রকম শক্তিই কাজ করছে! মানুষ তার কাছে কী? বাতাসের দোলায় ফর্‌ফরে একটা পাতা। আমাদের সভ্যতা এখনো মধ্যযুগের আবহাওয়া পেরিয়ে আসতে পারে নি। ঠিক পশুজীবনও বলা যায় না, শুধু সংস্কারেই তো চলে না। আবার ঠিক মানুষও নয়, সব সময় কী যুক্তি দিয়ে চলে তারা?

আবেগের দোলায় আন্দোলিত হয় সে। কখনো ঘোরে ইচ্ছার জোরে। কখনো চলে সংস্কারের বশে। একটায় ভুল করে অপরটাকে ধরে শোধরায়। আবার একটার জোরে চলতে চলতে পড়ে গিয়ে অন্যটাকে ধরে ওঠে। কতো বিচিত্র তার গতি! এমনি ভালোমন্দর ওঠাপড়ার মধ্যে দোদুল্যমান কতদিন থাকবে সে? যখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আর সহজাত সংস্কারের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে, তখন আর মানুষ সন্দেহের দোলায় দুলবে না। সত্যের দিকে নিবদ্ধ থাকবে তার বিচারবুদ্ধি।

সাধারণ আরো লক্ষ মানুষের মতোই ক্যেরীর মনে সহজাত সংস্কার আর বিচারবুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা আর জ্ঞানবোধ সংগ্রাম করে, কে কাকে ছাপিয়ে উঠবে। আকাঙ্ক্ষাই জয়ী হয়েছে। ক্যেরী চলেছে কামনার পিছনে।

পরদিন সকালে ক্যেরীর চিঠিটা পেয়ে মিন্নি চমকে উঠলো—এ কী? দেখো তো কী লিখেছে ক্যেরী?

হ্যান্‌সন্‌ বলে, কী হয়েছে?

মিন্নি বলে, ক্যেরী কোথা চলে গেছে।—কান্নাভাঙা স্বরে হ্যান্‌সন্‌ লাফিয়ে উঠলো বিছানা ছেড়ে। চিঠিটা প'ড়ে ওর মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এলো শুধু।

কোথায় গেলো সে বলো তো,—মিন্নি শুধায়।

একটু বাঁকাভাবে হেসে হ্যান্‌সন্‌ বলে, আমি কী জানি! হলো তো এবার, চলেই গেলো সে যেখানে যাবার!

অবাক্ হয়ে মিন্নি মাথা নাড়ে—কী করলো, একি করলো সে! সে যে বোঝে না।—

খানিক পরে হ্যান্সন্ বলে, তুমি আর কী করবে?

মিন্নি মেয়েমানুষ, এর পরিণতিটা ভেবে সে আঁৎকে ওঠে—হায় রে পোড়াকপালী, এই করলি তুই।

তখন ভোর পাঁচটা। ক্যোরী তার নতুন ঘরে নতুন কেনা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে! ঘুমটা সহজ শান্তি নয়, কতো সব চিন্তা ঘুমের মধ্যে তার। ক্যোরী ভবিষ্যতের জাল বোনে। সেতো বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতে চায় না। একদিকে সাহস করে এগিয়ে যাওয়ার ভয়, অন্যদিকে মুক্তির আনন্দ। সত্যিই সে চাকরী একটা পাবে কিনা, ড্রুয়েই বা শেষ পর্যন্ত কী করবে এইসব ভাবে ক্যোরী।

ড্রুয়েই বা অন্য কী করতে পারতো? তার মনের গতি, তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এটা। প্রতিদিন খাওয়ার মতোই ক্যোরীকে নিয়ে খেলা করাটাও তার পক্ষে প্রয়োজনীয়। কী হলো আর কী হলো না। এ নিয়ে তার কোন মাথা ব্যথা নেই। খারাপ ভালো। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়ের সম্বন্ধে তার ধারণাটা অমনি। হয়তো একটু অনুশোচনা বোধ করবে সে খারাপ কিছু হলে। কিন্তু সেটা প্রাথমিক সংস্কার মাত্র অন্য কিছু নয়।

পরের দিন সে ক্যোরীর সঙ্গে দেখা করতে গেল, আগের মতই হাসিখুসী ফুর্তি নিয়ে।

—কী এত চিন্তাটা কিসের? চলো ব্রেকফাস্টটা সেরে আসি। হ্যাঁ, কাপড়-জামা তো আরো কিছু কিনতে হবে।

ক্যোরী অন্য কী ভাবছিল। ড্রুয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, চাকরী একটা কিছু না পেলে ভালো লাগছে না।

ড্রুয়ে বলে, হবে হবে। এখন থেকে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? ঠিক হয়ে এখানে গুছিয়ে বসো, শহরটা দেখে শুনে নাও। তারপর—আমি তো আর তোমার কোন ক্ষতি করছি না।

সম্পূর্ণ বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করলো না ক্যোরী, তবু বললো, না সে কথা হচ্ছে না।

—নতুন জুতো জোড়াটা পরাতো দেখি, কেমন হয়েছে? বাঃ চমৎকার! এইবার জ্যাকেটটা পরোতো।

ক্যেরী জ্যাকেটটা পরার পর ড্রুয়ে তাকিয়ে দেখে আপাদমস্তক, বলে, আর একটা নতুন স্কার্ট, ব্যস্। ক্যেরীকে যা মানাবে! চলো ব্রেকফাস্টে যাই এবার।

টুপিটা নিতে ড্রুয়ে জিজ্ঞাসা করে, কই গ্লাভ্‌সটা?

গ্লাভ্‌স জুটোও পরতে হলো ক্যেরীকে। ড্রুয়ে বলে, চলো এবার।

এমনি করে ক্যেরীর সন্দেহ দ্বিধার প্রথম মুহূর্ত্তটা কেটে গেল। সব ক্ষেত্রেই এমনি। ড্রুয়ে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। ক্যেরী কখনো কখনো একা থাকতে চাইতো, একটু ভাবার অবকাশ খোঁজে সে। ড্রুয়ে কিন্তু সব সময় কাছে কাছে থাকে। শহর দেখায়, ঘুরে বেড়ায় ওকে নিয়ে। একটা নতুন স্কার্ট, আরো কিছু টুকিটাকি কিনে দিলো ড্রুয়ে। নতুন পোষাকে ক্যেরী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, আর মুগ্ধ হয়। সত্যিই সে সুন্দর। নিজের শক্তিকে অনুভব করে বৈকি? ড্রুয়ে কতো ভালো!

শীতের সন্ধ্যায় একদিন ঝরাপাতার নাচ দেখে ক্যেরীর মনে পড়ে তার বাড়ীর কথা। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় সে। ড্রুয়ে বুঝতে পারে সেটা, সাহস দেয়, ভুলিয়ে দেয় ওকে। ক্যেরী আবার মিশে যায় রাস্তার খুসীভরা পরিবেশে। কাজ শেষে ঘরে ফেরার আনন্দ, জীবন উপভোগের প্রস্তুতি।

হঠাৎ ক্যেরীর চোখে পড়ে একটি মেয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কে ও? কারখানার একটি খেটে খাওয়া গরীব মেয়ে। ওর পাশে ক্যেরী কাজ করেছিল ক'দিন। ক্যেরী চমকে ওঠে, পুরোনো দিনগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। অচেনা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে ক্যেরীর। ড্রুয়ে বলে, ভাবছিলে নিশ্চয়ই, হুঁ।

ডিনারের পর থিয়েটারে যায় ওরা। খুব ভালো লাগে ক্যেরীর। আলো ঝলমল্ হলে, রঙ আর ঐশ্বর্য্যের মনমাতানো পরিবেশ। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ক্যেরী বলে, কী চমৎকার, না?

ড্রুয়ে বলে, সুন্দর। এই পরিবেশে সেও কি কম অভিভূত হয়েছে? ক্যেরীর

হাতে চাপ দেয় ড্রুয়ে, ক্যোরী হাসে। ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ড্রুয়ে বলে, তোমাকে যা দেখাচ্ছে, অদ্ভুত সুন্দর।

এরপর আরো কিছু খেয়ে নিল ওরা। সারাদিনের বৈচিত্র্য, ড্রুয়ের আবেগ-ভরা দৃষ্টি, এই বিলাসী দিনটা ক্যোরীর মনকে মাতিয়ে তুলেছে। চিকাগো ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একসময় ড্রুযে বলে, চলো এবার ফেরা যাক্। কথা বলার সময় মাঝে মাঝে ড্রুযে ওর হাত চেপে ধরে, কোনো একটা বিষয় ভালো করে বোঝবার জন্যে হয়তো। এবারও বাসায় ফেরার কথা বলে ড্রুয়ে ক্যোরীর হাতে চাপ দেয়। ড্রুযে ওর হাতটা জড়িয়ে ধরে চলতে চলতে নানান্ গল্প বলে, ক্যোরীকে বোঝায়। কোন একটা মজার কথা বলে ড্রুযে ক্যোরীর দিকে তাকায় বাহবা পাবার জন্য—দুজনের চোখ মেলে কতবার। বাসায় এসে সিঁড়িতে উঠে দাঁড়ায় ক্যোরী। ড্রুয়ে নিচে দাঁড়িয়ে। ওরা দুজনে মাথায় এক হয়ে গেছে। ক্যোরীর হাতটা ধরে ড্রুয়ে হাসে ওর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিযে। ক্যোরী ভাবে, মাঝে মাঝে চোখটা ফিরিয়ে নেয়।

সারা সন্ধ্যা নানারকম ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে মিন্নি এখন ঘুমোচ্ছে। ওর হাতটা চাপা পড়ে আছে একদিকে। কীসব স্বপ্ন দেখে মিন্নি। ক্যোরী আর ও একটা পুরোনো কয়লাখনির পাশে দাঁড়িযে আছে গভীর একটা খাদের দিকে তাকিয়ে। আধ ভিজে পাথরের মত চাপ দেখা যাচ্ছে, তারপর অন্ধকারে মিশিয়ে গেছে সব, একটা ঝুড়ির মত নেমে যাবার কেজ্। দড়িটা পুরোনো, জীর্ণ হয়ে গেছে।

ক্যোরী বলে, চলো যাই।

মিন্নি বলে, না, না।

ক্যোরী বলে, এসো না। তারপর কেজ্‌টায় উঠে পড়ে সে। নেমে যাচ্ছে কেজ্‌টা। মিন্নি চেঁচিয়ে ডাকে, ক্যোরী, যাস্ না, যাস্ না, ফিরে আয়। কোথায় ক্যোরী? অন্ধকারে মিশিয়ে গেছে সে।

হাতটা সরিয়ে নিয়েছে মিন্নি।

দৃশ্যটা বদলে গেছে। এবার ওরা দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা জলাশয়ের

ধারে। একটা বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ক্যোরী একেবারে ওদিকের প্রান্তে, বোর্ডটা ডুবে যাচ্ছে। মিলি ডাকে, ক্যোরী পালিয়ে আয়। ক্যোরী কিন্তু আরো দূরে চলে যাচ্ছে।

ক্যোরী, ক্যোরী, মিলি চেঁচিয়ে ডাকার চেষ্টা করে। কিন্তু তার গলাটাই যে ক্ষীণ হয়ে আসছে। শোনা যায় না।

এমনি ধারা আরো কয়েকটা স্বপ্ন দেখে সে, একের মধ্যে আর একটা মিশে যাচ্ছে, রহস্যময় পরিবেশ, অদ্ভুত গা-ছম ছম দৃশ্য। শেষে একসময় মিলি চীৎকার করে ওঠে, ক্যোরী একটা পাহাড় থেকে নীচে পড়ে যাচ্ছে।

হ্যান্সন্ ধাক্কা দিয়ে ওকে তুলে দেয়—কী হলো, মিলি, কী হয়েছে?

মিলি ঘুমের ঘোরেই বলে, কী হয়েছে?

হ্যানসন্ বলে, উঠে পাশ ফিরে শোও। তুমি ঘুমের মধ্যে কথা বলছিলে।

সপ্তাহ খানেক বাদে ড্রুয়ে একদিন ফিজেরাল্ডে গেলো। হার্স্টউড্ অফিসে বসেছিলেন, সেখান থেকেই বলেন, হ্যাল্লো, চার্লি যে।

ড্রুয়ে সোজা চলে যায় ম্যানেজারের টেবিলে।

হার্স্টউড্ বলেন এবার যে দেখতে পাইনি তোমাকে, কী ব্যাপার?

ড্রুয়ে বলে, একটু ব্যস্ত ছিলাম।

কতক্ষণ এটা ওটা সাধারণ কথাবার্তা হয়। হঠাৎ একসময় ড্রুয়ে বলে, একদিন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গে চলো।

—কোথায়?

ড্রুয়ে হেসে বলে, কোথায় আবার, আমার বাসায়।

হার্স্টউড্ অবাক্ হয়ে ওর দিকে তাকায়। ড্রুয়ের মুখটা ভালো করে নিরীক্ষণ করে বলে, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই যাবো।

—বেশ একহাত খেলা যাবে এখন।

—ভালো শেরী একটা নিয়ে যাবো নাকি?

ড্রুয়ে বলে, বেশ তো, এনো না। আমি পরিচয় করিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে।

আট

নারীকে বিচার করার একটা মাপকাঠি আছে পৃথিবীর। সেদিক থেকে ক্যেরীর মানসিক অবস্থাটা অনুধাবন যোগ্য। কারণ, তার কাজের বিচার হবে যথেষ্ট সেই মাপকাঠিটা দিয়ে।

স্পেনসার আর আমাদের বর্তমান দার্শনিকরা যে যাই বলুন না কেন, নীতি সম্বন্ধে আমাদের একটা শিশুসুলভ সংস্কার আছে। কিন্তু আবর্জনের নিয়ম ছাড়াও অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। আমরা যা বুঝি, মানি, তার চেয়েও অনেক গভীর কিছু রয়ে গেছে। কেন আবেগ জাগে? একটা করুণ স্পন্দন যেন সারা জগৎ ঘুরে বেড়ায়। গোলাপের বুকে কেমন করে আলো আর দৃষ্টি মিলে রক্তিমাভা ফোটায়? এরি মধ্যে খুঁজে পাবে নীতিজ্ঞানের প্রথম নিয়ম।

ড্রুয়ে ভাবে, কী জিনিষই না পেয়েছি আমি।

ক্যেরী দ্বিধা সন্দেহে দোদুল্যমান। ভয়ে ভয়ে সে ভাবে, কী যেন হারিয়ে ফেল্লাম আমি?

এই প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা থমকে যাই ভেবে কূল পাই না। নীতি-জ্ঞানের সত্যটা কি? কোন্টা ঠিক্, কী ভালো, এই প্রশ্নের জবাবের জন্য মাথা খুঁড়ি আমরা।

সমাজের একস্তরের হিসাবে ক্যেরী বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। ভাগ্যহত বুভুক্ষু যারা তারা ভাবতে পারে ক্যেরী সৌভাগ্যের দেখা পেয়েছে। জীবনের ঝড় বৃষ্টি তুফান এড়িয়ে সুন্দর আরামে দিন কাটাচ্ছে।

চিকাগোর সুন্দর একটা পাড়ায় ড্রুয়ে তিনকামরা একটা বাড়ী নিয়েছে। ঘরের জানালা দিয়ে পার্কের সবুজ আস্তরণের দিকে তাকিয়ে আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য-সুখের কথা ভাবা যায়। ঘরগুলো বেশ রুচিসম্মতভাবে সাজানো। বেলজিয়ান-কার্পেট, বড় দেওয়াল আয়না, কৌচ, রকিং চেয়ার, ক'খানা ভালো ছবি, ঘর সাজানো আরো ছোটখাটো আসবাব টুকিটাকিতে স্বাচ্ছন্দ্যের আভাস সুপরিস্ফুট।

শোবার ঘরে ক্যেরীর ট্রাঙ্কটা। ওয়ার্ডরোবে, পোষাকের সারি, ক্যেরী সারাজীবনেও এতো পোষাক পরেনি। তাও আবার এমন সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের। আরো একটা ছোট ঘর আছে, দরকার হলে রান্না করা যাবে ওটায়। একটা গ্যাসের স্টোভ লাগানো হয়েছে।

এমনি একটা ফ্ল্যাটে ক্যেরী এখন থাকে। ক্যেরী এখন নতুন আর কেউ। আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে ক্যেরী দেখে কতো সুন্দর সে। মনের আয়নায় সে কিন্তু দেখে অন্য আর এক চেহারা। লোকের চোখে সে কী? কতো নিচে নেমে গেছে সে। কোন্‌টা সত্যি? এই দুটো প্রতিফলনের দিকে তাকিয়ে সে সন্দেহে দোলে।

ড্রুয়ে প্রায়ই বলে, ক্যেরী, তুমি একটা অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর।

খুসী হয়ে ক্যেরী হাসে।

ড্রুয়ে আবার বলে, তুমি জানো না কতো সুন্দর তুমি!

ক্যেরী আনন্দ পায়। সে যে গর্ব অনুভব করে এতে সেটা সে মানতে চায় না মেনেও। সে বলে, কী জানি, আমি জানি না।

তার বিবেক তো আর ড্রুয়ে নয়। সেটা মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে তাকে। তার সঙ্গে তর্ক করে সে, বিবেককে বোঝায়।

অন্তরটা বলে, তুমি তো ব্যর্থ, পরাজিত হয়ে গেছ।

সে বলে, কেন?

উত্তর আসে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখো। যারা সত্যি ভালো সৎ, তারা তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি যা করেছ, ওরা কি তাই করতো। তুমি তো চেষ্টা না করেই হার মেনে নিয়েছ।

একা একা ক্যেরী যখন বসে বসে লন্‌টার দিকে তাকিয়ে ভাবতো তখন এই সব প্রশ্ন উঠতো মনে। কিন্তু তেমন করে বোঝাতে পারতো সে তাকে? সব সময়ই একটা জবাব থাকতো তার, কী করতে পারতে সে এই দুর্দিনে বাঁচার জন্যে! একা সে, কত ক্ষমতা তার, তার ভয় করে শীতের রাতের ঝড়ঝঞ্ঝা বৃষ্টি-বাদলকে। অভাবের প্রশ্নটা জবাব দিতো তার হয়ে।

এমনি মানসিক সংঘর্ষ কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই থাকতো না ক্যেরীর।

ক্যোরী বিষণ্ণ ভাবুক প্রকৃতির মেয়ে নয়। তাছাড়া কোনো স্পষ্ট দৃঢ় ধারণাকে সে বিশ্বাস করে ধরে রাখতে পারতো না। যুক্তির ধাঁধাঁয় পথ হারিয়ে ফেললে সে সোজা ফিরে আসতো ওসব চিন্তা থেকে।

ড্রুয়ে কিন্তু বেশ আদর্শ মানুষের মতো চলতে শুরু করেছে। তার মতো লোকের পক্ষে আদর্শ ছাড়া কি? ক্যোরীর জন্য খরচ করে সে, তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এমনকি টুরে গেলেও সঙ্গে নিয়ে যায় তাকে। দু তিনদিনের জন্য কখনো কখনো কাছাকাছি কোথাও হলে ড্রুয়ে হয়তো একাই যেত, তবু ক্যোরী আর ড্রুয়ে প্রায় একসঙ্গেই থাকে সব সময়।

একদিন সকালে ড্রুয়ে বললে, শোনো ক্যোরী, আমার এক বন্ধু হার্স্টউডকে নিমন্ত্রণ করেছি—এখানে সন্ধ্যাবেলা।

ক্যোরী দ্বিধার সঙ্গে বলে, কে তিনি?

—ও, চমৎকার লোক, দেখবে। ফিজেরাল্ড এণ্ড ময়ের ম্যানেজার।

—কী সেটা?

—ও, জানো না তুমি? সবচেয়ে বড় রেষ্টুরেণ্ট চিকাগোর। বড়লোকের জায়গা। ক্যোরীর একটু ধাঁধাঁ লেগে গেছে। ড্রুয়ে কী বলেছে ওঁকে, কে জানে। সে কী বলবে? ক্যোরী ভাবতে থাকে।

ড্রুয়ে বুঝতে পারে ক্যোরী কী ভাবছে, সে বলে,—কিচ্ছু ভেবোনা তুমি। ও কিছুই জানে না। তুমি তো এখন আমার স্ত্রী।

কথাটায় ক্যোরীর একটু ঘা লাগে, ড্রুয়ের অনুভব শক্তিটা স্থূল বলে মনে হয় ওর। ড্রুয়ে কতো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে সব মনে পড়ে। ক্যোরী বলে,—আচ্ছা বিয়েটা কবে হবে আমাদের?

ড্রুয়ে বলে, এই তো হাতের কাজটা সেরে ফেলি, তারপরেই হবে।

ওর একটা সম্পত্তির কথা বলেছিল ড্রুয়ে, সেটা নিয়ে বেশ ব্যস্ত নাকি ও, তারই কথা বলে আবার।

—ডেনভার থেকে ফিরে এলেই এবার জানুয়ারীতে বিয়ে, নিশ্চয়ই।

ক্যোরীর আশার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এই প্রতিশ্রুতিটাকে। তার

বিবেককে বোঝাবার এই তো সবচেয়ে বড় জবাব তার। এই তো সব সমস্যার সমাধানের পথ।

ডুয়ের সম্বন্ধে ক্যোরী যে খুব মুগ্ধ হয়ে আছে এখনো তা নয়। ডুয়ের চেয়ে তার বোধশক্তি বেশী। ডুয়ের যেটা অভাব, সেটা সে বুঝতে পারে এখন। এই বোধশক্তিটা না থাকলে সে হয়তো চরমভাবে তলিয়ে যেতো। ডুয়ের জন্ম পাগল হয়ে উঠতো সে, তার ভালোবাসা হারাবার ভয়ে সে সব কিছু করতে পারতো। প্রথম প্রথম ডুয়েকে সম্পূর্ণভাবে পাবার জন্ম ঔৎসুক্য ছিল তার, তারপর এখন প্রতীক্ষাতেই যেন তার ভালো লাগে। ডুয়ের সম্বন্ধে সে যে কী ভাবে, কী করতে চায় তা নিজেই জানে না ক্যোরী।

হার্স্টউডকে দেখে ক্যোরীর মনে হলো ডুয়ের চেয়ে হাজার গুণ বুদ্ধিমান্। মেয়েদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করতে জানেন ভদ্রলোক। যে সম্মান শ্রদ্ধা ক্যোরীকে দেখালেন হার্স্টউড্ তাতে খুব খুসী হলো সে। সংকোচও নেই অথচ বেশী গায়ে পড়া ভাবও নেই। সবচেয়ে ভালো লাগে ওঁর মনোযোগ খুসী করার প্রতি আগ্রহ। নম্র, ধীর, আত্মবিশ্বাসী হার্স্টউড্। রুচিসম্পন্ন যে কোনো মেয়ের প্রতি তিনি এমনি আগ্রহশীল ভদ্র।

ডুয়েও মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি দেয় তবে যদি তার স্বার্থ থাকে, যদি সে জানে তাতে কিছু ফল হবে তবেই। হার্স্টউডের মত মার্জিত ব্যবহার সে পাবে কোথায়। ওর স্বভাবটা হৈ হৈ করার মতো। নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে সে। আত্মম্ভরী বেশী ফুর্তিবাজ ডুয়ে।

ক্যোরীর দিকে তাকিয়ে হার্স্টউড্ হেসে বলেন, একটা পিয়ানো নিয়ে এসো হে এবার।

ডুয়ে একথাটা কোনদিন ভাবেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আনতে হবে একটা।

ক্যোরী সাহস করে বলে, আমি কিন্তু বাজাতে জানি না।

হার্স্ট উড্ বলে, তাতে কি, এমন শক্ত কিছু নয়, দু-তিন মাসেই শিখে যাবেন বেশ।

হার্স্টউড্ আজ বিশেষ করে খুসী করার জন্তেই যেন এসেছেন। পোষাকটা নতুন ঝক্‌ঝকে, বেশ দামী অথচ ড্রুয়েব পোষাকের মত অত্যন্ত স্পষ্ট চোখে লাগার মতো নয়। ক্যেরী বোঝে দামী কাপড়জামার মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। কতকগুলো আসে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্বাভাবিকভাবে, কতকগুলো চেষ্টা-প্রসূত। নিজের অজান্তেই ড্রুয়ে আর হার্স্টউডের পার্থক্যটা অনুভব করে সে।

হাল্কা কথাবার্তার পর একসময় হার্স্টউড্ বলেন, একহাত ইউকার খেললে কেমন হয়? ক্যেরীর অতীত জীবন সম্বন্ধে তিনি যে কিছু জানেন তার ইঙ্গিত-মাত্র বোঝা যায় না হার্স্টউডের কথাবার্তায়। কেমন কৌশলে এসব প্রশ্ন এড়িয়ে যান তিনি। তাঁর কথাবার্তায় আচরণে ক্রমশঃ ক্যেরী সহজ হয়ে ওঠে, খুসী হয় ওঁর ব্যবহারে। যা কিছু বলে ক্যেরী গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনেন সব কিছু।

ক্যেরী বলে,—আমি ও খেলা জানি না।

ড্রুয়ের দিকে তাকিয়ে শাসনের ভঙ্গীতে হার্স্টউড্ বলেন,—চার্লি, কর্তব্য-পালনে অবহেলা করছ তুমি।

তারপর বলেন,—আচ্ছা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি।

হার্স্টউড্ ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন ড্রুয়েকে, তার পছন্দের প্রশংসা করছেন।

হাবভাবে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে এসে খুসী হয়েছেন তিনি। ড্রুয়েও খুসী হয়; হার্স্টউডকে খুব ভালো লাগে। ক্যেরীর সম্বন্ধে ওর শ্রদ্ধা জাগে। হার্স্টউডের প্রশংসমান দৃষ্টির সামনে ক্যেরীর চেহারাটা আরো সুন্দর মনে হয়।

ক্যেরীর কাঁধের উপর দিয়ে তাসগুলোর দিকে তাকিয়ে হার্স্টউড্ বলেন, কী পেয়েছেন আপনি? বাঃ আপনার হাত তো বেশ ভালো। আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি আপনার স্বামীটিকে কেমন করে হারানো যায় দেখছি।

ড্রুয়ে বলে,—ওরে বাবা, তোমরা দুজনে মিলে প্ল্যান করলেই গিয়েছি আর কী? হার্স্টউডতো ইউকারের রাজা।

—উঁহু, তোমার স্ত্রী হে, আমি নই। দেখ্‌ছ না আমার কপাল ফিরিয়ে দিয়েছেন। উনি তো জিতবেনই।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকায় ক্যেরী হার্স্টউডের দিকে, তারপর ড্রুয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে। বন্ধুর মতো হার্স্টউডের ব্যবহার, তিনি শুধু সন্ধ্যাটা উপভোগ করছে

এসেছেন। ক্যোরী যা কিছু করে তাতেই আনন্দ পান তিনি। এর বেশী কিছু নয়।

নিজের একটা ভাল তাস আটকে রেখে ক্যোরীকে একটা পিঠ নিতে দেন তিনি।

—বাঃ, বেশ খেলেছেন তো আপনি।

ক্যোরী খুসী হয়ে হাসে ছেলেমানুষের মতো। হার্স্ট‌উড্ সাহায্য করলে সে যেন অপরাজেয়। তার দিকে বেশী তাকান না হার্স্ট‌উড্। যখন তাকান তখন শুধু বন্ধুত্বের উদার নিরীহ দৃষ্টি।

খানিকবাদে হার্স্ট‌উড্ বলেন,—শুধু হাতে কতক্ষণ খেলা যায়?

একমুঠো খুচরো পয়সা বার করেন এবার,—আসুন পয়সা রেখে খেলা যাক্।

ড্রুয়ে বলে,—বেশ তো। সেও একমুঠো পয়সা বার করে ভাগ করে রাখে।

ক্যোরী হেসে বলে,—এতো জুয়ো খেলা।

ড্রুয়ে বলে,—জুয়ো কোথায়, একটু মজা করা আর কি? পয়সার বাজীতে খেলা আবার জুয়ো। বেশী টাকা নিয়ে যদি না খেলো কিছু পাপ হবে না এতে।

হার্স্ট উড্ ক্যোরীকে মিষ্টি করে বলেন,—পয়সাগুলো দিয়ে কী হয় দেখুন আগে, তারপর না হয় পাপ পুণ্য ঠিক করবেন।

ড্রুয়ে হাসে।

—আপনার স্বামী যদি পায় তখন ও বলবে, ভীষণ খারাপ এসব।

ড্রুয়ে হো হো করে হাসে। ক্যোরীও ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হাসে।

হার্স্ট‌উড্ ড্রুয়েকে বলেন,—কবে বেরুচ্ছ তুমি?

—বুধবার।

ক্যোরীকে বলেন হার্স্ট‌উড্,—আপনার স্বামী এরকম ঘুরে বেড়ায়, খুব খারাপ লাগে আপনার, না?

ড্রুয়ে বলে,—উনি তো যাচ্ছেন আমার সঙ্গে।

—বাঃ, তাহলে অবশ্য ভালো কথাই। তোমরা দুজনে একদিন থিয়েটারে চলো আমার সঙ্গে যাবার আগে।

ড্রুয়ে বলে,—নিশ্চয়ই, কী বলো ক্যোরী?

ক্যোরী বলে, বেশ তো।

হার্স্টউড্ চেষ্টা করেন, ক্যোরীই যাতে পয়সাগুলো জেতে। ক্যোরী জিতলে খুসী হন তিনি, শেষে গুনে নিয়ে ওর হাতে দিয়ে দেন।

খাওয়ার পর হার্স্টউড্ মদ ঢেলে দেন সবাইকে।

যাবার আগে হার্স্টউড্ প্রথমে ক্যোরী পরে ড্রুয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন,—সাড়ে সাতটার সময় তৈরী হয়ে থাকবেন কিন্তু, আমি এসে তুলে নিয়ে যাবো।

দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল ওরা। আধছায়ায় হার্স্টউডের গাড়ীটার লাল আলো দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

ড্রুয়েকে বলেন হার্স্টউড,—তুমি যখন একা বাইরে যাবে, আমাকে বলো আমি মাঝে মাঝে ওঁকে ঘুরিয়ে আনবো। একা একা ভালো লাগবে কেন?

ক্যোরীর সম্বন্ধে হার্স্টউডের আগ্রহ দেখে খুসী হয় ড্রুয়ে। বলে,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে তো খুব ভালো কথা।

ক্যোরী বলে, অশেষ ধন্যবাদ।

হার্স্টউড্ বলেন,—না না, এ আর কি? আপনার স্বামীর কাছ থেকেও তো এরকম সাহায্য আশা করি আমি।

হেসে চলে গেলেন হার্স্টউড্। ক্যোরীর ভীষণ ভালো লেগেছে তাঁকে। এরকম মার্জিত রুচি ভদ্রলোকের সংস্পর্শে সে আর আসেনি। ড্রুয়েও খুব খুসী।

ঘরে ফিরে এসে ড্রুয়ে বলে,—চমৎকার লোক, আমার খুব বন্ধু।

ক্যোরী বলে,—আমারো বেশ লাগলো ভদ্রলোককে।

নয়

ক্যোরীদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকতেন ষ্ট্যাণ্ডার্ড থিয়েটারের ম্যানেজার মিঃ ফ্র্যাঙ্ক এ. হেল। স্ত্রীটিকে দেখতে মন্দ নয়, বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। আমেরিকার সাধারণ একটি পরিবার, স্বচ্ছন্দে থাকে। হেলের মাইনে সপ্তাহে পঁয়তাল্লিশ ডলার। কিন্তু বাঁচে না কিছু, সংসারধর্ম্ম করা মিসেস হেলের পোষায় না। ছেলেপিলে নিয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাঁর ভালো লাগে না।

হার্স্টউড্ যেদিন ক্যোরী আর ড্রুয়েকে নিয়ে থিয়েটারে গেলেন সেদিন ওর

ছেলে জর্জও কারমাইকেলের মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। হার্স্টউড চিরদিনই বক্সের একটু পিছনের দিকে বসেন, ছেলেকে দেখতে পাননি।

পরের দিন জর্জ ব্রেকফাস্টের সময় বলে,—কাল রাত্রে তোমায় দেখলাম বাবা?

—কোথায়, তুমিও ম্যাক্‌ভাইকারে গিয়েছিলি নাকি, হার্স্টউড্ সহজভাবেই হেসে উত্তর দেন।

জর্জ বলে,—হ্যাঁ।

—আর কে ছিল তোমার সঙ্গে।

—মিস্ কারমাইকেল।

· মিসেস্ হার্স্টউড্ জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকান স্বামীর দিকে। কিন্তু হার্স্টউডের মুখ দেখে বোঝা যায় না এমনি তিনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন, না অন্য কেউ সঙ্গে ছিল অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। বলেন, কেমন বইটা?

হার্স্টউড্ বলেন,—ভালোই, তবে সেই একই বিষয়টা. রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কলের গল্প।

একটু উদাসীনতার ভান দেখিয়ে মিসেস্ হার্স্টউড্ বলেন,—কার সঙ্গে গিয়েছিলে?

—চার্লি ড্রুয়ে আর তার স্ত্রী। ময়ের বন্ধু, এখানে এসেছেন।

তাঁর যা চাকরী সে হিসেবে এতে দোষের কিছু নেই। তাঁর স্ত্রী মেনে নিয়েছেন যে স্বামীকে এমন কতকগুলো পার্টিতে আড্ডায় যেতে হয় যেখানে তাঁকে বাদই দিতে হয়। কিন্তু ইদানীং তিনি বারবার অনুরোধ করেও হার্স্টউডকে সন্ধ্যাবেলা সঙ্গে পান নি, সবসময়ই বলেছেন, অফিসের কাজ আছে। আগের দিন সকালেও ঠিক এই কথাই বলেছেন তিনি।

খুব সাবধানে বলেন মিসেস্ হার্স্টউড্, আমি ভেবেছিলাম তুমি খুব কাজে ব্যস্ত থাকবে।

হার্স্টউড্ একটু জোরেই বলেন,—ব্যস্তই তো ছিলাম। কী করবো ওটা এড়ানো গেল না। তার জন্যে রাত দুটো পর্যন্ত কাজটা সারতে হলো আমাকে।

তখনকার মতো প্রশ্নটা চাপা পড়লো, কিন্তু মতের পার্থক্যটা একটু মাথা

উঁচু করেই রইলো। গত ক'বছর ধরেই স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য ঠিক পালন করছেন না হার্স্টউড্‌, তাঁর সান্নিধ্যের কোন আকর্ষণ খুঁজে পান না তিনি। মুখ ফিরিয়ে চললেই খুশী হন, পিছনে তাকাতে বললে বিরক্তি বোধ করেন। স্ত্রী কিন্তু তাঁর প্রাপ্যটা পুরোপুরিই চান, মনের মিল থাকুক না থাকুক, সম্পর্কের দাবী মেটানো চাই-ই তাঁর।

কয়েকদিন পরে তিনি বলেন, আজ বিকেলে সহরের বাইরে যাবো একটু, কিংসলিতে মিঃ ফিলিপ্‌স আর ওঁর স্ত্রী আসবেন; তুমি চলে এসো ওঁদের একটু ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। ট্রেমণ্টে আছেন ওঁরা।

বুধবারের ঘটনাটার পর হার্স্টউডের পক্ষে আমন্ত্রণটা ফিরিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। ফিলিপ্‌সদের পছন্দ করেন না তিনি, তবু রাজী হতে হলো। বার হবার সময় রাগই হলো তাঁর।—নাঃ, এসব বন্ধ করতে হবে। কাজের সময় এমনি বোকার মতো ঘুরে বেড়ানো চলবে না।

এর কিছুদিন পরেই মিসেস হার্স্টউড্‌ আর একটা দাবী তুললেন, এবার অবশ্য ম্যাটিনী।

হার্স্টউড্‌ বলেন,—দেখো লক্ষীটি আমার মোটেই সময় নেই, ভীষণ কাজ পড়েছে আমার।

মিসেস্‌ একটু বিরক্তভাবেই উত্তর দেন,—অন্য লোকের সঙ্গে যাওয়ার তোমার বেশ সময় হয় তো।

— কে বললে? ব্যবসার জন্য অনেকসময় যেতে হয়, সেটা কী করা যাবে বলো?

মিসেস্‌ বলেন, আচ্ছা, থাক্‌ তবে। বিরোধটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে হার্স্টউড্‌ কিন্তু ক্যেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ক্রমশঃ। অবস্থা আর পরিবেশের চাপে ক্যেরী অনেকটা বদলে গেছে। একটুতেই আর খুশী নয় সে। মিসেস্‌ হেলের সংস্পর্শে এসে সেও বুঝতে শিখছে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্তরভেদ ঐশ্বর্য্যেরও শ্রেণীভেদ আছে। মিসেস্‌ হেল প্রায়ই বিকালের দিকে গাড়ী নিয়ে বেড়াতে যান। ক্যেরীও যায় মাঝে মাঝে। লেকের দিকটায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাগানঘেরা বাড়ী, একটি দুটি গাড়ী, একটি দুটি লোক চলে,

বিলাসী সুখী মানুষ নামে কোনো বাড়ীর সামনে, বেয়ারা সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করে। লনে বাগানে হয়তো দু একখানা চেয়ার পাতা পা এলিয়ে গল্প করছেন কোন ভদ্রলোক সুন্দরী সুবেশ মেয়ের সঙ্গে। পরীর রাজ্য। রূপকথার মতো সুখ এখানে।

মিসেস্ হেল দুঃখ করে বলেন,—আহা আমাদের যদি অমনি একটা বাড়ী থাকতো। কী আরামে থাকা যেত।

ক্যেরী সাবধানে বলে,—লোকে বলে কেউ-ই কখনো সম্পূর্ণ সুখী নয়। আঙুর না পাওয়া শেয়ালের গল্পটা কতবার শুনেছে সে।

—কী জানি, তবু বড় বাড়ী বানানোর জন্যই তো সবাই প্রাণপণে চেষ্টা করে, মিসেস্ হেল প্রতিবাদ করে বলেন।

নিজের ঘরে ফিরে ক্যেরীর মনে হয় কতো নগন্য সে। আগের দিনে কী ছিলো তার তুলনায় অনেক কিছু পেয়েছে সে কিন্তু যা দেখে এলো তার কাছে এর মূল্য কতটুকু। ড্রুয়েই বা কী, তার নিজের দামই বা কতো?

চেয়ারে দুলতে দুলতে ক্যেরী ভাবে। উঠে গিয়ে খেয়ে আসতেও ইচ্ছা করে না তার। শুধু ভাবতে ভালো লাগে। গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে শুরু করে সে। পুরোনো দিনের একটা সুর গাইতে গিয়ে মনটা দমে যায়। শুধু আকাঙ্ক্ষা কামনা, ব্যাকুল আগ্রহ কখনো কলাম্বিয়া শহরে তাদের বাড়ীটার জন্যে, কখনো লেকের ধারে একটা বিরাট্ বাড়ীর জন্যে, কখনো একটি মহিলার সুন্দর গাউনটার জন্যে, কখনো বা চমৎকার একটা প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্যে। ভীষণ বিষণ্ণ লাগে, তবু কিছুই ঠিক করে মনে হয় না তার কী যে চায়। শুধু আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার ব্যাকুল আগ্রহ। শেষে মনে হয় কতো একাকী সে, কেউ নেই তার। কেউ নেই। কান্না পায়।

এমনি সময় চাকরটা এসে বলে মিষ্টার হার্স্টউড্ এসেছেন দেখা করতে। ক্যেরী ভাবে, হয়তো জানেন না উনি চার্লি এখানে নেই। শীতকাল পড়ে অবধি ওঁর সঙ্গে আর প্রায় দেখা হয়নি ক্যারীর। তবু মনে পড়েছে এটা ওটা দেখে। ক্যেরীর মনের ওপর একটা দাগ রেখে গেছে হার্স্টউড্। পোষাকটা পাল্টে তৈরী হয়ে ক্যেরী নিচে যায়।

হার্স্টউড্ আগের মতোই ফিট্‌ফাট হয়ে এসেছেন। ড্রুয়ে নেই শুনে বলেন, কই জানতাম না তো। তারপর সাধারণ কথাবার্তা শুরু করলেন। এমন চমৎকার আলাপ করতে পারেন উনি, ক্যেরী বিস্মিত হয়। চেয়ারটা টেনে নিয়ে কাছে বসে এমনভাবে গল্প করেন তিনি যেন ক্যেরীকে কোন গোপন কথা শোনাচ্ছেন। কতো মানুষ দেখেছেন তিনি, কতোরকমে 'মানুষ আনন্দ পায় তারই গল্প। ক্যেরীর মনে এইসব দেখার, উপভোগ করার ইচ্ছা কৌশলে জাগিয়ে তোলেন তিনি। অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বটা চাপা থাকে না। মাঝে মাঝে কোন জিনিষ বোঝানোর জন্য ক্যেরীর দিকে তাকান তিনি। ক্যেরী ওঁর দৃষ্টির সামনে মন্ত্রমুগ্ধের মত হয়ে যায়। একবার একটা বিষয় জোর দিয়ে বলতে গিয়ে ক্যেরীর হাতে চাপ দেন, ক্যেরী হাসে শুধু। এমন একটা আবেশ সৃষ্টি করেন হার্স্টউড্, ক্যেরীও তার অংশ পায়। এক মুহূর্ত্ত বিরক্তিকর লাগে না ওঁকে। হার্স্টউডের সংস্পর্শে ক্যেরীর চরিত্রের ভালো দিকগুলো বিকশিত হয়। অন্ততঃ হার্স্টউড্ তো প্রশংসা করার মতো অনেক কিছু খুঁজে পান ওর মধ্যে। অথচ মুরুব্বিয়ানা নেই ড্রুয়ের মতো।

ড্রুয়ের সাক্ষাতেই হোক্ আর অনুপস্থিতিতেই হোক্ হার্স্টউডের সঙ্গে প্রত্যেকবার আলাপেই এমন একটা গভীর কিছু অনুভব করে ক্যেরী, সেটা কথাতে সে কোনমতেই প্রকাশ করতে পারবে না। তার চিন্তাগুলো কখনো সে গুছিয়ে ভাবতেই পারে না, বলাতো দূরের কথা। হার্স্টউড্ এমন কোনো অর্থপূর্ণ কথা বলেনি যেটার সে উল্লেখ করতে পারে। শুধু দৃষ্টি আর অনুভূতি। কোন্ মেয়েই বা সেটা স্পষ্ট করে বলতে পারে? ড্রুয়ের সঙ্গে তার এমন কোন দিনই হয়নি। হতেই পারে না। দুর্দ্দশার দিনে ড্রুয়ে এসেছে, স্বাচ্ছন্দ্যের আশা এগিয়ে দিয়েছে, তাকে মেনে নিতে হয়েছে। এখন একটা গোপন অনুভূতি তার মনে শিহরণ জাগায়, ড্রুয়ে এটা কোনদিনই বোঝেনি। প্রেমিকের ভাষার চেয়ে হার্স্টউডের দৃষ্টি অনেক বেশী গভীর। এখুনি ওর উত্তর দেবার দরকার নেই, শুধু অনুভব করুক সে।

আসলে ভাষাটা কি? যুক্তির একটা অপ্রয়োজনীয় দিকমাত্র। হৃদয়াবেগ আর কামনার কতটুকু প্রকাশ হয় ভাষার মধ্যে? ভাষার বাধা পেরিয়ে অন্তর

শোনে অন্তরের কথা। হার্স্ট'উডের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্যেরী ওঁর কথাগুলো শোনে না, শোনে তাঁর পরিবেশ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উন্নততর জীবনের ডাক। ওঁর আকাঙ্ক্ষা ক্যেরীর মনের ওপর স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে। ভয় পাবার কিছু নেই, লজ্জার কিছু নেই, অদৃশ্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে এই অনুভবটা। হার্স্ট'উডের যুক্তি ওঁর দৃষ্টিতে, আবেগে। কিন্তু তার কোন প্রমান নেই তাঁর ভাষায় বা বাহ্যিক আচরণে।

হার্স্ট'উড্ একসময় বলেন, লেকের উপরদিকের বাড়ীগুলো দেখেছেন আপনি ?

—আজই তো মিসেস্ হেলের সঙ্গে গিয়েছিলাম আমি। চমৎকার বাড়ীগুলো, না ?

—নিশ্চয়ই, ভারী সুন্দর।

ক্যেরী আন্‌মনাভাবে বলে,—এমনি একটা বাড়ীতে যদি থাকতে পেতাম আমি।

একটু চুপ করে থেকে হার্স্ট'উড্ ধীরে ধীরে বলেন, আপনি বোধহয় সুখী নন। চোখদুটো ক্যেরীর চোখের উপর নিবদ্ধ। গভীর একটা জায়গায় ঘা দিয়েছেন বুঝতে পারেন তিনি। এমনি মুহূর্ত্তে নিজের সম্বন্ধে একটা কথা বলা যায়। হার্স্ট'উড্ কিন্তু আর কিছু বললেন না, একটু ঝুঁকে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চরম মুহূর্ত্ত একটা। ক্যেরী সরে যাবার চেষ্টা করে। না, পারে না সে। পুরুষ চরিত্রের সমস্ত বলিষ্ঠতা ওর বিরুদ্ধে। হার্স্ট'উড্ শুধু তাকিয়ে থাকে। একএকটি মুহূর্ত্ত যায়, ক্যেরী আরো জড়িয়ে পড়ে।

শেষে সে বলে,—অমন করে তাকাবেন না আপনি।

হার্স্ট'উড্ বলেন,—না তাকিয়ে পারছি না আমি।

ক্যেরী সহজ হয়ে বসে আবার, না কিছু করতে পারবে না সে।

—আপনার জীবনে আপনি খুব সুখী নন, না ?

ক্যেরী দুর্ব্বলভাবে জবাব দেয়,—না।

হার্স্ট'উড্ বুঝতে পারেন ক্যেরীর দুর্ব্বলতা। আস্তে আস্তে ওর হাতটা ধরেন।

ক্যেরী হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে, না, না, না।

হার্স্ট'উড্ সহজভাবেই বলেন,—আমি কিছু করিনি তো।

ক্যেরী ইচ্ছে করলে ছুটে পালাতে পারতো, হার্স্টউডকে বেরিয়ে যেতে বলতে পারতো, সে সব কিছুই করলো না সে। হার্স্টউড্ আবার সহজভাবে কথা বলেন, যেন কিছুই হয়নি।

সদয় কণ্ঠে বলেন,—ভেবে কষ্ট পাবেন না, সময় গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্যেরী কোন উত্তর দেয় না, কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না সে।

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হার্স্টউড্ বলেন,—আমরা তো বন্ধু হতে পারি, না?

ক্যেরী এবার বলে,—হ্যাঁ।

—আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত তাহলে কোন কথা বলবেন না তো?—ওর হাতটা ধরেই থাকেন হার্স্টউড্।

ক্যেরী বলে,—আমি কোন কথা দিতে পারছি না।

—না, এর চেয়ে আরো একটু উদার হতে হবে আপনাকে। কথাটা এমন-ভাবে বলেন হার্স্টউড্ ক্যেরীর মনে লাগে।

সে বলে,—একথা আর না তোলাই ভালো।

হার্স্টউড্ খুসী হয়ে বলেন,—বেশ।

হার্স্টউডকে এগিয়ে দিয়ে এসে ক্যেরী ঘরে ঢুকে ভাবে, কী হয়ে যাচ্ছি আমি দিন দিন। যা করি সবই ভুল, সবই অন্যায়? চুলগুলো খুলে দেয় সে। সন্ধ্যার ঘটনাগুলোর কথা ভাবে। আনমনে বলে, কী যে করবো আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

হার্স্টউড্ যেতে যেতে বলেন, আমি জানি, ক্যেরী যাই বলুক, ওর ভালো লাগে আমাকে।

বহুদিন পরে একটা পুরানো গানের সুর আসে হার্স্টউডের গলায়। খুসী মনে অফিসে ফিরে যান।

দশ

ঘটনার পর দুটো দিনও যায়নি, হার্স্টউডকে আবার দেখা গেল ক্যেরীদের ফ্ল্যাটে। হার্স্টউড্ তারপর থেকে ক্যেরীর কথাই বেশীর ভাগ সময় ভাবছিলেন।

ক্যোরীর দুর্বলতা তাঁর কাছে অনেকটা ধরা পড়ে গেছে। তাঁকে যে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়নি ক্যোরী, তাতে হার্স্টউড সাহস পেয়েছেন অনেকটা।

ওর আগ্রহটা শুধু মোহ নয়, কামনার চেয়ে অনেক গভীরে তার ভিত্তি। ঊষর মরুভূমিতে ওর যে অনুভূতি শুকিয়ে যাচ্ছিল তারই বিকাশের পথ পেয়েছেন তিনি। জীবনের প্রথম প্রেমের পরিণতি হয়েছিল বিবাহে। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছেন কতবড় ভুল করেছেন তিনি। আর একবার যদি তাঁকে কেউ সুযোগ দিতো, এধরণের নারীকে তিনি কখনই স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারতেন না। অনেক মেয়ের সংস্পর্শেই তিনি এসেছেন তারপর। তার ফলে সাধারণ নারীজাতির ওপর তাঁর বিতৃষ্ণাই এসেছে। এরা সবাই স্বার্থপর, বুদ্বুদের মত অন্তঃসারশূন্য, জাঁকজমক আর বাইরের চটক নিয়ে ব্যস্ত।

ড্রুয়ে যখন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি ভেবেছিলেন একরাশ পোষাক আর একটু মোটামুটি সুন্দর চেহারার সংমিশ্রণ হবে ড্রুয়ের রক্ষিতাটি। সন্ধ্যায় একটু আড্ডা দিয়ে ফূর্ত্তি করবেন এই ছিল তাঁর ধারণা। এসে দেখলেন যৌবন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ক্যোরীকে। ক্যোরীর উজ্জ্বল চোখে রক্ষিতার দৃষ্টিভঙ্গী নেই, সরল নিরীহ জীবনের ছেলেমানুষি তাতে। হার্স্টউড্ বুঝলেন একটা বড় ভুল করা হয়েছে। মুগ্ধ হলেন তিনি। ক্যোরীকে সাহায্য করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। কিন্তু শুধু কি ক্যোরীকে সাহায্য করার মহাব্রতই? নিজের স্বার্থও একটুও ছিল বৈকি তাঁর সদিচ্ছার মধ্যে। ড্রুয়ের চেয়ে অনেক বড় ক্যোরী, ক্যোরী ড্রুয়ের উপযুক্ত নয়। ড্রুয়ে শহরের ফূর্ত্তিবাজ অন্তঃসারশূন্য যুবক, ক্যোরীর চোখে তখনো গ্রাম্য সরলতার ছাপ।

ক্যোরীও অনেক ভেবেছে সেদিন সন্ধ্যা থেকে। শেষ পর্য্যন্ত ভোলবার চেষ্টা করেছে। ড্রুয়ের প্রতি তার কর্ত্তব্য আছে একটা। ড্রুয়ে ওকে এই সেদিনই দুর্দ্দশার হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

হার্স্টউড্ ক্যোরীকে নিয়ে কী করতে চান তা তিনি নিজেও জানেন না। শুধু ক্যোরীকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে হবে। ক্যোরী কী তাঁকে ভালবাসবে না? ক্যোরী কী বলে, কী করে, কী ভাবে, এই নিয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন হার্স্টউড্। যৌবনের প্রথম প্রেমের আবেগ আবার যেন ফিরে এসেছে।

শুক্রবার বিকালে ঠিক করে ফেললেন ক্যেরীর কাছে যেতেই হবে। তাঁর ছুটিছাটা নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায় না, কাজে তো আর তিনি ফাঁকি দেন না। বারের লোকটিকে বললেন, দেখো আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, কেউ যদি খোঁজ করেন বোলো চারটে পাঁচটার সময় ফিরবো।

ওগডেন প্লেসে যখন পৌছলেন তিনি, তখন ক্যেরী বাইরে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ঝিটা যখন খবর নিয়ে এলো ক্যেরী প্রথমে একটু চমকে উঠলো, তারপর বললো, আচ্ছা বসতে বলো, এখুনি আসছি আমি।

ক্যেরী খুসী হয়েছে কি হয়নি, তা সে নিজেও বলতে পারবে না। গালটা তার লাল হয়ে উঠেছে, খুসীতে বা ভয়ে নয়, নার্ভাস হয়ে পড়েছে বলে। সে অনুভব করে তাকে সাবধানে কথা বলতে হবে, সে জানে হার্স্ট উড্ তাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

প্রসাধন শেষ করে ক্যেরী নিচে নেমে আসে। হার্স্টউডের মনের অবস্থাও ক্যেরীর মতো চঞ্চল। আজ অনেকখানি ঝুঁকি নিতে হবে তাঁকে। ক্যেরীর পদশব্দ শুনে হার্স্টউড্ সাহস হারাতে থাকেন। ক্যেরীর ঠিক মনোভাব কী সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ তো পাননি তিনি।

ক্যেরীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তাঁর সাহস ফিরে আসে। এত সরল মিষ্টি ওর চেহারা, যেকোন প্রেমিকই সাহসী হয়ে উঠবে ওকে দেখে। ক্যেরীর চঞ্চলতা দেখে হার্স্টউডের ভয় কেটে যায়।

—কেমন আছেন? আজ বিকেলটা এত সুন্দর লাগছে, আপনার কাছে না এসে পারলাম না।

—হ্যাঁ, বেশ বিকেলটা, আমি বেরুচ্ছিলাম এখুনি। ওঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে।

হার্স্টউড্ বলেন,—তাই নাকি? চলুন দুজনে একসঙ্গেই বেড়িয়ে আসি।

পার্কটা পার হয়ে ওয়াশিংটন বুলেভার্ড দিয়ে চলতে লাগলেন ওরা। এমন করে কী করে বলাযাবে ওঁর মনের কথা। শেষ পর্য্যন্ত হার্স্ট' উড্ একটা গাড়ী নিলেন। নতুন বুলেভার্ডটা পেরিয়ে ওয়েস্ট সাইডে ঘাসের ওপর বসে নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে।

কিছুদূর এগিয়ে লোকালয়ের কোলাহল ছাড়িয়ে এসে হার্স্টউড্ বলেন, —আপনি গাড়ী চালাতে পারেন?

ক্যেরী বলে,—না, কখনো চেষ্টা করে দেখিনি। ওর হাতে লাগামটা তুলে দিয়ে হার্স্টউড্ বলেন,—দেখুন না চেষ্টা করে, এমন কিছু শক্ত নয়। ক্যেরী বলে,—ঘোড়া ভালো হলে ভয় করে না।

হার্স্টউড্ সাহস দিয়ে বলেন,—একটু অভ্যাস করলে আপনিও নিশ্চয়ই পারবেন।

কথাটা পাড়ার জন্য সুযোগ খোঁজেন হার্স্টউড্, মাঝে মাঝে চুপ করে যান। কিন্তু ক্যেরী সাধারণ গল্পই করে চলে। খানিকপরে হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল দুজনের। হার্স্টউডের গভীর নিস্তব্ধতার অর্থ ক্যেরীর অন্তরে পৌছায়। ক্যেরী বোঝে চরম মুহূর্ত্ত এগিয়ে আসছে।

একসময় হার্স্টউড্ বলেন,—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে সন্ধ্যেটা আমার খুব আনন্দে কাটে। বহুদিন এমন আনন্দ পাইনি।

ক্যেরী বিশ্বাস না করে পারে না। বাইরে উদাসীনতার ভাব দেখিয়ে সহজ-ভাবে বলার চেষ্টা করে, তাই নাকি?

হার্স্টউড্ বলেন,—সেদিন সন্ধ্যায় এই কথাটা আমি বলতে চেয়েছিলাম, ঠিক সুযোগ পাইনি।

ক্যেরী জবাব দেয় না, শুনে যায়। জবাব দেওয়ার মত কিছু ভেবে পায় না সে। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন নিয়ে অনেক ভেবেছে সে, কিন্তু এখন হার্স্টউডের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে।

গভীরভাবে হার্স্টউড্ বলে চলে, আমার অনুভূতি, মনের আবেগ আপনাকে জানাবার জন্যেই এখানে আসা আমার, আপনি আমার কথা শুনচেন কিনা জানি না।

হার্স্টউডের অনুভূতির তীব্রতা খুব বেশী, এমনি একটা আবেগের মুহূর্ত্তে মুখর হয়ে উঠতে পারতেন তিনি।

ক্যেরীর হাতের ওপর হাত রেখে একটু নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলেন, —আপনাকে ভালবাসি আমি।

ক্যেরী চমকে ওঠে না। হাস্ট´উড্ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন। ক্যেরী নীচে ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু অপেক্ষা করে হার্স্ট´উড্ আবার বলেন,—আপনি তো জানেন, আপনাকে কতোখানি ভালবাসি আমি।

ক্যেরী এবার বলে,—ওসব কথা বলবেন না।

কথাগুলোর মধ্যে জোর ছিল না। একটা কথা বলতে হবে তাই বলা। হার্স্ট´উড্ কান দেন না একথায়। ওর ডাক নামটা ধরে বলেন,—ক্যেরী, তুমি কি আমাকে ভালবাসবে না? তুমি কি বুঝবে না একটু দয়া, স্নেহ, একটু ভালোবাসা না হলে আমি বাঁচবো না। বড় একা আমি ক্যেরী। আমার জীবনে আনন্দ নেই, আশা নেই, শুধু কাজ কাজ, ওরা কেউ বোঝেনা আমাকে।

অন্তরের আবেগ দিয়ে বলেন হার্স্ট উড্ কথাগুলো। স্পন্দিত ধ্বনিগুলো ঢেউ জায়গায় ওঁর সঙ্গিণীর মনে।

সহানুভূতির দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকিয়ে ক্যেরী বলে,—আমি ভেবেছিলাম আপনি খুব সুখী। এত দেখেছেন, উপভোগ করেছেন।

বেদনাভরা গলায় হার্স্ট´উড বলেন,—ঠিক সেইজন্যেই এত দুঃখ আমার। অনেক কিছু দেখেছি আর জানি বলেই।

এতবড় উচ্চপদস্থ প্রভাবশালী লোককে এমনভাবে কথা বলতে দেখে ক্যেরী আশ্চর্য্য হয়। এতবড় ব্যক্তিত্ববান্ একজন পুরুষ তার মতো গ্রাম্য এক নারীর কাছে এমনিভাবে আবেদন জানায়! এত অর্থ, সম্পদ, এত স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস, শক্তি সব কিছু নিয়েও তার কাছে ভিক্ষা চান হার্স্ট´উড্? হার্স্ট´উডের তীব্র আবেগে ক্যেরীর সন্দেহ দ্বিধা ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

বেদনার্ত গলায় হার্স্ট´উড্ বলেন,—তুমি ভাবছ, আমি তো সুখী, আমার আবার দুঃখ কিসের? দিনের পর দিন তোমাকে যদি বোধ শক্তি হীন কঠোর মানুষের সঙ্গে কাটাতে হতো, যারা তোমার জন্য এতটুকু দয়ামায়া স্নেহপ্রীতি সহানুভূতি অনুভব করে না, তাদের সঙ্গে যদি তোমাকে চলতে হতো, যাদের সঙ্গে মন খুলে অন্তরের কথা বলা যায় না, শুধু তাদের সঙ্গেই যদি তোমাকে মিশতে হতো, তবে তুমিও আমার মতো অসুখী হতে ক্যেরী।

এমন একটা তারে ঘা দিয়েছেন হার্স্ট´উড্, যার অনুরণন ক্যেরীর বুকে না

জেগে পারে না। সেও তো একাকী, সেও কি অন্তরে অন্তরে অসুখী নয়? কে আছে যার কাছে সে সহানুভূতি আশা করতে পারে, কে তার অন্তরের কান্না শুনতে চায়।

একা, একা সে-ও।

হার্স্টউড্ বলেন,—এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াই, শান্তি পাই না, আনন্দ পাই না। সময় কাটে না আমার। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে এমনি করেই একা একা কাটাতাম। এটাওটা নিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করতাম। এখন, এখন তোমার কথা ভাবতে পারি আমি, সেই আমার শান্তি সেটুকুই আমার সান্ত্বনা। তুমি আমাকে নাও ক্যেরী, আমাকে সুখী করো।

হার্স্টউড্ ওর সাহায্য চায়! ক্যেরী এই নিঃসঙ্গ একাকী লোকটির দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। ওর জন্য তাঁর জীবনটা নিরানন্দ হয়ে যাবে? কিন্তু তার মতো মেয়ের কাছেই বা কেন সাহায্য চাইবেন উনি, কী দিতে পারে সে ওঁকে?

—তুমি হয়তো ভাবছো, আমি যত কিছু করেছি, কত অন্যায়ের মধ্যে গা ভাসিয়েছি, এসব আমার বানানো কথা। বিশ্বাস করো ক্যেরী আমি উশৃঙ্খলভাবে কাটিয়েছি। কিন্তু কেন সে তো বলেছি তোমাকে। আমার জীবনের যদি কোন মূল্য থাকে, তুমি তুলে নাও আমাকে। বাঁচাও এই গ্লানির হাত থেকে।

ক্যেরী সস্নেহে তাকায় হার্স্টউডের দিকে। এত মহৎ উদার ব্যক্তি, কোথায় ওঁর অন্যায় দোষ ত্রুটি। সেতো নাম মাত্র। এমন কোন পাপ তো করেন নি উনি। মনে মনে ভাবে, কী করবে সে?

হার্স্টউড্ আস্তে আস্তে এক হাতে জড়িয়ে ধরেন ওকে। ক্যেরীর বাধা দেবার শক্তি নেই। আর এক হাতে ওর হাতটা মুঠো করে ধরেন।

ঘোড়াটা এমনি চলে নিজের খেয়ালে। ঝিরঝিরে একটা হাওয়া বইছে, কয়েকটা পাতা উড়ে পড়ে।

হার্স্টউড্ ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, বলো, বলো ক্যেরী, তুমি আমাক ভালবাসো?

ক্যেরীর চোখ দুটো নামিয়ে নেয়।

গভীরভাবে হার্স্ট'উড্ আবার বলেন, বলো, বলো, তুমি ভালোবাসো আমাকে।

ক্যেরী কোন উত্তর দেয় না, কিন্তু হার্স্ট'উড্ জানেন ক্যেরীর মনের কথা।

এবার ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেন হার্স্ট'উড্, বলো, বলো। ক্যেরীর মুখের সঙ্গে হার্স্ট'উডের মুখ মিশে গেছে।

আবার বলেন হার্স্ট'উড্—,বলো ?

ক্যেরী উত্তর দেয় না, ওর ঠোঁট দুটো শুধু গভীর আবেগে হার্স্ট'উডের মুখের ওপর মিশে যায়।

উজ্জ্বল চোখে হার্স্ট'উড্—.বলেন, এবার, এবার। তুমি আমার, তুমি আমার, না ?

ক্যেরী ওর মাথাটা হার্স্ট'উডের কাঁধে এলিয়ে দেয়।

এগারো

ক্যেরীর দেহে মনে সেদিন কিসের এক জোয়ার এসেছে। হার্স্ট'উডের প্রেমে সে তন্ময় হয়ে গেছে। আবার রবিবার। রবিবার সন্ধ্যায় সে হার্স্ট'উডের সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

মিসেস হেল ওঁর জানালা দিয়ে দেখলেন ক্যেরী আসছে হার্স্ট'উডের সঙ্গে। মনে মনে ভাবেন, হুঁ, স্বামী নেই আর অমনি অন্য লোকের সঙ্গে বেড়াতে শুরু করেছে।

শুধু মিসেস্ হেলই না, বাড়ীর ঝিটাও সেই কথাই ভাবছে। ক্যেরীর প্রতি ওর বিশেষ কোন শ্রদ্ধা নেই, হার্স্ট'উডকেও পছন্দ সে করে না। এবং ড্রুয়ে কেমন হাসিখুসী খেয়ালী ফূর্তিবাজ, ওর দিকে মাঝে মাঝে কেমন করে তাকায়। ড্রুয়েকেই পছন্দ করে ও। রাঁধুনীটাকে বলে ও, ক্যেরী হার্স্ট'উডের একা একা গল্প করা, বেড়িয়ে বেড়ানোর কথা। ক্রমশঃ একটা কানাঘুষো চলতে থাকে।

একবার আত্মসমর্পণ করার পর ক্যেরী আর বিশেষ ভাবে না তার কর্তব্য। হার্স্ট'উডের কাছে অনেক কিছু আশা করে সে। সমবেদনা জাগিয়ে

ক্যেরীকে জয় করেছেন হার্স্ট উড্, ক্যেরী আশা করে এই জীবন থেকে মুক্তির একটা পথ খুলে যাবে আবার।

হার্স্ট উড্ কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার কথা ভাবেন নি। ক্যেরীর প্রেমের জন্য নিজের জীবনকে জড়িয়ে বিপদগ্রস্ত করার কথাই ওঠে নি তাঁর মনে। ভালো চাকরী, প্রভাব, স্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুর অভাব নেই তাঁর। ক্যেরীর কাছে শুধু আনন্দের অভাবটুকু পুষিয়ে নেওয়া, তাছাড়া আর কিছু নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় ক্যেরীর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে ওঁর ধারণা একটু বদলায়। ক্যেরী অনেক কিছু ধরে নিয়েছে, অনেক মহৎ প্রেম আশা করেছে সে হার্স্ট উডের কাছে। একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলে ও, লজ্জাবনতা কিশোরীর মত। শুধু চাইলেই পাওয়া যাবে না ক্যেরীকে। হার্স্ট উড্ তখনকার মতো দাবীটা আর জোর করে আদায় করতে যান না।

ক্যেরী বিবাহিত বলেই যেন ধরে নিয়েছেন তিনি, অন্ততঃ ক্যেরী তো তাই জানে। ওঁর জয় এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। কতদূরে এখনো, কে জানে?

ওগডেন প্লেসে ফেরার পথে বলেন,—আবার কবে দেখা হবে?

ক্যেরী বলে,—কী জানি, বলতে পারছি না।

—আচ্ছা মঙ্গলবার 'ফেয়ারে' চলে এসো না কেন?

ক্যেরী ঘাড় নেড়ে বলে,—না, এত ঘনঘন ঠিক নয়।

হার্স্ট উড বলেন,—আচ্ছা তাহলে ওয়েষ্ট সাইডে পোস্টঅফিসের ঠিকানায় চিঠি লিখবো তোমাকে, মঙ্গলবার এসে নিয়ে যেও, কেমন রাজীতো?

ক্যেরী রাজী হয়।

ব্যাপারটা কিন্তু এভাবে বেশীদিন চললো না। ড্রুয়ে ফিরে এলো। অফিসে বসে আছেন হার্স্ট উড্ এমন সময় ড্রুয়ে ঢুকলো।

আপ্যায়ন করেন হার্স্ট উড্,—এই যে চার্লস, এসে গেছ?

ড্রুয়ে এগিয়ে এসে বলে,—হ্যাঁ এসে গেলাম, আছ কেমন?

হার্স্ট উড্ উঠে দাঁড়ান, খবর সব ভালো তো? এটা ওটা গল্প করার পর হার্স্ট উড্ বলেন, বাসায় গিয়েছিলে?

ড্রুয়ে বলে, না, এই যাবো এবার।

হার্স্ট´উড্ বলেন,—তোমার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম একদিন।

ড্রুয়ে বলে,—তাইনাকি, কেমন আছে ক্যেরী ?

হার্স্ট´উড্ বলেন,—ভালই আছেন, তবে তোমার জন্যে ব্যাকুলা হয়ে আছেন বুঝতেই তো পারছ। যাও বাসায় চলে যাও, বেচারী, কতদিন তোমর পথ চেয়ে আছেন।

ড্রুয়ে হেসে বলে,—যাচ্ছিহে যাচ্ছি, যাবো বৈকি।

হার্স্ট´উড্ শেষে বলেন, বুধবার এসো তোমরা দুজনে থিয়েটারে যাওয়া যাবে।

ড্রুয়ে বলে, দেখি, ক্যেরী আবার কী বলে, জানাবো পরে।

ড্রুয়ে ভাবে চমৎকার লোক হার্স্ট´উড্। হার্স্ট´উড্ ভাবেন, লোকটা ড্রুয়ে ভালোই, কিন্তু ক্যেরীর উপযুক্ত নয়।

ড্রুয়ে ফ্লাটে ঢুকেই হৈ হৈ করে আগের মত ক্যেরীকে টেনে নেয় বুকের মধ্যে ক্যেরী কিন্তু ওর চুম্বনের উত্তরে তেমন সাড়া দেয়না।

ড্রুয়ে বলে,—ও এবার যা লম্বা ঘুরলাম।

ক্যেরী বলে,—তাই নাকি, আচ্ছা সেই লা ক্রসের লোকটাকে কিছু করতে পারলে ?

—নিশ্চয়ই, মেলা মাল্ বিক্রী করেছি ওকে। বার্ণস্টিন কোম্পানীর একটা লোক ছিল, আমার সঙ্গে পারবে ও, ফু করে উড়িয়ে দিলাম ওকে।

মুখহাত ধোবার আগে জামাকাপড় খুলতে খুলতে ড্রুয়ে এবারকার টুরের গল্প করে। ওর উত্তেজিত বর্ণনায় ক্যেরী মজা পায়।

ড্রুয়ে বলে, ওঃ অফিসকে এবার তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছি। লা ক্রসেতেই তিনহাজার ডলারের মাল বিক্রী করেছি।

মুখটা ধুয়ে মুছতে মুছতে বলে,—জুন মাসে মাইনে বাড়ানোর জন্ত চাপ দিচ্ছি এবার, যা টাকা আছে ব্যাটাদের, দেবে না কেন। যা কাজ দিচ্ছি নিশ্চয়ই দেবে ওরা, দেখে নিও তুমি। আর তারপর সেই সম্পত্তির ব্যাপারটা যদি চুকে যায় ব্যস্। তারপর বিয়েটা সেরে ফেলবো এবার, কী বলো ?

ড্রুয়ে কথাগুলো যেন আন্তরিকতা দিয়েই বললো।

ক্যেরী বিষণ্ণভাবে অনুযোগের সুরে বলে,—তোমার আমাকে বিয়ে করার

মোটেই ইচ্ছে নেই, চার্লি। হার্স্টউডের কথাবার্তায় ক্যেরীর সাহস বেড়েছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ড্রুয়ে বললো, বাঃ,—কে বললে তোমাকে? এসব কথা কী করে ঢুকলো তোমার মাথায়?

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে ড্রুয়ে এর সামনে দাঁড়ালো, এই প্রথম ক্যেরীর মনে হলো ওর কাছ থেকে দূরে পালায়।

ক্যেরী মুখ তুলে বলে,—কতদিন ধরেই তো তুমি বলছ এইবার, এইবার।

—বিয়ে করতে তো চাই-ই আমি লক্ষ্মীটি, কিন্তু আমি যে ভাবে থাকতে চাই, তাতে টাকা পয়সা লাগে তো। এইবার দেখো না ইনক্রিমেণ্টটা পেয়ে গেলেই সব ঠিক করে ফেলতে পারবো আমি। ভেবো না তুমি লক্ষ্মীটি।

ক্যেরীর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে ড্রুয়ে, আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গীতে। ক্যেরী কিন্তু বুঝতে পারে তার আশ্বাসটা কতো ভুল। সে যে কিছু করে তা ড্রুয়ে চায় না। যেমন চলছে তেমনি চলুক। ড্রুয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবে না।

হার্স্টউড্ কতো গভীর আন্তরিক মনে হয়। সে কি ক্যেরীকে এমনি করে ঠকিয়ে রাখতো? হার্স্টউডের কাছে ক্যেরীর প্রয়োজনীয়তা আছে। ড্রুয়ে তাকে গ্রাহ্য করে না।

খানিকটা অসহায়ভাবে খানিকটা হার্স্টউডের সম্বন্ধে আশ্বাস নিয়ে ক্যেরী বলে,—তুমি কখনই বিয়ে করবে না আমাকে।

—কেন এসব বলছো লক্ষ্মীটি, কটা দিন অপেক্ষা করো, তারপর বলো। বিয়ে করবো না তোমাকে তো কাকে করবো?

ক্যেরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝে ওর ধারণা ভুল নয়। এমনি করেই ড্রুয়ে তার কথা রাখছে। ওর দাবীর কোন মূল্যই নেই তার কাছে।

বিয়ের প্রশ্নটার যেন সমাধান হয়ে গেছে, এমনি সহজভাবে ড্রুয়ে বলে, —শোনো, হার্স্টউড্ বলছিল থিয়েটারে যেতে, কী যাবে তো?

হার্স্টউডের নামে চমকে ওঠে ক্যেরী, তারপর সামলে নিয়ে সহজভাবে বলে কবে?

— এই বুধবার, যাবে তো ?

—আচ্ছা, তুমি যদি বলো। ক্যোরী এমন গম্ভীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলে কথাটা যে ড্রুয়েও সেটা লক্ষ্য করে। বিয়ের কথাটা ওঠার জন্যই নিশ্চয় ক্যোরীর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

—হ্যাঁ, ও বলছিল, একদিন এসেছিল এখানে।

—ক্যোরী বলে,—হ্যাঁ, গত রবিবার সন্ধ্যার সময় এসেছিল।

—তাই নাকি ? ও যা বল্লে মনে হলো সপ্তাহ খানেক আগে এসেছিল।

ক্যোরী বলে, হ্যাঁ,—এসেছিল তো। ও তো আর জানে না কী কথা হয়েছে এর মধ্যে।

ড্রুয়ের একটু ধাঁ ধাঁ লাগে—তার মানে দুদিন এসেছিল ও এখানে।

ক্যোরী নিরীহভাবে বলে, হ্যাঁ। এবার সে বুঝতে পারে হার্স্টউড্ একবারের কথাই বলেছেন।

ড্রুয়ে ধরে নেয় হার্স্টউডের কথাটা ও বুঝতে ভুল করেছে। এনিয়ে সে মাথা ঘামায় না বলে, কী বললো ও ?

—বললেন, আমার নিশ্চয়ই খুব একা একা লাগছে ভেবে দেখা করতে এসেছেন। তুমি এতদিন আসছ না কেন, শুধোচ্ছিলেন।

ড্রুয়ে বলে,—জর্জটা চমৎকার লোক। চলো খেয়ে আসি। হার্স্টউড্ ওর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছে জেনে খুসী হয় ও।

ড্রুয়ে এসে গেছে দেখে হার্স্টউড্ সঙ্গে সঙ্গে লেখেন ক্যোরীকে—তোমার সঙ্গে দেখা করেছি বলেছি ওকে। ও বোধ হয় জানে একবারই। তুমি কী বলেছ আমাকে জানাবে। বুধবার জ্যাক্‌সন ষ্ট্রীটের মোড়ে দুটোর সময় একবার দেখা করো অবশ্য। থিয়েটারে দেখা হওয়ার আগে একবার কথা বলা দরকার।

পোস্টাফিস থেকে এটা পেয়েই ক্যোরী লেখে—আমি বলেছি দুবার দেখা হয়েছে, এ নিয়ে ও কিছু মনে করেনি। বিশেষ কিছু না ঘটলে কাল ঐ সময় দেখা করবো। আমার ভারী খারাপ লাগছে।

দেখা হলে হার্স্টউড্ আশ্বাস দেন, কিছু ভেবো না। ও চলে গেলেই সব

ঠিক করে ফেলবো। এমন কিছু একটা করা যাবে, যাতে কাউকে বঞ্চনা করার কথা না ওঠে।

ক্যোরী ধরে নেয় হার্স্ট'উড্ বিয়ের কথাই বলছে। ড্রুয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত কোনরকমে কাটিয়ে দেবে সে।

—আমার সম্বন্ধে যেন বেশী আগ্রহ দেখিয়ে ফেলো না, লক্ষীটি, এক'দিন।

ক্যোরী বলে,—তুমি ও তাহলে অমন করে তাকিওনা আমার দিকে।

হার্স্ট'উড্ বলেন,—আচ্ছা। যাবার আগে কিন্তু আবার তেমনি করে তাকান। ক্যোরী বলে,—এই আবার।

হার্স্ট'উড্ বলেন, নিষেধ তো শুধু থিয়েটারের সময়। এখন কিসের!

থিয়েটারে কোন গোলমালই হলো না। শুধু ক্যোরী আরো মুগ্ধ হয় হার্স্ট'উডের আচার ব্যবহারে। ড্রুয়ে শুধু বকে যায়। হার্স্ট'উড্ ক্যোরীর থেকে ড্রুয়ের দিকে নজর দেন বেশী। কোন পরিবর্ত্তন ঘটেছে, ড্রুয়ে বুঝতে পারে না।

স্টেজে কিন্তু এই ধরণেরই একটা ঘটনার অভিনয় হচ্ছিল। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী প্রেমিকের প্রেমনিবেদন গ্রহণ করছেন। ড্রুয়ে পরে বলে, —ঠিক হয়েছে, ব্যাটা যেমন বোকা গর্দ্দভ।

হার্স্ট'উড্ বলেন,—না তা কি বলা যা।

—না মানে? স্ত্রীর মন পেতে গেলে তাকে খুসী করে চলতে হবে স্বামীর ও না হলে তো হবেই।

লবির বাইরে আসতে কে একজন বলে, রাতে শোবার জায়গা নেই আমার, কিছু দেবেন দয়া করে।

বছর ত্রিশ বয়সের একটি রোগা অনশনক্লিষ্ট লোক ভিক্ষা চাইছে। ড্রুয়ের নজরে পড়তে সে ক'টা পয়সা বার করে দেয়, দয়া হয় ওর। হার্স্ট'উড ঘটনাটা দেখলোই না প্রায়, ক্যোরী সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল।

বারো

ডুয়ের একটা গোপন আড্ডা ছিল। কিছুদিন ধরে সে সেখানে বড় একটা যেত না। এবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আড্ডার এক বন্ধুর সঙ্গে। কোন একটা হুজুগ করে কিছু টাকা মারার ফন্দীতে আছে ওরা। আড্ডায় যেতে একজন মাতাল বললো, কী হে চাঁদ তোমার যে আর টিকিটি দেখা যায় না, কোথায় মেতেছিলে বাবা! যাক্, কাজের কথা শোনো একটা থিয়েটার করার চেষ্টা করছি আমরা। তোমার জানাশোনা কোনো মেয়ে আছে?

ডুয়ে এসব ব্যাপারে কাজে লাগতে উৎসুক সব সময়। না ভেবেই বলে ফেলে, নিশ্চয়ই কী ব্যাপারটা কি?

—কিচ্ছু না, একটা ছোট পার্ট করতে হবে। আড্ডার জন্যে কিছু আসবাব পত্র কেনা দরকার ফাণ্ডে বেশী টাকা নেই। মতলবটা তাই।—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কী বই করবে?

—'গ্যাসলাইটের নীচে'।

—তা বইটা তো খুব ভালো, বহুৎ আচ্ছা। কথাটা শেষ করার জন্য ডুয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। বলে একটা মেয়ে জোগাড় করে দিতে হবে, এই তো? ঠিক আছে, ভার নিলাম আমি।

উঠে পড়লো ডুয়ে। কোথায় কখন সে সব কিছুই জিজ্ঞাসা করলো না, পর মুহূর্ত্তে ভুলে গেলো সে।

দিন দুই পরে একটা চিঠি পেলো ডুয়ে; প্রথম রিহার্শাল শুরু হচ্ছে শুক্রবার ডুয়ে যেন ভদ্রমহিলার ঠিকানাটা জানায় পার্টটা দিয়ে আসতে হবে তাঁকে।

এইরে সেরেছে। কাকেই বা বলা যায়। মহামুস্কিলে পড়লো ডুয়ে এসে। অনেক ভেবে চিন্তে সে একজনের কথা ঠিক করলো, আজ নিশ্চয়ই যাবে মেয়েটার কাছে।

তারপর আবার বেমালুম ভুলে গেল। বাড়ীতে এসে কাগজে নোটিশ দেখে

ওর চক্ষু স্থির। সর্ব্বনাশ, ভুলে গেছে তো।—ক্যেরী জিজ্ঞাসা করে, কী হয়েছে, কী ভুলে গেছ ?

আজ ক্যেরী বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

ড্রুয়ে মাথা চুলকে বলে, আমার বন্ধুরা একটা থিয়েটার করছে। একজন মেয়ে দরকার পার্ট করার জন্য, আমি কথা দিয়েছিলাম। সব ভুলে গেছি।

—কী বই হচ্ছে ?

—'গ্যাসলাইটের নীচে'।

—কবে ?

—ষোল তারিখে।

ক্যেরী বলে, ঠিক করে দিচ্ছ না কেন ?

ড্রুয়ে বলে, কাকে করবো, জানি না তো কাউকে।

হঠাৎ ক্যেরীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমিই করে দাও না পার্টটা।

—আমি ? আমি পার্ট করতে পারিই না।

ড্রুয়ে চিন্তিতভাবে বলে, কী করে জানলে তুমি পারো না ?

—বাঃ, আমি কখনো করেছি নাকি ?

ক্যেরী কিন্তু খুসী হয়েছে ওকে বলায়। অভিনেত্রী হতে তার খুবই সখ।

ড্রুয়ে সহজ পথ খুঁজে পেয়েছে। সে বলে, এমন কিছু নয়, তুমি ঠিক পারবে।

ক্যেরীর খুব ইচ্ছা, অথচ ভয়ও করছে, সে বলে, আমি বোধ হয় পারবো না।

—নিশ্চয়ই তুমি পারবে। করো না পার্টটা। ওদেরও কাজটা উদ্ধার হবে, তোমারও বেশ মজা লাগবে।

ক্যেরী বলে, না না, আমি পারবো না।

ড্রুয়ে বলে, আমি বলছি ভালো লাগবে তোমার। পারবে তুমি। আমি দেখেছি মাঝে মাঝে তুমি নকল করো বেশ থিয়েটার দেখে এসে, তাই তো বল্লাম তোমাকে। তুমি বেশ চালাক, ঠিক পারবে।

ক্যেরীর লজ্জা করে এবার, হ্যাঁ, আমি চালাক কে বল্লে, আমি পারবো না।

—শোনো আমি বলছি, তুমি গিয়েই দেখো না। আর তো কেউ কিছু জানেই না, তোমার ভালোই লাগবে। কই কফিটা দাও তো।

ক্যোরী এবার ছেলেমানুষের মতো বলে, চার্লি, আমার মনে হয় না কিন্তু পারবো। তুমি কী মনে করো, পারবো আমি?

—নিশ্চয়ই। আমি বলছি, তুমি দারুন পার্ট করবে, দেখে নিও। আমি জানি তুমি বেশ ভাল পার্ট করতে পারবে। সেই জন্যেই তো বাড়ী এসেই বল্লাম তোমাকে।

—কী বইটা বলছিলে?

—'গ্যাসলাইটের নীচে'।

—আমাকে কী নিতে হবে?

—একটা হিরোইনের পার্ট, কী নামটা ঠিক জানি না।

—গল্পটা কী রকম?

এসব ব্যাপারে ড্রুয়ের স্মৃতিশক্তি মোটেই ভালো নয়। সে বলে, এই একটা মেয়েকে দুজন বদমাইস স্বামী-স্ত্রীতে চুরি করে নিয়ে যাবে। মেয়েটার কিছু টাকা ছিলো, মেরে দেবার মতলব আর কী। তারপর কী হলো আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—আমাকে কোন্ পার্টটা করতে হবে, জানো না?

—ঠিক জানি না।

তারপর একটু ভেবে বলে, হ্যাঁ, মনে পড়েছে লরার পার্ট করতে হবে তোমাকে। তাইতো বলেছিল।

—ওর পার্টটা কী তোমার মনে নেই।

মাথা চুলকে বলে ড্রুয়ে—সত্যি কথা বলতে বইটা আমি অনেকবার দেখেছি —কিন্তু ঠিক মনে থাকে না আমার। কী একটা ছোট মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেল, নাকি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেল, কী যেন?

একমুঠো মটর তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বলে ড্রুয়ে, ডুবে যাবে বোধ হয় মেয়েটা, না, দাঁড়াও বল্‌ছি আমি। নাঃ ঠিক মনেই পড়ছে না। দাঁড়াও বইটা এনে দেবো তোমাকে।

ড্রুয়ে থামলে ক্যোরী বলে, তুমি যদি বলো পারবো আমি ঠিক, তাহলে যাবো আমি, কী বলো?

ক্যেরীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্তু ড্রুয়েও খানিকটা আগ্রহ দেখায়—নিশ্চয়ই। তুমি পারবে না ভাবলে কী আমি তোমাকে যেতে দিতাম নাকি। তুমি খুব ভালো পার্ট করবে আমি বলছি।

ক্যেরী চিন্তিতভাবে বলে, কবে যেতে হবে।

—রিহার্শাল শুরু হবে শুক্রবারে, আজই রাত্রে পার্টটা এনে দেবো তোমাকে।

—আচ্ছা, আমি করবো বল্‌ছি, কিন্তু খারাপ যদি হয়, তোমার দোষ কিন্তু।

—কে বলেছে খারাপ হবে। যেমন সাধারণ কথা বলো তেমনি বলবে, স্বাভাবিক হওয়া চাই ব্যস্‌। আমার তো মনে হয় তুমি খুব ভালো অভিনেত্রী হতে পারতে।

ক্যেরী বলে, সত্যি বলছো?

ড্রুয়ে বলে, নিশ্চয়ই।

ক্যেরীর মনে কী এক আগুন জ্বালিয়ে দিলো ড্রুয়ে, সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। অনুকরণ করা তার অভ্যাস। সহজেই তার মনে দাগ পড়ে। পৃথিবীর সব কিছু ঘটনা, আবেগ অনুভূতির ছায়া পড়ে তার মনোমুকুরে। নাটকের উপাদান তো এইটাই।

কতোদিন, যখন ড্রুয়ে ভেবেছে ক্যেরী নিজের সৌন্দর্য্যে মশগুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে, তখন সে অনুকরণ করছে। অপরের আবেগ উচ্ছ্বাস দুঃখকষ্টের কেমন ছাপ পড়ে তার চেহারায় তারই চেষ্টা করছে।

জীবনের প্রতিফলন, নবসৃষ্টির প্রায়শই তো নাট্যশিল্পের ভিত্তি।

তেরো

প্রথম স্টেজে নামা ক্যেরীর জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা, প্রথমে সে যা ভেবেছিল তার চেয়ে অনেক বেশী। পার্টটা হাতে পাওয়ার পরই ক্যেরী হার্স্টউডকে জানিয়েছিল খবরটা। হার্স্টউড্‌ বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের সবাইকে আগে থেকেই বলে রেখেছেন, ক্যেরীকে সাহায্য করার জন্ত তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই।

ক্যোরীর কিন্তু ভয় করছে, ফুটলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে এতলোকের মাঝখানে কী অবস্থা হবে তার কে জানে। হয়তো পার্টটা ভুলেই যাবে সে, হাত পা কাঁপবে, হয়তো বইটাই মাটি হয়ে যাবে তার জন্যে। আবার যখন ভাবে আর সবাইও তো তারই মত নতুন সখের অভিনেতা তখন একটু সাহস পায়। আবার কখনো ভাবে দূর ছাই এসব ঝক্কি না নিতে গেলেই ভালো হতো। পার্টটা খুব ভালোভাবে মুখস্থ করে ক্যোরী। কিন্তু ভয়ে যদি সব ভুলে যায় সে?

হার্স্টউডের প্রেমের ধারটা উদ্বেল বিচ্ছুরিত। বাধা পেয়ে হাহুতাশ করা, মনের মধ্যে গুমরে মরা তাঁর স্বভাব নয়। ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছেন তিনি। শরীর মনে বিশৃঙ্খলা এসেছে তাঁর। এই বিশ্রী অবস্থাটা দূর করে ক্যোরীকে পাওয়ার জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারতেন। ড্রুয়েকে কীভাবে সরিয়ে দেওয়া যায়, এই তাঁর প্রধান চিন্তা।

ব্রেক্‌ফাস্টের টেবিলে বসে আনমনা খবরের কাগজটা দেখে যান, কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। কফিটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, অমলেটটা পড়ে থাকে, হার্স্টউডের খিদেও নেই। জেসিকা এখনো নামে নি, স্ত্রী ওদিকে বসে তাঁর নিজের কথাই ভাবছেন মনে মনে, হার্স্টউড্ অস্থির বিরক্ত।

বিশ্রী নিস্তব্ধতাটা ভাঙে মিসেস্ হার্স্টউডের তিরস্কারে। আজও ম্যাগী তোয়ালে দিতে ভুলে গেছে।—ফের যদি এমনি ভুল হয়, তোমাকে নিজের পথ দেখতে হবে বলে দিচ্ছি, ম্যাগী।

হার্স্টউড্ বিরক্তির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকান। স্ত্রী এবার স্বামীকে বলেন কবে ছুটি নেবে ঠিক করেছ কিছু?

বছরের এই সময়টা প্রত্যেকবারই তাঁরা বেড়াতে যান। হার্স্টউড্ বলেন, এখনো ঠিক করিনি কিছু। হাতে অনেক কাজ রয়েছে।

—যেতে হলে তো তাড়াতাড়ি ঠিক করতে হবে।

—আরো ক'দিন তো হাতে আছে।

—দেখো যেন ঠিক করতে করতে গরম কালটা শেষ না হয়ে যায়। খুব বিরক্তির সঙ্গে মিসেস্ হার্স্টউড্ কথাটা বলেন।

—এই তোমার শুরু হলো অমনি। এমনিভাবে কথা বলছ যেন কখনও কিছু করিনা আমি।

—কখন যাবে জানতে চাই আমি।

—আরো তো কিছুদিন সময় রয়েছে। রেসটা শেষ হওয়ার আগে তো আর যাচ্ছ না।

এইসব অবান্তর কথা কাটাকাটি করতে তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না। ভীষণ বিরক্তি বোধ করেন হার্স্টউড্।

—আগে গেলেই বা ক্ষতি কী? জেসিকা অতদিন রেস পর্যন্ত থাকতে চাইছে না।

—তাহলে সীজ্‌ন টিকিট কিনলে কেন?

মিসেস্ হার্স্টউড্ এবার বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, অতো কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না আমি। তোমার সঙ্গে তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই।

হার্স্টউডও উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওঁর গলায় অস্বাভাবিক স্বরে স্ত্রীকে দাঁড়াতে হয়। হার্স্টউড্ বলেন, তোমার কী হয়েছে আজকাল? তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও না?

'কথা'-টার ওপর জোর দিয়ে মিসেস্ হার্স্টউড্ বলেন, নিশ্চয়ই, কথা বলতে পার বৈকি?

—কিন্তু তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তো তা মনে হয় না। যাক্, জানতে চাইছিলে কবে যেতে পারবো আমি। এক মাসের মধ্যে তো নয়ই, আরো কিছুদিন দেরী হতে পারে।

—আমাদের তা হলে তোমাকে বাদ দিয়েই যেতে হবে।

—তাই নাকি! তোমরা একাই যাবে? হার্স্টউডের গলায় শ্লেষের আভাস।

—হ্যাঁ, তাই তো বলছি।

স্ত্রীর কথায় ক্রুদ্ধ হন হার্স্টউড্।—বেশ, তুমি আজকাল সব নিজে নিজেই ঠিক করছ দেখছি। তোমার খুসী হয় যাও, কিন্তু জোর করে আমাকে তোমার ইচ্ছামত চালাবে সে হবে না। এইসব বাঁকা বাঁকা কথা বলে আমার উপর কর্তৃত্ব করবে সেটা আমি সহ্য করবো না, বলে দিচ্ছি।

রাগে হার্স্টউডের চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে, কাগজটাকে মুড়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেন। মিসেস্ হার্স্টউড্ আর কোন কথা বলেন না। ওর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি ওপরে উঠে চলে যান। একটু অপেক্ষা করেন হার্স্টউড্, তারপর টুপিটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে যান।

এ ধরণের একটা গণ্ডগোল হয়ে যাবে মিসেস্ হার্স্টউড্ আশা করেননি। জেসিকার ভালো লাগছিল না এখানে। বাইরে যাওয়ার জন্য ছট্ফট্ করছে সে। এদিকে অন্য অন্য লোকেরাও এবার তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেছে। তাই তাঁরও ইচ্ছে ছিল বেরিয়ে পড়ার।

ওঁর নিজের শরীরটাও বেশ ভাল যাচ্ছিল না। কথাটা পাড়ার কথা ক'দিন থেকেই ভাবছিলেন। কিন্তু পরিবেশটা হঠাৎ কেমন খারাপ হয়ে গেল।

কী থেকে এমনি হয়ে গেল সেটা ঠিক মনে পড়ছে না তাঁর, কিন্তু স্বামী যে এমনি ব্যবহার করলেন তাতে তাঁর মনস্থির হয়ে গেছে। হয় তিনি ভদ্র ব্যবহার করবেন, নয় উনিও একবার দেখে নেবেন। এরকম আচরণ সহ্য করবেন না কোন মতেই।

হার্স্টউডও প্রথমে এইসব কথাই ভাবছিলেন। তারপর অফিস থেকে ক্যেরীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। মনের এই অবস্থায় ক্যেরীর জন্য পাগল হয়ে ওঠেন তিনি। ক্যেরী ছাড়া আর কী নিয়ে থাকবেন, যেমন করেই হোক ক্যেরীকে পেতেই হবে। ক্যেরীকে চাই-ই তাঁর।

ক্যেরী এদিকে হার্স্টউডের প্রেমে তন্ময়। এখন সে বরং ড্রুয়েকে একটু অনুকম্পা করে।

পরদিন সকালে ড্রুয়ে বাইরে যাওয়ার আগে কেন যেন হঠাৎ বলে, এই মাসেই সম্পত্তির ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলবো ভাবছি, তারপর বিয়েটা সেরে ফেলা যাক্, কী বলো? কাল মশায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার।

ক্যেরী একটু মুখরা হয়ে উঠেছে। ড্রুয়ের ওপর সে কিছুটা প্রভাব অনুভব করে আজকাল। সে বলে, ওসব বাজে কথা।

ড্রুয়ে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার স্বরে বলে, কে বললে? নিশ্চয়ই আমি এবার সব ব্যবস্থা করছি। তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করো না।

ক্যেরী হেসে বলে, না না, এমনি বলছিলাম।

কোথায় একটা কিছু বেসুরো ভাব রয়েছে বুঝতে পারছে ড্যুয়ে আস্তে আস্তে। ক্যেরী তার সঙ্গেই আছে, কিন্তু আজকাল আর সম্পূর্ণ তার ওপর নির্ভরশীল নয়। আগের মতো অসহায় মনে হয় না তাকে। ড্যুয়ে কোথায় যেন ছায়ার মতো কিছু দেখে, একটু শঙ্কিত হয় ও। ছোট-খাট ব্যাপার একটু একটু নজর করতে শিখেছে সে। ক্যেরীর এই ছোট্ট কথাটার সুরে একটা অশুভ ইঙ্গিত খুঁজে পায় সে।

ড্যুয়ে বেরিয়ে যেতেই তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিয়ে ক্যেরীও বেরিয়ে পড়ে। রাস্তার মোড়ে ক্যেরী ড্যুয়েকে ছাড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু কেউ কাউকে দেখে না।

ড্যুয়ে কী একটা ভুলে গিয়েছিল ফিরে এসে দেখে ক্যেরী নেই। নিজের মনেই বলে, ক্যেরী কি বেরিয়ে গেল নাকি?

ঝিটা উত্তর দেয়, হ্যাঁ এখুনি তো বেরিয়ে গেলেন।

ড্যুয়ে ভাবে, আশ্চর্য্য তো, কিছু বললো না আমাকে। গেল কোথায় ও।

কাগজটা খুঁজে নিয়ে ঝির দিকে ফিরে হেসে বলে ড্যুয়ে, কী, কী করছ, তুমি?—ঝিটি অল্পবয়সী, মোটামুটি সুশ্রীই।

মেয়েটি বলে, এই তো ঘর পরিষ্কার করছি।

—অনেকক্ষণ ধরে করছ, বিরক্ত লাগছে, না?

—না, এমন আর কি?

ড্যুয়ে এগিয়ে এসে পকেট থেকে মজার একটা ছবি বের করে বলে, এদিকে এসো একটা মজা দেখাই তোমাকে।

ছবিটা নড়ে। কেমন করে নাচাতে হয় দেখিয়ে দিয়ে ড্যুয়ে সেটা মেয়েটির হাতে দিয়ে বলে, বেশ মজার, না?

মেয়েটি বলে, বেশ সুন্দর তো?

—নেবে তুমি এটা? ড্যুয়ে বলে। তারপর মেয়েটির হাতের আংটিটায় হাত দিয়ে বলে, বাঃ, বেশ তো আংটিটা তোমার।

—ভালো আংটিটা? মেয়েটি খুসী হয়ে বলে।

ওর আঙুলটা ধরার জন্ত আংটিটা দেখে ড্রুয়ে। বলে, নিশ্চয়ই, বেশ সুন্দর।

আঙুলটা ধরা অবস্থাতেই ড্রুয়ে নানা কথা বলে। আরো একটু ঘেঁষে যেতে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়েটি জানালার ধারে ঠেস দিয়ে গিয়ে দাঁড়ায়।

একটু আছুরেপনা করে বলে, অনেকদিন দেখিনি আপনাকে, বাইরে গিয়েছিলেন বোধ হয়।

ড্রুয়ে বলে, হুঁ।

—অনেকদূর ?

—হুঁ, তা অনেক দূর বৈকি।

—আপনার ভালো লাগে খুব।

—খুব কী আর ভালো লাগে, একঘেয়ে লাগে কিছুদিন পরে।

মেয়েটি জানালা দিয়ে অলস ভাবে তাকিয়ে বলে, আমার বেড়াবার খুব ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ এক সময় মেয়েটি বলে, আচ্ছা আপনার বন্ধু হার্স্টউডের খবর কী ?

—কেন, শহরেই আছে তো ? ওর কথা শুধোলে যে হঠাৎ ?

—এমনি। আপনি আসার পরে তো আর আসেননি কিনা, তাই শুধোচ্ছিলাম।

—তুমি কেমন করে চিনলে ওকে ?

—বা গত মাসে দশ বারো বার উনি এসেছেন না এ বাসায় ?

—কী বলছ তুমি, আমরা এখানে আসার পর মোট বার ছয়েক তো ও এসেছে।

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলে, ওঃ আসেননি নাকি, তাহলে খুব জানেন আপনি।

ড্রুয়ে এবার একটু গম্ভীর হয়, মেয়েটা ঠাট্টা করছে কিনা কে জানে।

—অমন করে হাসছ কেন ?

—এমনি।

—এর মধ্যে আর দেখেছ তুমি ওকে ?

—আপনি আসার পর আর দেখি নি ? মেয়েটি হাসে।

—আগে ?

—নিশ্চয়ই।

—ক'বার ?

—কেন, রোজই তো প্রায়। মেয়েটার দুষ্ট বুদ্ধি খুব, সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ডুয়ের মনের ভাবটা কী হচ্ছে, তার খবরগুলোর।

অবিশ্বাসের সুরে ডুয়ে বলে, কার কাছে এসেছিল ?

—মিসেস্ ডুয়ের কাছে।

মেয়েটার জবাবে ডুয়ে বোকা বনে যায়। তারপর শোধরাবার জন্য বলে, কী হয়েছে তাতে ?

মেয়েটা ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোন দিয়ে তাকিয়ে বলে, কী আবার ?

ডুয়ে নিজেই আরো জড়িয়ে পড়ে কাদায়, সে আমার পুরোনো বন্ধু।

মেয়েটার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি আরো কিছুক্ষণ চলতো হয়তো। কিন্তু ডুয়ের মনটা এখন বিস্বাদ হয়ে গেছে। নিচে থেকে মেয়েটার ডাক পড়তে ডুয়ে যেন স্বস্তি পেল। পাশ থেকে সরে গিয়ে মেয়েটা এলিয়ে এলিয়ে বলে, নিচে যেতে হবে।

বাধা পেয়ে যেন বিরক্ত হয়েছে এমনি ভান করে ডুয়ে বলে, আচ্ছা আবার পরে, কেমন ?

মেয়েটা চলে যেতে ডুয়ে ভাবে। ক্যেরী এতবার দেখা করেছে বলেনি তো ? আর হার্স্টউডও মিথ্যে কথা বললো ? মেয়েটার কথাগুলোর অর্থ কী ? ক্যেরীর ভাবভঙ্গীটিও যেন কেমন কেমন। হার্স্টউড্ কবার এসেছে জিজ্ঞেস করতে অমন চমকে উঠেছিল কেন সে ? হুঁ, এটা তো আগে খেয়াল করেনি সে। কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু ক্যেরী অস্বাভাবিকও কিছু করেনি। সে কি ওর সঙ্গে বঞ্চনা করেছে ? না কাল রাত্রেও তো সে ব্যবহার কিছু খারাপ করে নি। হার্স্টউডও নয়। ওরা কি ঠকাবে ? না, এ হতে পারে না কখনো।

ভাবতে ভাবতে সে আপন মনে কথা বলে,—কখনো কখনো এমন তাজ্জব কাণ্ড করে। এই যে আজ সকালবেলায় বলা নেই কওয়া নেই হুট্ করে সেজে-গুজে বেরিয়ে গেল।

মাথা চুলকোতে থাকে ড্রুয়ে। হল থেকে নীচে যাবার জন্য বেরিয়ে আসতে আবার মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়। মেয়েটা ওকে দেখে হাসে, মুহূর্তের জন্য ড্রুয়ে আবার ভুলে যায়। ওর কাঁধে হাত রাখে, যেন যেতে যেতে আপ্যায়ন জানায়।

মেয়েটা এখনো দুষ্টুমি করে বলে, কী পাগলামিটা নেমে গেছে তো?

ড্রুয়ে বলে, পাগলামি কোথায় দেখলে?

মেয়েটা হেসে বলে, আমি ভাবছিলাম বুঝি—

—হেঁয়ালি ছাড়ো দেখি, সত্যি করে বলো তো, তুমি কি সত্যি দেখেছ?

মেয়েটা বলে, নিশ্চয়ই। তারপর দোষ কাটানোর জন্য বলে, প্রায়ই তো আসেন, আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি জানেন সব।

প্রবঞ্চিত হওয়ার অপমান বাজে ড্রুয়ের। আর উদাসীনতার ভান করতে পারে না সে।

—আচ্ছা সন্ধ্যেবেলাও এখানে থাকতো?

—কখনো থাকতেন, কখনো দুজনে বেরিয়ে যেতেন।

—সন্ধ্যেবেলা?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এমনি অধীর হচ্ছেন কেন?

—কে বললে অধীর হচ্ছি আমি? আর কেউ ওকে আসতে দেখেছে?

—নিশ্চয়ই।

—কতদিন আগে?

—আপনি আসার ঠিক আগে।

ড্রুয়ে ঠোঁটটা কামড়াতে থাকে। তারপর মেয়েটার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলে, কাউকে বলো না যেন, বুঝলে?

মেয়েটা বলে, এ নিয়ে কে আবার মাথা ঘামাচ্ছে?

চলে যেতে যেতে তার শত চিন্তার মধ্যেও ড্রুয়ে অনুভব করে মেয়েটি তাকে খুব পছন্দ করে।

তার ওপর অন্যায় করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয় সে।—আচ্ছা, আমিও দেখছি, এইসব বন্ধ করবে সে, না করবে না।

চৌদ্দ

হার্স্টউড্ অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন উদ্বিগ্ন হয়ে। ক্যেরীকে দেখে বললেন, এসেছো?

ক্যেরী হেসে ঘাড় নাড়লো।

ওরা চলতে লাগলো আর কোন কথা না বলে। যেন কোন কাজে যাচ্ছে। হার্স্টউড্ ক্যেরীর সান্নিধ্যটা উপভোগ করছেন, ক্যেরীর চলার শব্দ ওঁর কানে সঙ্গীতের মত মধুর বিস্মৃতি জাগায়।

হার্স্টউড্ কী করে কথাটা পাড়বেন ভেবে পান না, অথচ মনে মনে ছট্‌ফট্ করছেন তিনি। এক সময় বলেন, কাল খুসী হয়েছিলে?

ক্যেরী বলে, খুব ভালো লেগেছে আমার।

ক্যেরী অনুভব করে হার্স্টউডের আকর্ষণ। হার্স্টউড্ চান তাঁর কামনার পরিতৃপ্তি, অধীর হয়ে উঠছেন তিনি। অথচ কেমন নার্ভাস হয়ে যান তিনি, কথাটা বলা হয় না, আবোল-তাবোল অর্থহীন কথা বলেন।

—কাল ঠিক বাড়ী পৌঁছেছিলে?

ক্যেরী সহজ ভাবে বলে, হ্যাঁ।

হার্স্টউড্ এবার কি বলবেন? গতি মন্থর করে শুধু তাকিয়ে থাকেন ক্যেরীর দিকে। ক্যেরী সচকিত হয়।

—আমার সম্বন্ধে কী ঠিক করলে?

ক্যেরী কী বলবে! তার মনেও তো ঢেউ জাগছে। বলে, আমি জানি না।

হার্স্টউড্ ঠোঁটটা কামড়ে ধরেন। তারপর একেবারে থেমে যান। পা দিয়ে ঘাসগুলোকে নাড়তে থাকেন। আকুল দৃষ্টি নিয়ে ক্যেরীর মুখখানা খোঁজেন হার্স্টউড্। গভীর ভাবে বলেন, তুমি ওর কাছ থেকে চলে আসবে না?

ক্যেরী বলে, কী জানি? ক্যেরী পথ খুঁজে পায় না। ক্যেরীর ভালো লাগে তাঁকে, হার্স্টউড্ আচ্ছন্ন করেছে ওকে, ওর মনেও আকুল বাসনা। কিন্তু,

কিন্তু কতটুকু জানেন তিনি, ড্রুয়ে কী বলেছে ওকে। উনি কী শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রী বলে গ্রহণ করবেন তাকে ? কী জানি, তবু কত আন্তরিক গভীর ওঁর ভালবাসা !

—কেন আসতে চাইছ না তুমি, আমি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে দেবো, যা চাও তুমি—

ক্যেরী বলে ওঠে, না না।

—কী না ?

ক্যেরীর চোখে-মুখে বেদনা মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। সেই কথাটি কেমন করে বলবে সে ? বিবাহ সম্পর্কের বাইরে এমনি করে থাকার সম্ভাবনাটা তার কাছে বিভীষিকা হয়ে উঠছে।

হার্স্টউড্ বলেন, কেন তুমি এমন করছ ? তুমি তো জানো তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, এমনি করে আর কতদিন চলতে পারে—তুমিই বলো—

ক্যেরী বলে, আমিও বুঝেছি।

—তবে, তবে কেন বাধা দিচ্ছ তুমি ? আমার কথা একবার ভেবে দেখো ক্যেরী। তুমিও তো আমাকে চাও।

ক্যেরী গভীর চিন্তায় মাথাটা নাড়ে।

—কেন তুমি মিটিয়ে ফেলছো না সব ঝঞ্চাট ?

—আমি জানি না।

—কেন বার বার একই কথা বলছ এমনি করে ? আমাকে আর কষ্ট দিও না ক্যেরী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি একটু ভেবে দেখো—

—সত্যিই ভাবছি আমি।

—তবে কেন একথা বলছ ? কেন কেন তুমি—তুমি কি আমাকে চাওনা, ভালবাসো না ?

হার্স্টউডের বেদনার্ত্ত আকুল জিজ্ঞাসায় ক্যেরীর সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভেসে যায়। সে ধীরে ধীরে বলে, তোমাকে ভালবাসি আমি।

—তবে, তবে আজই রাত্রে চলে এসো ?

ক্যেরী তবু মাথা নাড়ে।

—আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না ক্যেরী ? বেশ, তবে শনিবার রাত্রে ?

ক্যেরী এবার জিজ্ঞাসা করে, কবে বিয়ে হবে আমাদের? ভুলে যায় সে হার্স্টউডকে জানাতে চেয়েছে সে তুয়ের স্ত্রী।

হার্স্টউড্ চমকে উঠেন। ক্যেরীর থেকেও তাঁর কাছে এ সমস্যাটা আরো গুরুতর। হার্স্টউডের মুখে কিন্তু তার ছায়া পড়ে না, সহজ ভাবে বলেন তিনি, যেদিন তুমি বলবে।

ক্যেরী বলে শনিবারেই?

হার্স্টউড্ মাথা নাড়েন।

ক্যেরী বলে, সেদিনই তুমি যদি বিয়ে করো, আমি যাবো।

হার্স্টউড্ চকিতের মধ্যে অনেক কথা ভেবে নেন। না, ক্যেরীকে হারানো যায় না। বাধা-বিপত্তি যাই কিছু আসুক, সব ঠেলে ফেলতে হবে। ক্যেরী যা চায় তাই হোক, তারপর ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দাও নিজেকে। যাহয় হোক। নন্দন-কাননের স্বপ্ন তাঁর চোখে, থাক সহস্র বাধা। বাধার ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে না।

ক্যেরীর দৃষ্টিতে খুসীর আনন্দ, ভালবাসা। বলে, তাহলে আমি তৈরী হয়ে নিই।

হার্স্টউড্ বলেন, কাল আবার দেখা হবে তো? অনেক কিছু ঠিক করতে হবে।

ক্যেরী বলে, নিশ্চয়ই।

পনের

হার্স্টউডের পারিবারিক জীবনের সমস্যাটা এখানেই। প্রেমের থেকে ঈর্ষ্যার উৎপত্তি, কিন্তু প্রেমের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তার সমাপ্তি হয় না। মিসেস্ হার্স্টউডের ঈর্ষ্যা ক্রমশ ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে হার্স্টউড্ উদাসীন হয়ে পড়েছেন স্ত্রীর প্রতি। অন্যের প্রতি আকর্ষণ তবু সহ্য করে মেয়েরা, কিন্তু নিজেদের প্রতি অবহেলা কখনই নয়।

মিসেস্ হার্স্টউডের মেজাজটা আজকাল ভালো নেই। কারণে অকারণে

জেসিকা বকুনি খায়। ঝি, বেয়ারারা ধমক খায়। হার্স্ট উডের আচার ব্যবহার কথাবার্তা কিছুই চোখ এড়ায় না ওঁর। প্রতিটি আচরণে মিসেস্ হার্স্ট উডের সন্দেহ বেড়ে চলে, অসহ্য হয়ে ওঠে স্বামীর আচরণ।

তাছাড়াও আছে। ইতিমধ্যে দু'একটা খবরও কানে এসেছে তাঁর। পাড়ার ডাক্তার বীল একদিন বললেন, কী রাস্তায় যে আজকাল দেখা হলে চিনতেই পারেন না।

মিসেস্ হার্স্ট উড্ বলেন, কীরকম।

—এই সেদিন ওয়াশিংটন বুলেভার্ডে দেখলাম মিষ্টার হার্স্ট উডের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, অথচ কথাই বললেন না।

—কই না।

—না কি, হয়েন এভিনিউর কাছাকাছি সেদিন যাচ্ছিলেন না আপনি ?

—নিশ্চয়ই আপনি ভুল করেছেন। মিসেস্ হার্স্ট উডের সন্দেহটা আরো দৃঢ় হয়। সেটা অবশ্য ওঁর ভাবে প্রকাশ হয় না।

—আপনার স্বামীকে তো নিশ্চয়ই দেখেছি, তবে আপনি না আপনার মেয়ে সঙ্গে ছিলেন সেটা বোধ হয় স্পষ্ট দেখিনি।

মিসেস্ হার্স্ট উড্ জানেন জেসিকাও যায় নি। সে তো ক'সপ্তাহ ধরে তাঁর সঙ্গেই বেড়ায়, বলেন তাই হবে হয় তো। বিকেলবেলা না ?

—হ্যাঁ এই দুটো তিনটে হবে আর কী।

মিসেস্ হার্স্ট উড্ যেন ব্যাপারটার ওপর গুরুত্বই দিলেন না, জেসিকাই হবে নিশ্চয়।

ডাঃ বীলের মনে দু'একটা কথা জেগেছিল। চেপে যাওয়াই ভালো।

ক'দিন ধরেই ভাবলেন মিসেস্ হার্স্ট উড্ ডাঃ বীলের কথাটা। হার্স্ট উড্ নিশ্চই এদিকে ব্যস্ততা দেখিয়ে অন্য কোন মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে।

ক'দিন ধরে হার্স্ট উডের বাড়ীর কিছুই ভালো লাগে না। এবার স্পষ্ট হয়ে আসছে কারণটা, তবু আরো নিঃসন্দেহ না হয়ে এসম্বন্ধে কোনো কথা তোলা যায় না।

কোরী যেদিন আভেরী স্টেজে তার প্রথম অভিনয়ে নামলো, তার পরদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মিসেস্ হার্স্টউডের।

—কই আপনাকে তো দেখলাম না কাল চ্যারিটি শোতে?

কোথায়? বলতে গিয়েও থেমে যান মিসেস্ হার্স্ট উড্।

বন্ধুটি বলে, আপনার স্বামীকে দেখলাম খুব উৎসাহী পাণ্ডা একজন।

মিসেস্ হার্স্টউড্ সাবধানে বলেন, কেমন হলো? আমাকে ভালো করে বলেন নি কী হলো না হলো।

—চমৎকার হয়েছে, বিশেষ করে একটি মেয়ে যা হিরোইনের পাঠ করলো।

—তাই নাকি?

—আরে কাল গেলেন না আপনি। শুনলাম আপনার শরীর ভাল ছিল না, কেমন আছেন?

শরীর ভাল ছিল না? কথাটা বোধহয় মিসেস্ হার্স্টউডের প্রতিধ্বনির মত বেরিয়ে আসছিল। বের হতে দিলেন না শেষ পর্য্যন্ত। বল্লেন, হ্যাঁ শরীরটা আমার মোটেই ভাল যাচ্ছে না।

ওঁর ইচ্ছা ছিল আরো কিছু জেনে নেন্ ব্যাপারটা সম্বন্ধে। বন্ধুটি কিন্তু অন্য কথায় চলে গেলেন। বেশী কৌতূহল দেখানোও ভালো হবে না।

হার্স্টউডের আরো দুএকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো, তাঁরাও সবাই মিসেস্ হার্স্টউডের শরীর ভাল না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। হুঁ। তাহলে এমনি করে চলছেন উনি। আমার শরীর ভাল নেই তাই আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না কোথাও! বাঃ।

সন্ধ্যাবেলা যখন হার্স্টউড্ সেদিন বাসায় ফিরলেন তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরী করে ফেলেছেন নিজেকে। ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফুঁসছেন তিনি।

হার্স্টউড্ কিন্তু খুব হাসিখুসী, কোরীর কাছে কথা পেয়েছেন তিনি। আজ সবার ওপর সদয় তিনি। এমন কি স্ত্রীর প্রতিও কোন আক্রোশ নেই তাঁর। ওঁকে এড়িয়ে, ওঁর কথা ভুলে থাকলেই তো হলো।

আজ যদি একটা ভালো কথা একটু প্রতিশ্রুতি দিলে খুসী হন্ স্ত্রী, সেটুকু

দয়া করতে তিনি অরাজী নন্ আজ। মিসেস্ হার্স্টউড্ কিন্তু কোনো কথা বল্লেন না। হার্স্টউড্ সন্ধ্যাবেলায় কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

মিসেস্ হার্স্টউড্ তাঁর দিকে না তাকিয়েও লক্ষ্য করছিলেন স্বামীকে। তাঁর হাসিখুশী স্বচ্ছন্দ ভাবটা চোখ এড়ায় না ওঁর। এমনি অবজ্ঞা অবহেলার পর একটু বিবেকেও বাধে না ওঁর, তাঁর সামনে হাসিখুশী হয়ে এসে বসতে?

কাগজে কী একটা মজার খবর পড়ে হার্স্টউড্ জোরে হেসে ওঠেন।

মিসেস্ হার্স্টউড্ তাঁর চুল বাঁধা নিয়ে ব্যস্ত।

খানিক পরে হার্স্টউড্ অনুভব করেন, তাঁর মনের আনন্দটা পথ পাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে। জুলিয়া বোধহয় সকালের ব্যাপারটা নিয়ে এখনো মন খারাপ করে আছে। ওরই তো দোষ। যাক্‌গে, আগুকেশা চলে যাক্ না ও। একবার বললেই খুসী হয়ে যাবে।

একসময় বিশ্রী আবহাওয়াটা কাটানোর জন্য নিজেই কথা বলেন হার্স্টউড্, লেকফ্রন্ট থেকে উঠিয়ে দেবার জন্য ইলিনইস সেণ্ট্রালের বিরুদ্ধে কেস করেছে, শুনেছ জুলিয়া?

জুলিয়া তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দেন, না।

ভঙ্গী আর গলার স্বরে হার্স্টউড্ অনেক কিছুর ইঙ্গিত পান। খানিকটা নিজেকে খানিকটা জুলিয়াকে শুনিয়ে বলেন, কেসটা করে ভালোই হয়েছে।

সাড়া না পেয়ে আবার কাগজ পড়ার ভান করেন, কানটা সজাগ থাকে জুলিয়ার কাছ থেকে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা, ব্যাপারটা কী?

জুলিয়ার কাছ থেকে কিন্তু কোন সাড়াই আসে না। ব্যাপারটা একটু গভীরই। খুব রেগে আছেন মনে হচ্ছে। না তাঁকেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে।

হার্স্টউড্ এবার সোজাসুজি কথা বলেন, কুকুরটা কোত্থেকে পেল জর্জ? জানো নাকি?

স্ত্রী আগের মতোই ছোট্ট জবাব দেন, জানি না। কাগজটা নামিয়ে রেখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল হার্স্টউড্। না, আজ রেগে গিয়ে মনের আনন্দটা মাটি করা যায় না।

শেষে তিনি বল্লেন, সকালে কী এমন হয়েছে যে এখনো মন খারাপ করে আছ তুমি? এনিয়ে ঝগড়া করে কী হবে, যাও না, বেশ তো, তোমার যদি ইচ্ছে হয়, আওকেশা ঘুরে এসো।

জুলিয়া এবার তীক্ষ্ণ শ্লেষ দিয়ে বলে, ও তাহলে তোমার খুব সুবিধে হয় অন্য মেয়ের সঙ্গে ফুর্ত্তি করে বেড়ানোর না?

হার্স্টউড্ যেন একটা চড় খেলেন। এক মুহূর্ত্তে দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন তিনি। আত্মরক্ষার সুরে তিনি বল্লেন, কীবলছ তুমি?

জুলিয়া আয়নার থেকে মুখ নাফিরিয়েই তেমনি তীক্ষ্ণ ভাবেই বলে, কী বল্‌ছি তাতো ভালো করেই জানো তুমি।

· সব কিছুই তিনি জানেন, বেশী কথা বলতে চান না, এমনি একটা অর্থ তাঁর কথার মধ্যে।

হার্স্টউড্ ঘাবড়ে যান, তবু দৃঢ়স্বরে বলার চেষ্টা করেন, কী সব বলছ যাতা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

স্ত্রীর দৃঢ়তা দেখে তাঁর সাহস উড়ে গেছে। জুলিয়া কোন কথা বলেন না।

ঘাড়নেড়ে হার্স্টউড্ বলেন, হুঁ। সে স্বরে আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্নমাত্র নেই, জুলিয়া সেটা বেশ উপলব্ধি করেন। হিংস্র দৃষ্টিতে এবার ঘুরে বসেন জুলিয়া, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন, আওকেশা যাবার টাকাটা কালই চাই আমার।

স্তম্ভিত হয়ে তাকান হার্স্টউড্, জুলিয়ার উদ্ধত ভঙ্গীতে জ্বালা ধরে যায় মনে। না তাঁকেও আক্রমণ করতে হবে। উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কী বললে? টাকাটা চাইই তোমার। দিতেই হবে তোমাকে? তোমার মাথায় কী ঢুকেছে কী আজ? কী ভেবেছ তুমি?

—আমার মাথায় কিছু ঢোকেনি। টাকাটা চাই আমার। দিয়ে দিও। ওসব মাতব্বরি আমার কাছে করতে এসো না।

—কী, কী বললে, মাতব্বরি? একটা পয়সা পাবেনা তুমি বলে দিচ্ছি। এসব বাঁকা বাঁকা কথার মানে কি তোমার?

—ও, খুব যে? কাল রাত্রে কোথায় ছিলে তুমি, য়্যাঁ? সেদিন ওয়াশিংটন বুলেভার্ডে কার সঙ্গে বেড়ানো হচ্ছিল? কার সঙ্গে সেদিন থিয়েটারে দেখেছিল

তোমাকে জর্জ্জ? মনে করেছো আমি ঘাস খাই, না? তুমি ভেবেছ, আমার শরীর খারাপ বলে বন্ধুদের কাছে কৈফিয়েৎ দিয়ে মেয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে তুমি, আর আমি চুপ করে বসে থাকবো, না? তোমাকে স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি জর্জ্জ আমার কাছে বাহাদুরি ফলাতে এসো না। ছেলে মেয়েদের ওপরেও মাতব্বরি করতে পাবে না তুমি। তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হয়ে গেছে—এই বলে দিচ্ছি আমি।

. হার্স্টউড্ জানেন তাঁর কোন উত্তর নেই। তবু একটা কিছু বলতে হবে। প্রতিবাদ করে বলেন তিনি, মিথ্যে কথা এসব।

—মিথ্যে এসব? মিথ্যে বলতে চাও তুমি বলো, আমি জানি এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি।

চাপা তীক্ষ্ণ গলায় হার্স্টউড্ বলেন, আমি বলছি এসব মিথ্যে। ও, তুমি অনেকদিন ধরে একটা ছুতো খুঁজছিলে আমাকে জব্দ করার। তাই বুঝি এটা আবিষ্কার করলে? যা ভেবেছ তা হবে না। আমিও বলে দিচ্ছি আমিই সংসারের কর্ত্তা। কারোর হুকুম মেনে চলবো না আমি।

একটা তীক্ষ্ণ হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে হার্স্ট উড্ এগিয়ে আসেন। তার মনে হয় এই মুহূর্ত্তে বোধহয় এই নারীটাকে গলাটিপে মেরে ফেলতে পারেন।

জুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকাল হার্স্টউডের দিকে। বলেন, আমি হুকুম করছি না তোমাকে, আমার কী চাই তাই বলেছি।

জুলিয়ার স্থির নিষ্কম্প কণ্ঠস্বরে হার্স্টউডের সম্বিৎ ফেরে। আক্রমণ করা যাবে না, আইন সাক্ষ্য সম্পত্তি অনেক কিছু জুলিয়ার পক্ষে। বিপজ্জনক একটা তীব্রগতি জাহাজ হার্স্টউড্, কিন্তু তাঁর ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে।

—আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, এসব করে কিছু হবে না, তোমার খুসীমত সব কিছু হতে দেব না। টাকা তুমি পাবে না।

জুলিয়া বলেন, আচ্ছা দেখা যাবে। আমার কী অধিকার আছে কি না আছে সে আমি জানি। আমার সঙ্গে কথা বলতে না চাও, উকিলের কাছে বলতে বাধ্য হবে তুমি।

মন্ত্রের মত কাজ করলো জুলিয়ার এই অস্ত্রটা। হার্স্টউডকে ফণা নামাতে

হলো। ধমক দিয়ে কাজ হবে না, অবস্থাটা তাঁর পক্ষে মোটেই নয়। কী বলবেন, কী করবেন হার্স্টউড্ কিছুই ঠিক করতে পারেন না। সব বুদ্ধি তাঁর হারিয়ে গেছে। সারাদিনের সব আনন্দ মন থেকে মুছে গেছে। পরাজিত, করুণ, বিক্ষুব্ধ হার্স্টউড্।

শেষে বলেন, তোমার যা ইচ্ছা তাই করো, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোমার কোন কাজে আর বাধা দেব না আমি।

হতাশ পদক্ষেপে বেরিয়ে যান হার্স্টউড্।

যোল

ঘরে ফিরতে না ফিরতে ক্যেরীর মনে আবার দ্বিধা সন্দেহের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। স্থির সিদ্ধান্তে সে পৌঁছতে পারে না, এটাই তার চরিত্র। মত দিয়ে সে কি ঠিক করেছে? এখনও কি পিছু ফেরার পথ আছে? অনেক বোকামি মনে পড়ে তার, ড্রুয়েকে ফেলে যাওয়াটাও কি উচিত হবে? তাছাড়া এখন মোটামুটি সে ভালই আছে, কী হবে কে জানে ভবিষ্যতে। কত কিছুই তো ঘটতে পারে জীবনে। অনিশ্চিতের পিছনে ছুটে লাভ কী? যা আছে তাই ভালো, মনে নেই তোমার যেদিন না খেয়ে শুকিয়ে মরছিলে? এমনি নানা চিন্তা আসে ক্যেরীর মনে।

হার্স্টউডের সঙ্গে সম্পর্কটা আসলে কী? যে শুনেছে হেসেছে, সমর্থন জানিয়েছে, কিন্তু কই সম্পূর্ণভাবে মেনে নেয়নি একবারও। হার্স্টউডের আবেগ তার মন ভুলিয়েছে, তার যুক্তি বিবেক সব কিছু শুধু ভেসে গেছে। কই কোথায় তার দৃঢ় ভিত্তি? হার্স্ট উডের বয়স হয়েছে, আবেগ আছে, তাঁর কিন্তু যৌবনের সে আগুন কোথায়?

ঘরটা তেমনি অগোছালো হয়ে আছে, ক্যেরীর কিন্তু আজ আর নজরে এলো না এই বিশৃঙ্খলা। নিজের চিন্তায় মগ্ন সে।

ড্রুয়ে এলো প্রায় পাঁচটায়। ড্রুয়ে কিছু জেনেছে, কিছু জানে নি। হার্স্টউডের সঙ্গে ক্যেরীর কতদূর গড়িয়েছে সে জানতে চায়। জানবেই সে

মনটাকে ঠিক করে ফেলেছে। ক্যেরী জানালার ধারে রকিং চেয়ারটায় বসেছিল, বললো, কী এসে গেছ ? এত ব্যস্ত কিসের।

উত্তেজিত ড্রুয়ে সত্যি তার চঞ্চলতা গোপন করতে পারছিল না। ক্যেরীর সামনে এসে কিন্তু ড্রুয়ে ঘাবড়ে গেছে। কেমন করে কথাটা পাড়বে সে ভেবে পায় না। বলে, কখন ফিরেছ তুমি ?

এই তো ঘণ্টাখানেক আগে, ক্যেরী বলে। হঠাৎ একথা শুধোলে যে ?

—সকালে একবার ফিরে এসেছিলাম আমি, দেখলাম নেই তাই ভাবলাম বেরিয়েছিলে তুমি –

—বেরিয়েছিলামই তো, একটু ঘুরে এলাম। ক্যেরী সহজভাবে বলে।

ড্রুয়ে আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে থাকে ক্যেরীর দিকে অস্বস্তিকর দৃষ্টিতে। ক্যেরী একসময় বলে, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন তুমি ? কী হয়েছে কী ?

ড্রুয়ে বলে, কিছু না, এমনি। ভাবছিলাম।

—কী ভাবছিলে ?—ক্যেরী হেসে বলে। ড্রুয়ের ভাবটা কেমন।

—না এমন কিছু না। ড্রুয়ে বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে, কেমন করে শুরু করবে ভেবে পায় না। সে ভাবতে চেষ্টা করে, না ওসব কিছু না, ক্যেরী ঠিক আগের মতো তারই আছে। কিন্তু ঝি-টার খবরটা কামড়াতে থাকে মাথার মধ্যে। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করতে চায় সে, পারে না।

শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বলভাবে জিজ্ঞাসা করে, সকালবেলায় কোথা গিয়েছিলে তুমি ?

—কেন, বেড়াতে গিয়েছিলাম, বললাম তো ?

—ঠিক বলছো ?

—হ্যাঁ, একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ তুমি ? ক্যেরী একটু একটু বুঝতে পারে এবার যে ড্রুয়ে কিছু জানতে পেরেছে।

ড্রুয়ে আবার তেমনি বোকার মতো বলে, এই ভাবছিলাম, তুমি হয়তো ঠিক বেড়াতে যাও নি।

ক্যেরী ওর দিকে তাকায়। না, ড্রুয়েও দ্বিধা করছে। ওর সাহস ফিরে আসে আবার, এতটা ভয় পাবার কিছু নেই।

—কী সব বলছ যা-তা ? কী হয়েছে কী তোমার আজ ? ক্যেরী ভ্রূ কুঁচকে বলে এবার।

—হ্যাঁ, কেমন যেন লাগ্‌ছে।

এক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর ড্রুয়ে হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে।

—হার্স্টউডের সঙ্গে তোমার কী চলছে, বলবে আমাকে ?

—আমার সঙ্গে হার্স্টউডের ? কী বল্‌ছ কি তুমি ?

—আমি যখন ছিলাম না ওকি দশবারো বার আসেনি এখানে ?

. —দশবারো বার ?—ক্যেরী আবৃত্তি করে যেন ড্রুয়ের কথাটাকে।—নাতো, এসব কথার মানে কি তোমার ?

—শুনলাম তুমি ওর সঙ্গে বেড়াতে যেতে, আর রোজই প্রায় না কি সে আসতো।

—কে বলেছে কে, এসব বানানো গল্প ?

ক্যেরীর চুলেব গোড়া পর্য্যন্ত বোধহয় লাল হয়ে গেছে। কিন্তু ঘরের মৃদু আলোয় ড্রুয়ে সেটা বুঝতে পারলো না। ক্যেরীর অস্বীকৃতিতে তার বিশ্বাস ফিরে আসছে।

—এই একজন বলছিল। ঠিক তো যাওনি তুমি ? ড্রুয়ে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে চায় ক্যেরীকে।

ক্যেরী বলে, নিশ্চয়ই। তুমি তো জানো ক'বার উনি এসেছেন।

ড্রুয়ে একমুহূর্ত থেমে ভেবে বলে, তুমি যা বলেছ তাই জানি আমি।

অস্থিরভাবে পায়চারী করে ড্রুয়ে। ক্যেরী আতঙ্কিত স্বরে বলে, কই আমি তো এরকম কিছু বলিনি তোমাকে। কে বললে এসব কথা ?

ড্রুয়ে গ্রাহ্য করে না ক্যেরীর শেষ কথাটা। বলে, আমি হলে বিবাহিত কারু সঙ্গে এসব করতাম না।—কে ? কী বল্‌ছ ?—ক্যেরীর কথা আটকে যায়।

—কেন, হার্স্টউড্‌। ড্রুয়ে বুঝতে পারে তার কথায় কাজ হয়েছে শেষ ঘা-টা সে ইচ্ছে করেই জোর করে দেয়।

ক্যেরী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়, হার্স্টউড্‌! পরপর কয়েকবারই কথ

রুক্ষতায় তার মুখের। স্তম্ভিতভাবে সে বলে, কে বলেছে তোমাকে?—এই মুহূর্তে ভুলে যায় ক্যেরী তার আগ্রহটা অশোভন হয়ে পড়েছে।

ড্রুয়ে বলে, কে আবার বলবে, আমি জানি না। বহুদিন থেকেই তো জানি।

ক্যেরী ভেবে কূল পায় না। কথা হাতড়ে বেড়ায়।

ড্রুয়ে বলে, তোমাকেও তো বলেছি আমি বোধহয়।

ক্যেরী আর কথা বলতে পারে না। জানালার কাছে চলে গিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

ড্রুয়ে আহতস্বরে বলে, তোমার জন্যে এত করেছি আমি। আর তুমি হার্স্টউডের সঙ্গে—

—তুমি, তুমি কী করেছ আমার জন্যে—ক্যেরী যেন ফেটে পড়ে।

ক্যেরীর মাথায় আগুন জ্বলছে। ধরা পড়ার লজ্জা, হার্স্টউডের বঞ্চনা, ড্রুয়ের প্রতারণা, সব কিছু মিলে পাগল করে দিচ্ছে তাকে। শুধু একটা কথাই মনে হয় তার। ড্রুয়েরই দোষ। কেন এনেছিল সে হার্স্টউডকে? কেন সে বলেনি হার্স্টউড্ বিবাহিত। হার্স্টউডের কথা বাদ দাও, ও কেন সাবধান করে দেয়নি তাকে? বিশ্বাসঘাতকতা করে এখন সে কী কী করেছে তাই শোনাচ্ছে, ভীরু কাপুরুষ নির্লজ্জ।

ড্রুয়ে বুঝতে পারে ক্যেরীর মনের এই তীব্র বিক্ষোভ। সে বলে, বাঃ, কিছু করিনি তোমার জন্যে?

—ও অনেক করেছ না? তুমি প্রতারণা করেছ আমার সঙ্গে, এইটুকুই শুধু ঠিক। মিথ্যে কথা বলে তোমার বন্ধুদের নিয়ে এসেছ এখানে। তুমি তুমি আমাকে?—ক্যেরীর গলায় আর কথা ফোটে না। হাতদুটো মোচড়াতে থাকে সে।

—বাঃ তাতে কী হয়েছে?—ড্রুয়ে বোকার মতো বলে।

—না, কিছু হয় নি। তুমি কিছু বোঝ না। তুমি প্রথমে আমাকে বলতে পারতে না? এখন কাপুরুষের মতো এসেছ আমাকে সাবধান করতে, এখন শোনাচ্ছ আমার জন্যে কী কী করেছ তুমি?

ক্যেরীর চরিত্রের এই দিকটা ড্রুয়ে কখনো ভেবে দেখেনি। আবেগে, ক্রোধে, জ্বালায় কাঁপছে ক্যেরী। তারও দোষ একটু আছে বৈ কি। কিন্তু সে আর এমন কি ? ক্যেরীই তো তার সঙ্গে বঞ্চনা করেছে।

—কে কাপুরুষ, কে লুকোচ্ছে এবার ?

ক্যেরী উত্তেজিতভাবে বলে, তুমি তুমি তুমি, নির্লজ্জ, ভণ্ড, কাপুরুষ, দাম্ভিক তুমি। তোমার যদি এতটুকু মনুষ্যত্ব থাকতো কখনো এসব করতে না।

ড্রুয়ে হবাক্ হয়ে যায় ক্যেরীর রাগ দেখে। বলে, আমি কাপুরুষ মোটেই নই, কিন্তু তোমার অন্য লোকের সঙ্গে ইয়ে করার কী মানে হয় ?

—ও, অন্য লোক ? হ্যাঁ আমি ঘুরতাম হার্স্টউডের সঙ্গে। কিন্তু কার দোষ সেটা ? হার্স্টউডকে কে এখানে এনেছিল ? তুমি আনো নি ? তুমি বলোনি তাকে এখানে আসতে, আমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে ? এখন এসে শোনাচ্ছ তুমি, আমার যাওয়া উচিত হয় নি, সে বিবাহিত লোক—

শেষ কথাটায় থেমে যায় ক্যেরী। হার্স্টউডের প্রবঞ্চনা তীরের মত বিঁধেছে তাকে। ক্যেরী কেঁদে ফেলে।

ড্রুয়ে বলে, তাই বলে তুমি আমার অসাক্ষাতে ওর সঙ্গে ফুর্তি করে বেড়াবে, কী করে জানবো আমি ?

ড্রুয়ের কথায় ক্যেরী আবার ফুঁসে ওঠে—তা জানবে কেন ? তুমি শুধু ভেবেছ তোমার তৃপ্তি হলেই হলো, তোমার যা খুসী তাই করবে। আমাকে খেলনা পেয়েছ তুমি, না ? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ভুল ধারণা তোমার। তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই আমার। তোমার যা যা আছে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

মাথা থেকে একটা পিন্ খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ক্যেরী। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ায়, তার জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে।

ক্যেরীর নতুন চেহারাটায় ড্রুয়ে আবার মুগ্ধ হয়। বিস্মিতভাবে তাকিয়ে থেকে বলে, বাঃ, দোষ করেছ তুমি, আবার রাগও দেখাচ্ছ আমার ওপর। এত করলাম তোমার জন্যে ?

ড্রুয়ে বলে, অনেক করিনি তোমার জন্যে ? বাঃ তোমাকে কাপড় জামা

দিয়েছি, যেখানে যেতে চেয়েছ নিয়ে গেছি। আমার যা আছে, তোমাকে তার থেকে বরং বেশীই দিয়েছি, দিই নি?

ক্যেরী অকৃতজ্ঞ নয়। মনে মনে সে স্বীকার করে সব কিছু, কিন্তু রাগ পড়ে না তার। সে জানে ড্রুয়ে তার ক্ষতি করেছে।

সে বলে, আমি বলেছিলাম তোমাকে দিতে?

ড্রুয়ে বলে, না আমি দিয়েছি, তুমি নিয়েছ।

—এমনভাবে বলছ তুমি যেন তোমাকে দিতে বাধ্য করেছি আমি। যা আছে নিয়ে যাও তোমার, কিছু চাই না আমি। আজই রাত্রে নিয়ে যেও তুমি যা কিছু আছে। একমুহূর্তও আমি আর থাক্‌ছি না এখানে।

ড্রুয়ে এবার রেগে যায়। কতোবড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তার। বলে, বাঃ চমৎকার, এতদিন খেয়ে পরে আদরে আহ্লাদে থেকে, তারপর গালাগালি দিয়ে চলে যাচ্ছ। বাঃ, সব মেয়েই এমনি। যখন কেউ কোথাও ছিল না, কষ্ট পাচ্ছিলে তখন নিয়ে এলাম আমি, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকলে, তারপর যেই আর একজন জুটলো, অমনি আমি খারাপ হয়ে গেলাম! আমি জানতাম এমনিই হবে একদিন।

সত্যিই ড্রুয়ে আহত হয়েছে। সে অনুভব করেছে অন্যায় করা হচ্ছে তার ওপর।

ক্যেরী বলে, না তা নয়। আর কারো কাছে যাচ্ছি না আমি। তোমাকে ঘৃণা করি আমি বুঝেছ, তোমার সঙ্গে আর এক মুহূর্ত থাকতে চাই না আমি। তুমি একটা সাংঘাতিক—

কী বলতে গিয়ে আর বলে না ক্যেরী।

—না হলে এরকম কথা কখনো মুখ দিয়ে বেরুতো না তোমার।

টুপিটা নিয়ে জ্যাকেটটা ঝুলিয়ে নেয় ক্যেরী। বেদনাহত মুখের ওপর দু'একগুচ্ছ চুল উড়ে বেড়ায়। চোখ দুটো ক্রন্দনোন্মুখ কিন্তু জল নেই। অনির্দিষ্ট, কিছুই ঠিক নেই, কোথায় যাবে সে, কী করবে।

—বাঃ চমৎকার হলো, ড্রুয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বলে। এলাম গেলাম, যা গেল তোমার। আমি নিশ্চয়ই জানি হার্স্টউডের সঙ্গে তোমার

যোগাযোগ ছিল, না হলে এমনি চলে যেতে না তুমি। যাক্‌গে, চলে যেতে হবে না তোমাকে আমার জন্তে, আমার এ বাসাটার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকতে পারো। কিন্তু একটা কথা বলবো ক্যেরী, আমার উপর ঠিক সুবিচার করনি তুমি।

ক্যেরী বলে, তোমার সঙ্গে থাকতে চাই না আমি। কিছুই করনি তুমি, অথচ বারে বারে দুনিয়ার লোককে শুনিয়ে বেড়াচ্ছ। অনেক অনেক করেছ আমার জন্তে।

—কে বললে আমি শুনিয়ে বেড়াচ্ছি, কাউকেই কিছু বলিনি আমি।

ক্যেরী দরজার দিকে এগিয়ে যায়। ড্রুয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

—কোথা যাচ্ছ?

ক্যেরী বলে, যেতে দাও আমাকে।

—কোথায় যাচ্ছ? ড্রুয়ে আবার বলে। ক্যেরী এমনি করে চলে যাবে কোথায়, ড্রুয়ে সহ্য করতে পারে না। তার অভিযোগ আছে সত্যি, তবু ক্যেরীর জন্ত বেদনা অনুভব করে সে।

ক্যেরী কোন কথা বলে না, দরজাটা খোলার চেষ্টা করে।

অবস্থাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। ক্যেরী আর একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে।

ড্রুয়ে সস্নেহে বলে, ক্যেরী, একটু ভেবে দেখো, এমন করে কোথায় যাবে তুমি। তোমার তো যাবার জায়গা নেই এখন কোথাও। এখানে থাকো না কেন? আমি কথা দিচ্ছি, বিরক্ত করবো না তোমাকে, আমি থাকবো না এখানে।

দরজা থেকে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যেরী।

ড্রুয়ে বলে, ভেবে দেখো, পাগলামি করো না। আমি ধরে রাখতে চাই না তোমাকে। যদি যেতে চাও একান্তই যেও, কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে দেখো। সত্যি বলছি আমি আটকে রাখতে চাই না তোমাকে।

ক্যেরী কোন জবাব দেয় না, ড্রুয়ের যুক্তিটা সে ভেবে দেখছে।

শেষ পর্য্যন্ত ড্রুয়ে বলে, তুমি থাকো এখানে, আমিই চলে যাচ্ছি।

ক্যোরী মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। নিজে ডুয়ে, হাস্টউড সবাই অবিচার করেছে পরস্পরের প্রতি। অথচ প্রত্যেকের চরিত্রেই একটা ভালো দিক আছে।

বাইরের দুনিয়াটার কথা মনে পড়ে তার, কোথাও কোন ভরসা নেই। এখানেই বা কী? ঘর তার নয় ডুয়ের। সব কিছু মিলে তার অবস্থাটা দাঁড়-নোঙরহীন নৌকার মতো, শুধু ভেসে যেতে দাও, কিছু করার নেই। অদ্ভুত তার অবস্থা।

খানিক পরে এগিয়ে এসে ওর হাতটা ধরে ডুয়ে বলে, ক্যোরী—

ক্যোরী হাত সরিয়ে নেয়, 'না'। চোখ থেকে রুমালটা কিন্তু সরায় না সে।

—আচ্ছা, ঝগড়ার কথাটা না হয় ভুলেই যাও। এমনি চলুক। এমাসটা অন্ততঃ থাকো এখানে, ভেবে দেখ, তারপর যা ইচ্ছে করো তুমি।

ক্যোরী কোন জবাব দেয় না।

—এইটেই ভালো, এখন ঝোঁকের মাথায় চলে গিয়ে কোথায় উঠবে, তোমার তো যাবার জায়গা ঠিক নেই কিছু।

ক্যোরী এবারও কোন কথা বলে না।

—যদি থাকো, এখনকার মত এসব কথা থাক, আমি চলে যাচ্ছি।

ক্যোরী রুমালটা নামিয়ে জানালা দিয়ে তাকায়।

—কী, থাকছো তো?

কোন উত্তর নেই।

ডুয়ে আবার বলে, কী, বলো?

ক্যোরী রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—বলো, বলো, থাকবে?

উত্তর দিতে বাধ্য হয় ক্যোরী। বলে, বুঝতে পারছি না।

—একবার বলো থাকবে, আর আমি কোন কথা বলবো না। তোমার পক্ষে এখন বিশ্রাম করাই দরকার।

ক্যোরী শোনে, বোঝে ডুয়ের সমবেদনা আছে, কঠোর রুক্ষ সে নয়। শুধু

তাই নয়, ড্রুয়ে এখনও তাকে চায়। একটু অনুশোচনা আসে ক্যেরীর। অদ্ভুত অসহায় একটা অবস্থা তার।

ড্রুয়ের মনোভাবটা ঈর্ষ্যান্বিত প্রেমিকের মতো। ক্যেরী ঠকিয়েছে ওকে, রাগ হয়। ক্যেরী চলে যাবে দুঃখ হব। নিজেকে পরাজয় স্বীকার করতে হবে, অপমান বোধহয়। সে চায় ক্যেরী থাক, নিজের ভুল বুঝুক, সেইটেই তার চরম লাভ।

—থাকছো তো?

—দেখি ভেবে।

. প্রশ্নটার সমাধান হলো না, তবু তো এখনকার মত মেনেছে ক্যেরী, হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে আবার। ড্রুয়ে নিজের জিনিষপত্র গুছিয়ে নেবার ভাণ করে। ক্যেরী দেখে। কতকগুলো কথা মনে আসে তার। ও ভুল করেছে বটে, কিন্তু সে-ও কি করেনি? যত দোষই থাক তার, ড্রুয়ের হৃদয়ে মমতা আছে। এতক্ষণ এত ঝগড়া হলো কই একবারও তো কঠিন কথা বলে নি সে। আর হার্স্টউড্? ড্রুয়ের থেকেও অনেক বড় ভণ্ড সে। কতো বড় বড় কথা বলেছে সে, কিন্তু সব মিথ্যা সব মিথ্যা ভণ্ডামি তার। না হার্স্টউডের সঙ্গে আর না। ড্রুয়ে এখনো তাকে চায়, সাধাসাধি করছে তাকে থাকার জন্যে। এই ঘর বাসা সব তারই থাকতে পারে, কোথায় যাবে সংসারের মাঝে আগের মত মার খেতে!

ড্রুয়ে ভাবতে পারে না সব কিছু শেষ হয়ে যাবে ও ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ক্যেরীর প্রতি আকর্ষণটা ওর কমেনি মোটেই। সব মিটিয়ে ফেলতে হবে, হার্স্টউডকে মুছে ফেলতে হবে।

খানিক বাদে সে বলে, আচ্ছা, স্টেজে চেষ্টা করে দেখবে?

ক্যেরী যে কী ভাবছে ড্রুয়ে তা জানে না। ক্যেরী বলে, কী যে করবো কিছু ঠিক নেই এখন।

—যদি ঠিক করো কিছু আমাকে বলো, আমি বোধহয় সাহায্য করতে পারবো। ও লাইনে আমার অনেক বন্ধু আছে।

ক্যেরী কোন জবাব দেয় না।

—একেবারে ফাঁকা হাতে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। আমি কিছু দিচ্ছি এখন রেখে দাও।

ক্যেরী তার চেয়ারটায় দোল খায় শুধু।

—চেষ্টা করতে হবে বৈ কি, তবে আগের মতো এত কষ্ট করে নয়, তাতে হয়ও না কিছু।

আরো ছোটখাটো দু'একটা কাজ সারে ড্রুয়ে। মাঝে মাঝে দু' একটা কথা বলে, ক্যেরী শুধু দোল খায় চেয়ারে।

—আচ্ছা সব খুলে বলছ না কেন আমাকে। এ আর এমন কি, তুমি তো সত্যিই হার্স্টউডকে ভালোবাসো না, না?

ক্যেরী বলে, আবার এসব কথা কেন তুলছ? তোমারই তো দোষ দোষ।

ড্রুয়ে বলে, আমার কী দোষ।

ক্যেরী বলে, তুমি কেন এসব কথা বললে আমাকে।

ড্রুয়ে বলে, তুমি তো আর ওর সঙ্গে তেমন কিছু করোনি। ড্রুয়ে ক্যেরীর কাছ থেকে একটা স্পষ্ট অস্বীকৃতি শুনতে চায়।

সন্ধি-চুক্তিটা এমনি মোড় নেবে কে জানতো। ক্যেরী বলে, আমি এসম্বন্ধে কোন কথা বলতে চাই না।

ড্রুয়ে তার অবস্থাটা জানতে চায়। সে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, আমাকে বলো কিছু, আমার সম্বন্ধে তুমি—

রাগ ছাড়া আর কী করতে পারে ক্যেরী। সে বলে, কিছু বলতে পারবো না আমি। যা কিছু ঘটছে সব তোমার দোষে।

ড্রুয়ে হঠাৎ হাতটা নিয়ে বলে, তাহলে তুমি এখনো ওর জন্যে—

ক্যেরী বলে, চুপ করো, চুপ করো তুমি।

ড্রুয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমাকে বোকা বানাবে তা হবে না বলে দিচ্ছি। তোমার যা খুশী করো ওর সঙ্গে, কিন্তু আমাকে নিয়ে আর নাচাতে পারবে না তুমি।

যে ক'টা জিনিষ বাকী ছিলো দুমদাম করে থলিটার মধ্যে ভরে ফেলে ড্রুয়ে। তারপরে কোটটা টান মেরে কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যায়।

দরজার কাছে গিয়ে বলে, মরুকগে আমার কী? তারপর একধাক্কায় দরজাটা টান মেরে খুলে ফেলে বেরিয়ে গিয়ে দড়াম করে বন্ধ করে দেয়।

ক্যোরী জানালা থেকে দেখে। হঠাৎ ডুয়ে এমন রেগে উঠলো কেন সে ভেবে পায় না। আশ্চর্য্য লাগে, এতক্ষণ যে ধৈর্য্য ধরে একটা কড়া কথাও বলেনি, বরং বোঝাপড়ার জন্যে ক্যোরীকে ঠাণ্ডা করার কথা ভেবেছে, সে হঠাৎ এমন হয়ে গেল কেন? নিজের চোখ কানকে যেন বিশ্বাস হয় না। মানুষের আবেগের উৎসটা ক্যোরী বোঝে না। প্রেমের সূক্ষ্ম শিখাটা আলেয়ার মতো পরীদের আনন্দ রাজ্যে নিয়ে যায়, তারপর আবার বিরাট একটা অগ্নিকুণ্ডের মতো ভীষণভাবে জ্বলে ওঠে।

. জ্বলে ঈর্ষ্যায়।

সতেরো

হার্স্টউডের এদিকে মহাসঙ্কট। স্ত্রীর কাছে হার মানতে হয়েছে। এরপর থেকে জুলিয়া সব সময় কর্তৃত্ব করতে চাইবে। একবার তাঁকে বাগে পাওয়ার পর জুলিয়া নিশ্চয়ই বসে থাকবে না। টাকা পয়সার ব্যাপারে জুলিয়ার কথাই মেনে চলতে হবে তাঁকে। কী কুক্ষণেই না সম্পত্তিটা ওর নামে কিনেছিলেন। আইন ওর দিকে।

শুধু তাই নয় জুলিয়া যদি হৈ চৈ শুরু করে, তাঁর নাম যদি কাগজে ওঠে তাঁকে মাথা হেঁট তো করতেই হবে, উপরন্তু চাকরীটাও যাবে। বন্ধুবান্ধবের কাছে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

এইসব চিন্তার মাঝখানে ক্যোরীর মুখ ভেসে ওঠে। সামনে শনিবার। এইটুকুই তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ এখন। ক্যোরীকে বুঝিয়ে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করানো যাবে, কিন্তু তারপর? তারপর কী?

সকালবেলাকার ডাকটা দেখে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। না,. এখনও এমন কিছু ঘটেনি। হয়তো এমন কিছু ঘটতে পারে যাতে সব দিকের একটা সুরাহা হয়ে যাবে।

পার্কে ক্যোরীর সঙ্গে আজ দেখা করার কথা। কিন্তু ক্যোরী এলো না।

একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর হার্স্টউড্ অস্থিরভাবে পায়চারী শুরু করলেন। অবশ্য অনেক কিছু বাধা আসতে পারে। ক্যোরী বোধহয় বার হতে পারছে না কোন কারণে। অফিসে হয়তো চিঠি এসেছে এতক্ষণ।

না, কোন চিঠিও আসে নি।

দেড়টার সময় রেক্টর থেকে লাঞ্চ খেয়ে আসার পর অফিসে এসে দেখলেন একটা অল্পবয়সী বেয়ারা চিঠি নিয়ে অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে।

বেয়ারাটা বললো, আমাকে উত্তর নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীর হাতের লেখা, অত্যন্ত স্পষ্ট চিঠির ভাষা—এখুনি টাকাটা চাই আমার। চাকরটার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবে আশা করি। তুমি আসো না আসো কিছুই যায় আসে না আমার। দেরী করো না, টাকাটা এখুনি পাঠিয়ে দাও।

স্ত্রীর ঔদ্ধত্যে হার্স্টউড্ স্তম্ভিত হয়ে যান। মনে হয় এখুনি লিখে দেন, জাহান্নমে যাও তুমি। শেষ পর্য্যন্ত সেটা আর বললেন না, বেয়ারটাকে বললেন, বোলো, কোন উত্তর দিলেন না।

না এমন করে চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। জুলিয়া চুপ করে বসে থাকার পাত্রী নয়। একবার যখন বলেছে ও অনেক কিছু করতে পারে। আচ্ছা তিনিও দেখে নেবেন। ওর বিষ-দাঁত ভাঙবেন তিনি, যদি গায়ের জোরেও হয় তাই সই। আমার পিছনে লাগলে আমিও ওকে ছেড়ে দেব না।

চারটের সময় আর একখানা চিঠি এলো—টাকাটা যদি না পাওয়া যায় তবে পরের দিন সকালেই ফিজেরাল্ড ও ময়ের কাছে সব ব্যাপারটা বলে দেওয়া হবে, এবং অন্যান্য ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হবে।

অনেকক্ষণ ভাবলেন হার্স্টউড্ তারপর ঠিক করলেন, টাকাটা দেবেন তিনি। এখুনি তিনি নিজেই যাবেন, একবার বোঝাপড়া করবেন জুলিয়ার সঙ্গে।

বৃষ্টি পড়ছিল। রাস্তায় যেতে যেতে হার্স্টউডের মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কতটুকু জানে ও। সে কী ক্যোরীকে চেনে, ডুয়েের কাছ থেকে জেনেছে ও? একটা রফা করে ফেললেই হতো, জুলিয়ার মতো একরোখা চালাক মেয়ে,

হাতিয়ার না নিয়েই কি লড়তে নেমেছে তাঁর সঙ্গে। দেখা যাক্, গোলমাল না করাই ভালো, এখনও যদি একটা মিটমাট করা যায়।

বাড়ীতে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে দরজাটা খোলার জন্য চাবি লাগিয়ে দেখলেন খুলছে না। ভেতর থেকে অন্য চাবি কে লাগালো আবার? হাতলটা ধরে জোরে জোরে নাড়া দিলেন। সাত্যিই বন্ধ। তারপর কলিং বেল্‌টা বাজালেন। কোন উত্তর নেই। আবার জোরে জোরে বাজালেন, ধাক্কা দিলেন। কোন সাড়া নেই। নীচে চলে এলেন হার্স্টউড্, কী ব্যাপার? আশ্চর্য্য, রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে যাবার দরজাটাও বন্ধ। রান্নাঘরের জানালাগুলোও বন্ধ। আর একবার নীচের কলিং বেলটা বাজালেন তিনি, না কেউ নেই।

. ফিরে এসে গাড়ীর লোকটাকে যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বললেন, বাইরে গেছে বোধ হয় সব।

লোকটা বললো, জানালার থেকে একটি মেয়েকে দেখলাম আমি।

হার্স্টউড্ তাকিয়ে দেখলেন এখন আর কেউ নেই সেখানে।

আস্তে আস্তে গাড়ীটায় চড়ে বসলেন। একদিকে স্বস্তিবোধ করলেন অন্য দিকে আরো চিন্তিত।

তাহলে জুলিয়ার মতলব হলো ওঁকে বাড়ী ঢুকতে না দেওয়া অথচ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে নেওয়া। অদ্ভুত!

আঠারো

এ এক অদ্ভুত বিশ্রী অবস্থা। এ দিকের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ মনে পড়ে হার্স্টউডের ক্যেরীর চলে আসার দিন। কোন আয়োজনই করা হয় নি। কোন কিছুই ঠিক করা হয় নি।

ক্যেরী দেখাও করলো না, কোন চিঠিও নেই। কিছু বোঝা যাচ্ছে না কী করা যায়।

ক্যেরী কি কিছু জানতে পেরেছে? সেও যদি আজ বলে, সব জেনে গেছে,

তাঁর সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই ওর! ভাগ্য যখন ষড়যন্ত্র করেছে তাঁর বিরুদ্ধে তখন এইটাই বোধ হয় স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে টাকাটাও পাঠানো হয় নি।

অনেক ভেবেও কোন পথ পেলেন না তিনি। শেষ পর্য্যন্ত টাকাটাই পাঠানো ঠিক করলেন। টাকাটা একটা খামের মধ্যে ভরে একটা বেয়ারার হাতে দিয়ে বললেন, এটা মিসেস্ হার্স্টউডের হাতে দিয়ে আসবে।

—হ্যাঁ, শোনো, যদি ওঁকে না পাও, ফিরিয়ে আনবে এটা। ওঁকে চেনো তো?

বেয়ারাটা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা জল্‌দি যাও।

—কোন উত্তর আনতে হবে?

—বোধ হয় না।

টাকাটা পাঠিয়ে আবার চিন্তায় ডুবে যান হার্স্টউড্। টাকাটা পেয়ে জুলিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসবে, সেই তো দিতে হলো, কেমন? সে জানবে এরই জয় হয়েছে, হার্স্টউডকে ওর কাছে মাথা হেঁট করতে হয়েছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বেয়ারাটা ফিরে এলো।

—কী?

—হ্যাঁ, স্যার, দিয়ে এসেছি।

—আমার স্ত্রীকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিছু বলেছেন?

—বললেন, খুব সময়ে এসেচো।

হার্স্টউড্ ঠোঁটটা কামড়ে ধরেন। আজ রাত্রে আর এদিক থেকে করার কিছু নেই।

পরের দিন আবার ডাক খোলেন হার্স্টউড্ ভয়ে ভয়ে আশায় দুরুদুরু বুক। না, আজও কোন চিঠি নেই জুলিয়ারও না, ক্যেরীরও না। টাকাটা যখন নিয়েছে জুলিয়া অন্ততঃ সপ্তাহ দুয়েকের মত নিশ্চিন্ত তিনি। ভাবার সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু ক্যেরী? ক্যেরীর কী হলো? ওয়েস্ট সাইড পোস্টাফিসের ঠিকানায়

একটা চিঠি দিলে কেমন হয়? কিন্তু সোমবারের আগে তো পাবে না তাহলে। আরো তাড়াতাড়ি চাই।

আরো আধ ঘণ্টা ভাবলেন তিনি। অন্য উপায়ই বা কী? শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটা লিখে ফেললেন তিনি। তারপর আবার চিন্তা।

একটার পর একটা ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। এখন ক্যোরীকে নতুন জায়গায় গুছিয়ে বসতে সাহায্য করার কথা। বিকেল হয়ে গেল, কিছুই করা হলো না।

চারটে, পাঁচটা, ছ'টা। কোনো চিঠি নেই, কোনো খবর নেই।

শনিবার গেল, রবিবার এলো। কিছু না, কিছুই করা হলো না, কোন খবর নেই।

সোমবার সকালের ডাকে একটা এ্যাটর্নীর চিঠি এলো। ম্যাক্‌গ্রেগর, জেমস্ এণ্ড হে কোম্পানী জানিয়েছেন—মিসেস্ জুলিয়া হার্স্টউড্ তাঁদের নিযুক্ত করেছেন তাঁর কতকগুলো সাংসারিক দাবী আর সম্পত্তি সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে দেবার জন্য। মিঃ হার্স্টউড্ কী দয়া করে যথা সত্বর, সম্ভব হলে এখুনি, দেখা করবেন ওঁদের অফিসে?

ক'বারই চিঠিখানা পড়লেন। পারিবারিক অশান্তির এই তো শুরু! চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরলেন তিনি।

এদিকে ক্যোরীর কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। নিশ্চয়ই সে জেনে গেছে সব, এখন আর সন্দেহ নেই তাঁর। অসহ্য লাগে ওঁর এখন এই বিপদের দিনে ক্যোরীর সান্নিধ্যই তাঁকে বাঁচাতে পারতো। ক্যোরীকে সত্যিই ভালবেসেছেন তিনি। আজ যখন ক্যোরী হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন মনে হয় ক্যোরীকে চাই-ই তাঁর, ক্যোরী অতুলনীয়া।

যাই ঘটুক, ক্যোরীকে তাঁর চাই-ই। ক্যোরীকে সব কথা খুলে বলবেন তিনি। ক্যোরী কি বুঝবে না? বোঝাতেই হবে তাঁকে। যতক্ষণ না রাগ পড়ে ক্যোরীর, তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু সে যদি ওখানে না থাকে, যদি চলে গিয়ে থাকে অন্য কোথাও? যদি দেখাই না হয় ক্যোরীর সঙ্গে?

মঙ্গলবার ওগ্‌ডেন প্লেস পর্য্যন্ত অনেক সাহস করে গেলেন তিনি। কে একটা লোক ভীষণ লক্ষ্য করছে তাঁকে, পিছিয়ে এলেন তিনি। ফিরে আসতে

আসতে জর্জের অফিসটা পড়লো। তীব্র একটা বেদনা অনুভব করেন তিনি। কতবার এসেছেন তিনি এখানে। কতবার জর্জ ডেকে এনেছে তাঁকে। আজ চার পাঁচদিন হয়ে গেল ছেলেমেয়েরাও কেউ দেখা করেনি তাঁর সঙ্গে। ওঁর জন্য মন কেমন করে না কারো? কেউ লক্ষ্যই করলো না, তিনি কদিন বাড়ী নেই!

রেস্টুরে খাওয়া সেরে অফিসে ফিরে এলেন তিনি। ফিজেরাল্ডের সান্ধ্যকালীন জমজমাট আসরে ভুলে থাকেন তিনি। এইটেই একমাত্র আশ্রয় তাঁর এখন।

বুধবার ম্যাক্‌গ্রীগর কোম্পানীর কাছ থেকে আর একটা নোটিশ এলো —মহাশয়, আপনাকে জানাইতেছি যে মিসেস্ হার্স্টউডের পক্ষ হইতে আপনার বিরুদ্ধে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করার পূর্ব্বে আমরা কাল (বৃহস্পতিবার) বেলা একটা পর্য্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি আপনার পক্ষ হইতে কোন সংবাদ না পাই তবে বুঝিব যে আপনি এ বিষয়ে কোন মীমাংসায় আসিতে রাজী নহেন এবং সেইমত ব্যবস্থা করিব।

আপনার…

মীমাংসা! হার্স্টউড্ তীব্র ক্ষোভে জ্বলে ওঠেন।

ভবিষ্যতের স্পষ্ট ইঙ্গিত এই নোটিশ। যদি দেখা না করেন ওরা কেস্ করবে। আর দেখা করলে এমন সব সর্ত্ত দেবে যা মানা তাঁর কাছে আত্মহত্যার সামিল। চিঠিটা মুড়ে অন্যান্য চিঠির সঙ্গে তুলে রেখে দিলেন। তারপর টুপিটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন হার্স্টউড্।

উনিশ

ড্রুয়ে চলে যাওয়ার পর ক্যেরী বিহ্বল হয়ে বসে থাকে। কী যে ঘটে গেল মাথায় যেন তার কোন উপলব্ধি নেই। শুধু জানে ড্রুয়ে রেগে চলে গেছে।

ড্রুয়ে যদি আর না আসে? চিন্তাটা হঠাৎ তার মাথায় এলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ক্যেরী তার ঘরটা। এসব কিছুই তার নয়, থাকবেও না। এ ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

হার্স্টউডের কথা কিন্তু ক্যেরী মনেও স্থান দেয় না। নীচ কাপুরুষ। তাকে কী বিপদেই না ফেলতে যাচ্ছিল হার্স্টউড্।

কিন্তু এখন কী করবে সে? আবার সেই চাকুরীর জন্য রাস্তায় রাস্তায় খালিপেটে ঘোরা।

থিয়েটার! এই একটা উপায় হয়তো আছে। ড্রুয়ে বলেছিল।...

অনেকক্ষণ বসে থাকে ক্যেরী। ভাবে আর ভাবে। এক সময় ক্ষিদে পায়। কাবার্ডটা খুলে সকালবেলার ব্রেকফাস্টের অবশিষ্টটুকুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্যেরীর মনে কত কথাই জাগে। কত সংশয়, কত আশঙ্কা।

তবু তো মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু এখনো যায়নি তার। হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে আবার। ড্রুয়ে সত্যিসত্যিই তাকে ছেড়ে যাবে না হয়তো। ওর রাগটা ক্রোধ নয়, অভিমানের উত্তেজনা। কিন্তু সে যদি ফিরেও আসে এই ঘটনার পর আর কি সে শান্তিতে বাস করতে পারবে ড্রুয়ের সঙ্গে? শুক্রবার! ক্যেরীর মনে পড়ে হার্স্টউডের সঙ্গে দেখা করার কথা আজ। না ও পথে আর না। এগারোটার সময় অস্থির হয়ে ওঠে সে, কিছু একটা করা দরকার। চাকরীর চেষ্টায় বেরিয়ে পড়ে ক্যেরী। খানিক পরে বৃষ্টি নামলো জোর। ক্যেরী ফিরে এসে ঘরে বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবে।

শনিবার আবার বার হয় ক্যেরী। সেই পুরোনো দিনের মত দরজায় দরজায় ধাক্কা দেওয়া। তবে আগের চেয়ে ক্যেরীর চেহারার উন্নতি হয়েছে। পোশাকটাও বেমানান নয়। ভদ্র সুসজ্জিত চেহারার অনেক দাম।

কিছু একটা চায় সে। সৎ পথে থেকে জীবনযাপন করতে চায়। অনুগ্রহ নিয়ে দয়া কুড়িয়ে বাঁচবে না সে।

শনিবার একটায় বন্ধ হয় দোকান। ক্যেরি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। একটা অজুহাত পায়, চাকরী চাইতে হলো না আজকে।

সোমবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে সে। তাছাড়া সোমবারের মধ্যে কতকিছুই তো ঘটতে পারে। রবিবার ভেবে ঠিক করলো থিয়েটারেই চেষ্টা করে দেখবে সে। কিন্তু কেউ তো চেনা নেই তার। কার কাছে যাবে। না মিঃ হেলের কাছে যাওয়া যায় না, মিসেস্ হেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তার, লজ্জা করবে। পরিচিতের কাছে আত্মসম্মানে বাধে।

চিকাগো অপেরা হাউসের ম্যানেজার ডেভিড হেণ্ডারসনের নাম শুনেছে

সে। চেনেও না, কীভাবে দেখা করতে হবে তাও সে জানে না। তবু ভাবে ক্যেরী এই জায়গাটায় কিছু হতে পারে।

কিন্তু অপেরা হাউসের জাঁকজমক, ঐশ্বর্যে ক্যেরীর ভয় করে। এখানে তার মতো মেয়েকে কে গ্রাহ্য করবে। পিছিয়ে আসে ক্যেরী। আরো কয়েকটা অপেরা থিয়েটারের সন্ধান নেয় সে। সাহস পায় না এগিয়ে যেতে।

সেদিন রাত্রে মিসেস্ হেল এসে অনেকক্ষণ বক্‌বক্ করে গেলেন।

ড্রুয়ের এদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই। এমনি সময় ক্যেরীর মনে পড়ে ভ্যান ব্রুয়েন স্ট্রীটে তার দিদির কথা। পালিয়ে আসার পর থেকে একদিনও দেখা করা হয় নি। না, সেখানে আশা নেই। মনও চায় না।

ফিরে ফিরে মনে আসে হার্স্টউডের কথা। এমন করে পথে বসালো সে?

মঙ্গলবার সাহসে বুক বেঁধে সে চিকাগো অপেরা হাউসে ঢুকলো। বক্স-অফিসে জিজ্ঞাসা করতে লোকটি বললো, কাকে চান বলুন, কোম্পানীর ম্যানেজার না হাউসের?

ক্যেরীর চেহারাটা বোধ হয় ভালো লেগেছিল লোকটির, সদয় কণ্ঠেই ভদ্র ভাবে বলে সে।

ক্যেরীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, তাতো ঠিক জানিনা। ক্যেরীর বোকা-বোকা ভাবটা দেখে লোকটি আশ্চর্য্য হয়, বলে, কী জন্যে দেখা করতে চান বলুন তো?

ক্যেরী বলে, কোন চাকরী টাকরী খালি আছে কিনা—

—ও, তাহলে কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কিন্তু তিনি তো এখন নেই।

নেই শুনে ক্যেরী যেন বাঁচলো। কখন পাওয়া যাবে জেনে নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ক্যেরী চলে এলো।

এবার গ্র্যাণ্ড অপেরা হাউস। ক্যেরী কোনমতে শুধিয়ে শুধিয়ে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে পৌছায়। অনেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। বহুক্ষণ বাদে ক্যেরীর দিকে নজর পড়ে তাঁর। স্ত্রী পাশের আবার একটা ঝঞ্ঝাট।

বলেন, কী চাই আপনার?

ক্যেরী বুঝতে পারে এখানে তার কোন আশা নেই। তবু এসেছে যখন, কথা তো বলতেই হবে। সে যেন পরামর্শ চাইতে এসেছে। সেই ভাল, প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জা নেই।

—দেখুন, থিয়েটারে নামতে চাই আমি, আপনি কোন পরমর্শ দিতে পারেন আমাকে এ বিষয়ে।

ক্যেরীর চেহারায় একটু আকৃষ্ট হয়েছেন ম্যানেজার। তার সোজাসুজি সরল প্রশ্ন শুনে হাসেন।

—কী বলতে পারি আমি? আপনি এর আগে নেমেছেন কোথাও?

দু'একবার নেমেছি য়্যামেচার ক্লাবে। ম্যানেজার বিচক্ষণতা দেখিয়ে বলেন, এ সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেছেন?

ক্যেরী বলে, আজ্ঞে না।

ম্যানেজার বলেন, তাহলে তো—আচ্ছা, আপনি থিয়েটারে আসতে চান কেন?

লোকটির ঔদ্ধত্যে ক্যেরী চমকে যায়। কিন্তু হেসে বলে, একটা কিছু রোজগারের পথ তো চাই।

এই রকম একটা মেয়ের সঙ্গে একটু ভাব রাখতে দোষ কি? ম্যানেজার চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলেন, ও, তাইতো। কারণটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু চিকাগোতে কি সুবিধে হবে ঠিক? আপনার বরং নিউ ইয়র্কে গিয়ে চেষ্টা করা উচিত। অনেক সুযোগ সুবিধে আছে। এখানে বিশেষ কোন ভরসা দেখছি না।

ক্যেরী কৃতজ্ঞভাবে হাসে এতখানি উপদেশ পেয়ে। ম্যানেজার কিন্তু হাসিটার অন্য অর্থ করেন। ক্যেরীর সঙ্গে একটু মেলামেশা করা যাবে বোধ হয়।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বলেন ক্যেরীকে। অন্য লোক দুটি পরস্পর চোখ টেপে। একজন বলে, আচ্ছা বার্ণি আজ তাহলে আমি উঠি।

আর একজন কাগজটা টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগে পড়তে শুরু করে।

গলা নামিয়ে ম্যানেজার ক্যোরীকে বলেন, আচ্ছা কী ধরণের পার্ট চান আপনি, কোনো ধারণা আছে আপনার ?

ক্যোরী বলে, না এমন কিছু ঠিক নেই, যা পাই শুরুতে তাই ভালো।

—ও, আপনি তো এই শহরেই থাকেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ম্যানেজার তৃপ্তির হাসি হাসেন। গোপন কথা বলার মতো ভঙ্গীতে বলেন, আচ্ছা কোরাস্ গার্ল হয়ে নামতে চান ? কোন চেষ্টা করছেন ?

ম্যানেজারের হাবভাব কেমন যেন আপত্তিকর মনে হয় ক্যরীর। বলে, আজ্ঞে না।

—দেখুন অধিকাংশ মেয়েকেই ওইখান থেকেই শুরু করতে হয়।

ম্যানেজারের দৃষ্টিতে আবেদন।

ক্যোরী বলে আমি তা জানতাম না।

—ঢোকা অবশ্য শক্তই। তবে ওদিক থেকে সুযোগ সুবিধে হতেও পারে।

ঘড়িটা দেখে ম্যানেজার বলে, আমার একটা কাজ আছে দু'টোয়। এখন লাঞ্চে যেতে হবে। যদি কিছু মনে না করেন, আমার সঙ্গে চলুন না। ওখানে খেতে খেতে আলাপ করা যাবে এখন।

ম্যানেজারের উদ্দেশ্যটা হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্যোরী বলে, মাপ করবেন, আমাও একটা কাজ আছে।

ম্যানেজার বুঝতে পারেন বড্ড তাড়াতাড়ি করে ফেলেছেন তিনি। মেয়েটা ঘাবড়ে গেছে।—ও আচ্ছা। পরে আসবেন। দেখি যদি কিছু করতে পারি।

ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো ক্যোরী।

ম্যানেজারের বন্ধুটি বলে, মেয়েটি মন্দ ছিল না হে।

ম্যানেজার চটে গিয়েছেন শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে বলে, বলেন, হ্যাঁ তা মন্দ কি। তবে ওই কোরাস্ গার্ল, পার্ট ফার্ট ওর দ্বারা হবে না।

আরো দুএকটা থিয়েটারে ঘুরলো ক্যোরী। তারপর চারটে বাজতে ক্যোরী

পারিশ্রান্ত হয়ে বাসার পথ ধরলো। ...া ওয়েস্ট সাইড পোষ্ট অফিসটা একবার দেখেই যাই।

শনিবারে লিখেছে হার্স্টউড্। চিঠিটা পড়ে ক্যেরী। হার্স্টউডের ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে আছে প্রতিটি ছত্রে। হার্স্টউডের প্রতি মমতা হয় ক্যেরীর। সে যে ভালবাসে ক্যেরীকে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু বিবাহিত হয়ে কেন সে এমন কাজ করলো! এত ব্যাকুলতা! একটা চিঠি দেওয়া উচিত ওকে। জানিয়ে দেবে ক্যেরী ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তার। সব কিছু জেনে গেছে সে।

বাড়ী ফিরে সে চিঠিটা লিখতে বসে দেখলো, বেশ কষ্টকর কাজটা।

"কেন আপনার সঙ্গে দেখা করেনি, তার বোধ হয় কৈফিয়ৎ দেবার আর প্রয়োজন নেই।"—এক জায়গায় সে লিখলো। তারপরে আবেগের মাথায় লিখে ফেললো—

"কেন আপনি এমন করে ঠকালেন আমাকে? এর পরে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো আশা করেন আপনি? আমি হলে করতাম না। কী করে আপনি একাজ করতে পারলেন?

"আমাকে কতখানি দুঃখ দিয়েছেন সে আপনি বুঝবেন না। আশা করি আমার প্রতি আপনার মোহ কেটে যাবে। আমাদের আর কোনদিন দেখা না হওয়াই ভালো। বিদায়!"

ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরগুলিতে চেষ্টা করলো ক্যেরী। সবার মুখেই এক কথা, আগে কোথাও কাজ করেছেন? তাছাড়া ভালো বিক্রীর সময় নয় এটা। ক্যেরী ব্যর্থ আশায় ঘোরে।

বড় একা ক্যেরী।

ইতিমধ্যে ড্রুয়ে কিন্তু এসেছিল। ভেবেছিল বলবে বাকী জিনিসগুলো নিতে এসেছে। তারপর যাবার আগে একটা মিটমাট কী আর করা যাবে না?

ক্যেরীর সঙ্গে কিন্তু দেখা হলো না। ক্যেরীর পদশব্দের আশায় বহুক্ষণ

বসে থাকে ড্রুয়ে। শেষে অধীর হয়ে উঠে দাঁড়ায়। নাঃ কাল আবার আসবে সে। ক্যেরীকে সত্যিই আর পাবে না সে। ভাবতে কষ্ট হয় ওর।

দেয়ালে টাঙানো ক্যেরীর একটা ছবি। ওর প্রথম দেওয়া জ্যাকেটটা গায়ে রয়েছে। হাসিখুশী উজ্জ্বল ক্যেরী। অনেকদিন এমনি দেখে নি সে ক্যেরীকে। ড্রুয়ের মত লোকও একটা অদ্ভুত বেদনা অনুভব করে। যেন সে ক্যেরীকেই বলছে, ছবিটার দিকে তাকিয়ে বেদনার্ত্ত স্বরে ড্রুয়ে বলে—ক্যেরী, আমার ওপর অবিচার করেছ তুমি।

আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে ড্রুয়ে। এদিকে ওদিকে ক্যেরীর স্মৃতি বিগত দিনগুলোর ছায়া জড়ানো।

শেষ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পাদুটোকে ঠেলে ঠেলে ড্রুয়ে বেরিয়ে যায়।

কুড়ি

ক্যেরীর চিঠিটা পেয়ে হার্স্টউড্ আশ্বস্ত হলেন। তিরস্কার। কিন্তু তাই কি সব?

হার্স্টউড্ মনে মনে ভাবেন, ক্যেরী যদি তাঁকে ভাল না বাসতো চিঠিটা লিখতোই না। একমুহূর্ত্তের জন্য ম্যাক্‌গ্রেগর কোম্পানীর নোটিশটা ভুলে যান হার্স্টউড্। যা হয় করুক জুলিয়া। তিনি যদি ক্যেরীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারতেন! ড্রুয়ে যদি না থাকতো!

ম্যাক্‌গ্রেগরের নোটিশটা ঘুরে ফিরে মনে পড়ে আবার। আজকের দিনটাও চলে গেল কিছুই করা হলো না।

পামার হাউসে ঢুকতে গিয়ে হার্স্টউডের মনে হলো ড্রুয়ে যেন উঠে যাচ্ছে ওপর তলায়। খোঁজ নিয়ে দেখলেন হ্যাঁ, ড্রুয়ে এখানেই আছে।

—একা আছেন?

ক্লার্কটা বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

হার্স্টউডের বুকটা তোলপাড় করে, তবে? তবে? ক্যেরী যদি একা

থাকে যা ডুয়ের কাছ থেকে অন্য কোথাও চলে গিয়ে থাকে। এখুনি এখুনি একবার দেখা করা দরকার তো।'

ওগডেন প্লেসে যেতে ঝিটা বললো, না মিঃ ডুয়ে তো নেই। তিনি বাইরে গেছেন। ক্যেরী মিসেস্ হেলকে এই কথাই বলছিলো।

—মিসেস্ আছেন?

—না, উনি থিয়েটারে গেছেন।

হার্স্টউড্ একটা ধাক্কা খেলো—কোন্ থিয়েটারে বলতে পারো?

ঝিটা জানতো না কিছুই। কিন্তু হার্স্টউডকে পছন্দ করতো না সে। একটু ঘোরানো যাক্ না। বললো হুলিতে গেছেন।

হার্স্টউড্ একবার ভাবলেন যাই একবার দেখে আসি। পরক্ষণে ভেবে দেখলেন নিশ্চয়ই অন্য কারো সঙ্গে গেছে। কাল সকালে আসাই ভালো। কিন্তু কাল আবার কেস্টা!

অফিসেই ফিরে এলেন তিনি। চিন্তা, শুধু চিন্তা।

গোটা দশেকের সময় এলো ফ্রাঙ্ক টেন্টার। ফুর্তিবাজ হৈহৈ করা লোক, হার্স্টউড্ খুসী হন বন্ধুকে পেয়ে।

ফ্রাঙ্ক বলে, কী হে গোমড়া মুখ করে বসে আছ যে।

হার্স্টউড্ বলে, আরে এসো এসো।

ফ্রাঙ্ক বলে, কী রেসে হেরেছ নাকি?

—না শরীরটা বেশ ভাল নেই আজ।

—আরে দুচার পেগ চালিয়ে দাও না, দাদা। এ আবার শেখাতে হবে তোমাকে, নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

হার্স্টউড্ হাসেন।

আরো কয়জন জুটে গেলো বন্ধুবান্ধব। আড্ডাটা জমলো মন্দ না।

বারোটার সময় সবাই একে একে উঠে পড়লো। হিসেব মেলাতে গেলেন এবার হার্স্টউড্। ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবার পর যা টাকা পয়সা থাকে ক্যাশিয়ার সেফে বন্ধ করে রেখে যায়। হার্স্টউডকে দেখতে হয় সব ঠিক আছে কিনা।

ড্রয়ার, সেফের চাবি তালা টেনে টেনে দেখেন হার্স্টউড্ সব ঠিকমত বন্ধ করা হয়েছে কিনা।

নিজের ডেস্ক ড্রয়ার বন্ধ করে হার্স্টউড্ সেফ্‌টার হাতল ধরে জোরে টান দেন রোজকার মতো। কী আশ্চর্য্য, খোলা। টাকা-পয়সাগুলো এই অবস্থায় রয়ে গেছে। দরজাটা বন্ধ করে আর একবার ড্রয়ার ট্রেগুলো দেখা দরকার তো।

কী যে করে ওরা। কাল মেহিউকে বলতে হবে তো?

মেহিউ এদিকে খুবই সতর্ক। কিন্তু আজ অন্যমনস্ক ছিলো সে। নিজের একটা ব্যবসার কথা নিয়ে ব্যস্ত।

ড্রয়ারগুলো টেনে টেনে দেখতে লাগলেন হার্স্টউড্। কেন যে করছেন নিজেও জানেন না।

মোটা একটা তাড়া, হাজার টাকার তাকে তাকে সাজানো। কতো হবে কে জানে!

পরের ড্রয়ারটা টানেন। সেখানে খুচরো টাকা, সন্ধ্যেবেলার বিক্রী।

হার্স্টউড্ মনে মনে ভাবেন, ফিজেরাল্ড এমনি করে টাকা রেখে গেছেন এখানে, কই জানতাম না তো। নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন আজ।

পরের ড্রয়ারটা খুলে আবার দেখেন। কানে কানে কে বলে, গুণে দেখো না, কত হবে। হাতে নিতে ছড়িয়ে পড়ে তাড়াগুলো পাঁচ দশ একশো ডলারের তাড়া, হাজারে হাজারে বাঁধা। ক'টা? দশটাই মনে হলো।

মন বলে, সেফ্‌টা বন্ধ করে দিলেই তো হয়, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? জবাব আসে, কানে কানে কে বলে, একসঙ্গে দশ হাজার ডলার খুচরো টাকা দেখেছ তুমি কখনো?

না তো। ধীরে ধীরে টাকা জমিয়েছেন তিনি, স্ত্রীর নামে সম্পত্তি কিনেছেন। হয়তো মোট তাঁর চল্লিশ হাজার টাকারই সম্পত্তি আছে, কিন্তু সে তো স্ত্রীর নামে। মালিক জুলিয়া।

এইসব ভাবতে নিজেরই আশ্চর্য্য লাগে। কেন ভাবছেন তিনি এসব? ড্রয়ারটা ঠেলে দেন। হাতলটা ঘোরালেই বন্ধ হয়ে যাবে।

একটু অপেক্ষা করেন হার্স্টউড্ তারপর জানালায় গিয়ে পর্দাগুলো টেনে

দেন। বন্ধ দরজাটা টান দেন হার্স্টউড, সে তো নিজেই বন্ধ করেছেন একটু আগে।

চুপি চুপি কী করছেন তিনি? এত সাবধান কিসের? কাউণ্টারের কাছে এসে ভর দিয়ে দাঁড়ান হার্স্টউড, ভাবছেন।

নিজের ছোট অফিসটার দরজাটা খোলেন আবার। ডেস্কটা খুলে সামনে বসে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভাবেন হার্স্টউড্।

সেই স্বরটা বলে, সেফ্‌টা এখনো খোলা আছে।

অদ্ভুত এলোমেলো ঝড়ের মত চিন্তা। এই টাকাটা আর ক্যেরী। নিজের জীবনকে আবার নতুন করে শুরু করতে পারেন হার্স্টউড্।

মন বলে, তারপর?

হার্স্টউড্ মেঝের দিকে তাকিয়ে চুলগুলো নিয়ে, খেলা করেন, না টানেন।

এত বোকা তিনি নন। কিন্তু অবস্থাটা তাঁর অদ্ভুত। দ্রাক্ষা-শোণিত তাঁর ধমণীতে ধমণীতে স্নায়ুতন্ত্রীতে ছুটোছুটি করছে। রঙীন স্বপ্ন দেখছেন তিনি। তাঁর কাম্য সব কিছুই পেতে পারেন এই দিয়ে। স্ত্রীর কাছ থেকে মুক্তি। ক্যেরী, নতুন জীবন।

সেফ্‌টার কাছে গিয়ে হাতলটায় একবার হাত দেন হার্স্টউড্। তারপর এক ঝট্‌কায় ড্রয়ারটা টেনে বার করে ফেলেন।

টাকাটা বের করে এনে ফেলে রেখে যাওয়ার মত বোকামি আর কিছু হতে পারে? ক্যেরীর সঙ্গে বছরের পর বছর তিনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবেন এই দিয়ে।

একী, ঘাড়ে হাত দিলো কে? সভয়ে ফিরে তাকান হার্স্টউড্। না কেউ না। মনের ভুল। আশঙ্কা, আতঙ্ক। টাকাগুলো গুছিয়ে রাখেন হার্স্টউড্ ড্রয়ারে, তারপর সেফের মধ্যে ঠেলে দেন। ডালাটা অর্দ্ধেক বন্ধ।

যারা কখনো লোভ আর কর্ত্তব্য, বিবেক আর স্বার্থবুদ্ধির দ্বন্দ্বে পড়েনি, তারা হার্স্টউডকে বুঝতে পারবে না।

টাকাটা রেখে দেওয়ার পর হার্স্টউড্ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন।

সাহস আসে আবার। কই, কেউ তো দেখে নি। একা তিনি। কী তাঁর মনের ইচ্ছা আর কি কেউ বলতে পারে? যা কিছু করবেন কোন সাক্ষ্য নেই, কেউ জানবে না।

দ্রাক্ষা শোনিতের নৃত্য এখনো শেষ হয়নি। হাত কাঁপে, তবু উত্তেজনা, রঙীন স্বপ্ন। সময় বয়ে যাচ্ছে, হার্স্টউডের খেয়াল নেই।

চোখের ওপর ভাসছে টাকার তোড়াগুলো। মন বলে, কী না হতে পারে এগুলো দিয়ে।

নিজের ঘরে ফিরে যান হার্স্টউড্ তারপর দরজাটার কাছে। আবার আসেন সেফ্টার কাছে। হাতলটা টানতে টাকাগুলো বেরিয়ে আসে। এই তো, এই তো টাকাগুলো। দেখতে দোষ কী? তাড়াগুলো হাতে নেন হার্স্টউড্। নরম কর্‌করে তাজা নোট। কতটুকুই বা ভারী।

পকেটে ফেলতে গিয়ে দেখেন ঢুকবে না সব। বাঃ হাতব্যাগটা তো রয়েছে। চমৎকার ধরে যাবে সবগুলো। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। নিজের অফিসের শেল্‌ফ্ থেকে হাতব্যাগটা নামান হার্স্টউড্। ডেস্কে রেখে দেন। বড় ঘরটায় বসে টাকাগুলো ভরতে চান না তিনি, কী জানি কেন।

প্রথমে টাকার তোড়াগুলো আনেন। খুচরোগুলোই বা ফেলে রেখে কী হবে? টাকাগুলো নিয়ে খালি ড্রয়ার দুটো ভেতরে ঠেলে দেন হার্স্টউড্। ডালাটা বন্ধ করতে গিয়ে ভাবেন আরো একবার।

নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এখনো পৌঁছাতে পারেন না হার্স্টউড্। আরো একটু চিন্তা করেন। কাজটা ঠিক হবে, না হবে না। ক্যেরীর জন্য ব্যাকুলতা তাঁর, বলে এই ঠিক, এই ঠিক। তবু মনটা দোটানায়। হার্স্টউড্ ভাবেন। কী ক্ষতি হতে পারে তাঁর জীবনে, সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে, একথা হার্স্টউডের মনে ওঠে না।

টাকাগুলো সব ব্যাগে ভরে ফেলার পর, হঠাৎ অদ্ভুত একটা বিদ্রোহ জাগে মনে। না না, একাজ তিনি করতে পারেন না। কতবড় কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে। পুলিশ লাগবে ওঁর পিছনে। পালাতে হবে তাঁকে। কোথায় পালাবেন? আইনের হাত এড়িয়ে কোথায় পালাবেন তিনি!

টাকাগুলো আবার তুলে রাখেন ড্রয়ারে। উত্তেজনায় ভুলে যান কোন্ ড্রয়ারে কোন্ টাকাগুলো ছিল। ডালাটা বন্ধ করতে গিয়ে মনে হয় উল্টোপাল্টা করে রেখেছেন ড্রয়ার দুটোকে। আবার ঠিক করে রাখেন হার্স্টউড্। নাঃ আতঙ্কটা চলে গেছে এবার। এত ভয় কিসের। টাকাটা হাতে রয়েছে তাঁর। চাবিটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

কে? কে করলো? তিনি নিজে করেছেন? না, না। কে জানে?

জোরে টান দেন হার্স্টউড্ হাতলটা ধরে। বন্ধ হয়ে গেছে, আর খুলবে না।

হার্স্টউডের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। একী হলো। কাঁপতে থাকেন তিনি।

একবার চেয়ে দেখেন চারিদিক। তারপর মনস্থির করে ফেলেন।

টাকাটা যদি ওপরে রেখে দিই, সবাই জানবে আমি নিয়েছিলাম। আমিই সব শেষে বন্ধ করি, সবাই জানে।......আরো অনেক কিছু ঘটতে পারে।

হার্স্টউড্ আর দ্বিধা করেন না। এই ঝঞ্ঝাট থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভালো। তাড়াতাড়ি আর দেরী নয়।

কোট আর টুপিটা নিয়ে আসেন হার্স্টউড্ নিজের অফিস থেকে। হাত-ব্যাগটা তুলে নেন।

আগের মতো স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করেন হার্স্টউড্। না স্বাভাবিক নন তিনি। হাঁপাছেন, অনুশোচনা হচ্ছে। কাজটা ভালো হলো না।

একটা আলো জ্বালিয়ে রেখে আরগুলো নিভিয়ে দেন তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন। একটা পাহারাদারের সঙ্গে দেখা হলো। পাহারাদারটা সেলাম জানায়, চেনে সে হার্স্টউড্‌কে। দরজাগুলোয় তালা ঠিক আছে কিনা দেখ্‌ছে। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে শহর থেকে।

ট্রেনগুলো কখন ছাড়ে? ঘড়িটা বার করে দেখেন হার্স্টউড্। প্রায় দেড়টা।

একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়েন হার্স্টউড্। মিচিগ্যান সেণ্ট্রাল ডিপোয় ফোন করেন, ডেট্রয়েটে যাবার ট্রেন ক'টায়?...আজ রাত্রে আর নেই?

উত্তর আসে—স্লিপিংকার নেই।...হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে একটা মেল ট্রেন। তিনটেয় ছাড়বে।

—ক'টায় পৌঁছাবে ডেট্রয়েট্?

হার্স্টউড্ জানতে চান। ডেট্রয়েট্ নদী পার হয়ে কানাডা পৌঁছাতে পারলে তারপর ধীরে সুস্থে মন্ট্রীল যাওয়া যেতে পারবে।

দুপুরেই পৌঁছে যাবে শুনে আশ্বস্ত হলেন হার্স্টউড্।

ন'টার আগে মেহিউ সেফ্‌টা খুলবে না। তারপর খোঁজ করতে করতে দুপুর। দুপুরের আগে, কিছুই করতে পারবে না ওরা।

এবারে ক্যেরী। এখুনি, এখুনি ওকে তুলে নিতে হবে! কী করে, কেমন করে? নিতেই হবে যেমন করে হোক।

একটা গাড়ীতে উঠে বসেন হার্স্টউড্—জল্‌দি, জল্‌দি চলো ওগ্‌ডেন প্লেস।

পৌঁছে জোরে জোরে বেল্ বাজান হার্স্টউড্। ঘুমভাঙা চোখে নেমে আসে ঝিটা।

—মিসেস্ ড্রুয়ে আছেন?

অবাক হয়ে তাকায় সে! হ্যাঁ!

—শীগ্রি এখুনি ড্রেস করে নিয়ে আসতে বলো ওঁকে। ওঁর স্বামী হাসপাতালে, ওঁকে দেখতে চান, জল্‌দি।

ঝিটা বিশ্বাস করে, হার্স্টউডের উত্তেজনা দেখে।

আলোটা জ্বালিয়ে ক্যেরী বলে, য়্যাঁ?

—মিস্টার ড্রুয়ের অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে, হাসপাতালে আছেন। আপনাকে দেখতে চান। নিচে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি ড্রেস করে নিয়ে ক্যেরী নিচে আসে।

—ড্রুয়ের অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। তোমাকে দেখতে চায়, শীগ্রি এসো। —হার্স্টউড্ কোনমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন।

ক্যেরী স্তম্ভিত হয়ে গেছে। বিশ্বাস করে সে। ওকে গাড়ীতে উঠিয়ে হার্স্টউড্ লাফ দিয়ে চড়ে বসেন।

উঠে দাঁড়িয়ে হার্স্টউড্ নীচুগলায় গাড়োয়ানটাকে বলেন, মিচিগ্যান সেণ্ট্রাল ডিপো। জল্‌দি, জল্‌দি চলো।

ক্যেরী শুনতে পায় না, কোথায় যেতে বললেন হার্স্টউড্।

একুশ

গাড়ীটা যখন চলতে শুরু করলো তখনো ক্যোরীর ঘুমের ঘোরটা সম্পূর্ণ কাটেনি। একটু পরে সে জিজ্ঞাসা করলো, কী হয়েছে ওর? গুরুতর নয়তো কিছু?

হার্স্ট'উড্ গম্ভীর গলায় বলে, না তেমন গুরুতর কিছু নয়। নিজের চিন্তায় মগ্ন সে। ক্যোরীকে পাওয়া গেছে, এখন কেমন করে আইনের হাত এড়িয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাওয়া যায়, তাই ভাবছে সে।

হার্স্ট'উডের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার দরকার আছে তার সে কথা ক্যোরী ভোলেনি। কিন্তু এসব উত্তেজনার মুহূর্তে সেটা খেয়াল হয় না তার। সে জিজ্ঞাসা করে,

—কোথায় আছে ও?

—সাউথ সাইডের কাছে। ট্রেন ধরতে হবে আমাদের। সেইটেই সুবিধে।

খানিক পরে আবার ক্যোরী জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে হলো?

মিথ্যার জাল বুনতে হার্স্ট'উডের ভাল লাগছিল না। কিন্তু বিপদটা কেটে না গেলে সবকথা বলাও যায় না। সে বলে, ঠিক জানিনা আমি। আমাকে ওরা ফোন করে বললো তোমাকে নিয়ে যেতে। বলেছিল ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে তোমাকে যেন অবশ্য নিয়ে আসি।

ক্যোরী বিশ্বাস করে, হার্স্ট'উডের স্বর গম্ভীর। ঘড়িটা দেখে হার্স্ট'উড্ তাগাদা দেয় কোচ্ম্যানকে।

স্টেশনে পৌঁছে ওয়েটিং রুমে ক্যোরীকে অপেক্ষা করতে বলে হার্স্ট'উড্ টিকিট দুটো কিনে আনে। আর মাত্র চারমিনিট আছে গাড়ীটা ছাড়তে। ক্যোরীকে এগিয়ে দিয়ে ওকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে টিকিট দেখায় হার্স্ট'উড্ গেট্ম্যানকে।

উঠতে না উঠতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিলো। ক্যোরীর একটু অদ্ভুত লাগে সমস্ত

ব্যাপারটা কিন্তু য়্যাক্সিডেণ্ট হলে আর কী করতে পারে মানুষ। গাড়ীটা ছাড়তে হার্স্টউড্ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। এবার জিজ্ঞাসা করে ক্যেরীকে, কেমন আছ তুমি ?

ক্যেরী বলে, ভালই। এই অবস্থায় কীভাবে কথা বলা উচিত সে ঠিক পায় না। ড্রুয়ের সঙ্গে এমনিভাবে দেখা করতে যেতে তার ভয় ভয় করছিল। হার্স্টউড্ বোঝে, সেটা ক্যেরীর অনুকম্পা জেগেছে ড্রুয়ের জন্য। ক্যেরীর এই মমতাবোধও তো তার কাছে প্রশংসনীয়। হার্স্টউড্ ভয় পায় না। সে শুধু ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা কী করে বোঝাবে সে। ক্যেরী কি বুঝবে ?

মনে মনে ভাবে সে, কেন করলাম আমি একাজ ? মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসলে তার যেন বিশ্বাসই হয় না, এতবড় একটা ঘৃণ্য কাজ, চুরি করেছে সে। আগেও কতবার ভেবেছে সে, শিউরে উঠেছে একথা মনে হলে। সেই জঘন্য কাজটা সে-ই করে ফেলেছে। অতীতের দিকে মুখ ফেরায় হার্স্টউড্। ভবিষ্যতের কথা কত অনিশ্চিত। তবু ক্যানাডায় পৌছলে হয়তো, হয়তো একটা পথ খুঁজে নিতে পারবে সে বাঁচার। এছাড়া আর কীই বা করতে পারতো সে এই অবস্থায় !

ইয়ার্ড ছাড়িয়ে ট্রেনটা গতি বাড়িয়ে দেয়, ক্যেরী শুধায়, অনেকদূরে নাকি ?

হার্স্টউড্ বলে, না তেমন দূর নয়। ক্যেরীর সরলতায় ওর হাসি আসে।

আধঘণ্টা পরে শহরের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে গেছে ওরা। ক্যেরী বলে, একী, অনেক দূর যে, চিকাগোর মধ্যে নয়।

সে বলে, না।

হার্স্টউডের গলার স্বরে ক্যেরী চমকে ওঠে। ভ্রূ দুটো আপনা থেকেই কুঁচকে আসে। বলে, চার্লিকে দেখতে যাচ্ছি তো আমরা ?

হার্স্টউড্ বোঝে আর চলবে না এভাবে। উত্তর দিতেই হবে তাকে, এখনি দিলেই বা ক্ষতি কী ? হার্স্টউড্ ঘাড় নাড়ে না।

ক্যেরী স্তম্ভিত হয়ে যায়, য়্যাঁ— ? তবে ?

হার্স্টউড্ চুপ করে থাকে।

আতঙ্কে ক্যেরীর গলা শুকিয়ে আসে, তবে? তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

—উত্তেজিত হয়ো না ক্যেরী। আমার কথা শোনো। আমার সঙ্গে অন্য এক শহরে যাচ্ছ তুমি।

ক্যেরী কেঁদে ফেলে এবার।—না, না, না। আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে, তোমার সঙ্গে যাবো না আমি। যাবো না।

হার্স্টউডের ঔদ্ধত্যে, বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। এধরণের মতলব থাকতে পারে ওর, একথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি কোনদিন। কেমন করে পালাবে সে। আর গাড়ীটাকে যদি থামানো যেত কোন রকমে সে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে যেতো। অস্থির হয়ে পড়ে, কিছু একটা করতে হবে তাকে। উঠে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় সে। হার্স্টউড্ ওর কাঁধের ওপর হাত রাখে।

—শোনো ক্যেরী, আমার কথা শোনো। এখানে তো নামতে পারবে না তুমি। কেন এমন করছ, শোনো আমার কথা শোনো, তারপরে যা হয় কোরো।

ক্যেরী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায় হার্স্টউডকে। হার্স্টউড্ ওকে টেনে আনে। এদের এই ঝগড়া আর কেউ লক্ষ্য করে না। এত রাত্রের গাড়ীতে লোকই নেই প্রায়। যারা ছিল তারা ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

ক্যেরী বলে, না, না, না। কোন কথা শুনতে চাই না আমি। ছেড়ে দিন আমাকে। কেন আপনি এমন করলেন? কেন, কেন, কেন?—

ওর চোখ দিয়ে বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

হার্স্টউড্ জানে, ক্যেরীকে বোঝাতেই হবে, ওকে ঠাণ্ডা করতেই হবে। অনেক কিছু করতে পারে ও। তার নিজের ভবিষ্যতের কথা এই মুহূর্তে ভুলে যায় হার্স্টউড্।

—শোনো, শোনো ক্যেরী। আমার কথা শোনো। এমন করো না। আমি তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না। আমি বলছি তুমি যা চাও তাই হবে। এমন কোরো না তুমি।

ক্যেরী ফুলে ফুলে কাঁদে।

হার্স্টউড্ বলে, এই দেখো আবার কাঁদছ তুমি। শোনো আমার কথা শোনো। কেন করলাম একাজ শোনো তুমি। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না ক্যেরী। ক্ষমা করো আমাকে, আমি পারিনি। শুনবে না আমার কথা?

ক্যেরী ফুলে ফুলে কাঁদছে, কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না।

হার্স্টউড্ বলে, শুনবে না তুমি আমার কথা? কান্নার মাঝেও জ্বলে ওঠে এবার—না, না, না। এখান থেকে নামিয়ে দিন আমাকে। নাহলে কণ্ডাক্টারকে ডাকবো আমি, বলে দিচ্ছি। আপনার সঙ্গে কেন যাবো আমি—? কান্নায় ডুবে যায় ওর পরের কথাগুলো।

হার্স্টউড্ ঘাবড়ে যায়। এখুনি মিটিয়ে ফেলতে হবে। একটু পরেই কণ্ডাক্টার আসবে টিকিট চেক করতে। তার আগেই থামাতে হবে ক্যেরীকে।

—দেখো, পরের স্টেশন না এলে তো আর নামা যাবে না। বেশ তো তুমি না চাও, পরের স্টেশনে নেমে যেও। শুধু একবার আমার কথাটা শোনো, তারপর যা ইচ্ছে কোরো তোমার। একবার বলতে দাও আমাকে।

ক্যেরী বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শোনে কি শোনে না বোঝা যায় না। বিস্তীর্ণ মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে ট্রেনটা চলেছে দ্রুততালে। মাঝে মাঝে হুইসিলের করুণ আর্তনাদ বাজে গানের মতো।

কণ্ডাক্টার এসে টিকিট দেখে। ক্যেরী মুখ ফিরিয়েই আছে। দেখলো না বোধ হয়। কণ্ডাক্টার চলে যেতে হার্স্টউড্ একটু আশ্বস্ত হয়।

—তোমাকে ঠকিয়ে এনেছি ক্যেরী, রাগবার কথাই তোমার। কিন্তু কেন করেছি তাতো জানো। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারিনি ক্যেরী। প্রথমবার তোমাকে দেখে আমি পাগল হয়ে গেছি ক্যেরী।

মিথ্যে কথা বলে নিয়ে আসা, স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ওকে না বলা সব কিছুরই কারণ এই। হার্স্টউড্ ক্যেরীকে ভালবেসেছে প্রাণ দিয়ে, ওকে ছাড়া তার চলবে না। ওদের সম্পর্কের মধ্যে হার্স্টউডের স্ত্রীর কোন মূল্য নেই। কোন বাধা দিতে যাতে না পারে সে তাই তো এই কাজ করতে হয়েছে হার্স্টউডকে।

টাকার কথাটা হার্স্টউড্ ভুলে যায়, অথবা মন থেকে মুছে ফেলে এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে।

ক্যেরী বলে, কোন কথা শুনতে চাই না আপনার। আপনাকে ঘৃণা করি আমি। চলে যান আপনি আমার সামনে থেকে। পরের স্টেশনেই নেমে যাবো আমি। —উত্তেজনায় ক্যেরীর কথাগুলো জড়ানো অস্পষ্ট।

—বেশ, তাই কোরো। তবু আমাকে বলতে দাও। একদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে, তারই অধিকারে আজ আমাকে বলতে দাও। কোন ক্ষতি করতে চাই না আমি তোমার। শুধু এই কথাটাই বলতে চাই ক্যেরী, আমি তোমাকে ভাল না বেসে পারবো না।

ক্যেরীর দিকে আকুল চোখে তাকায় হার্স্টউড্। কোন জবাব পায় না।

—তুমি ভাবছো আমি ঠকিয়েছি তোমাকে। আমি বলছি, না ঠকাইনি তোমাকে। আমি ইচ্ছে করে করিনি। স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। আমরা ঘৃণা করি পরস্পরকে, ওর কোন দাবীই নেই আমার ওপর। ওর সঙ্গে জীবনে আমার কোনদিন দেখাও হবে না। তাই আমি পালিয়ে এসেছি, তাই নিয়ে এসেছি তোমাকে।

ক্যেরী জলন্তচোখে বলে, আপনি যে বলেছিলেন চার্লি হাসপাতালে আছে? মিথ্যে কথা প্রবঞ্চনা নয় এটা? প্রথম থেকে এখন পর্য্যন্ত প্রতিটি বর্ণ আপনার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা। আর এখন এসেছেন আমাকে জোর করে নিয়ে পালাতে?

উত্তেজনায় উঠে গিয়ে ক্যেরী আর একটা সীটে বসে। হার্স্টউড্ বাধা দিতে পারে না, সেও গিয়ে আবার বসে ওর কাছে।

—আমার কাছ থেকে পালিও না ক্যেরী, আমাকে বলতে দাও। আমি বলছি স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। সে কেউ না, কিছু না আমার কাছে। বহুদিন ধরে এমনি চলছে। তা যদি না হতো তোমার কাছে এমনি করে পাগলের মত ব্যাকুল হয়ে আসতাম না। শীঘ্রি ডাইভোর্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের। ওর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না। শুধু তোমাকে চাই আমি, ক্যেরী। তোমাকে পেলে আমি সব ভুলে যাবো।

কথাগুলো কানে যায় ক্যেরীর। কিছু কৌতূহল, কিছু রাগে উত্তেজিত ওর

মন। তবু হার্স্টউডের কথাগুলো আন্তরিক বলেই মনে হয়। মনটা একটু নরম হয় বৈকি। তবু না, সে বিবাহিত। একবার, দুবার ঠকিয়েছে ওকে। না অসহ্য, সাংঘাতিক ভীষণ লোক ও। তবু কী সাহস ওর, কী গভীর আবেগ ওর!

ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে। চিকাগো অনেক পিছনে পড়ে গেছে। অনেক দূর চলে এসেছে সে। একবার ভাবে চীৎকার করে ওঠে সে। কেউ আসুক ওর সাহায্যের জন্যে ছুটে। সে মুক্তি পাক এই অদ্ভুত বিশ্রী অবস্থা থেকে। আবার ভাবে, কোন লাভ নেই তাতে। কে আসবে তাকে সাহায্য করতে? কে আছে তার বন্ধু?

হার্স্টউড্ক্যেরীর মনে করুণা জাগাবার চেষ্টা করে। —কী করতে পারতাম আমি, বলে দাও তুমি।—

ক্যেরী যেন শোনে না।

—যখন দেখলাম বিয়ে না করলে পাবো না তোমাকে, সব ছেড়ে চলে এলাম আমি। অন্য এক শহরে দূরে চলে যাবো কিছুদিনের জন্যে মন্ট্রীলে থাকবো আমরা, তারপর তুমি যেখানে চাও সেখানেই চলে যাবো। যদি বলো, নিউ ইয়র্কে থাকবো আমরা।

—আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। নেমে যেতে চাই আমি ট্রেন থেকে। কোথায় যাচ্ছে এটা?

হার্স্টউড্ বলে, ডেট্রয়েট্।

ক্যেরী চীৎকার করে ওঠে ওঃ। এতদূর? এতদূর? কেমন করে ফিরবে সে এখন! কোথায় যাবে সে ফিরে?

—তুমি আসবে না আমার সঙ্গে? বেশ, শুধু সঙ্গে চলো তুমি। বিরক্ত করবো না আমি তোমাকে, কথা দিচ্ছি, শুধু মন্ট্রীল আর নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসবে চলো। তারপর ইচ্ছে হয় ফিরে এসো তুমি। এখুনি ফিরে যাওয়ার চেয়ে, সেটাই তো ভালো।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এত বাধা বিপত্তি বিপদের মধ্যে ফিরে গিয়েই বা লাভ কী এখন। ইচ্ছে করলে দূর দূর দেশ, বড় শহরগুলো সে দেখে আসতে পারে। ক্যেরী ভাবে। কোন জবাব দেয় না।

হার্স্টউড্ বোঝে ক্যেরী নরম হয়ে আসছে। আশা জাগে। সে বলে, একবার ভেবে দেখো, সব কিছু ছেড়ে এসেছি আমি। আমার পক্ষে আর চিকাগোয় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। এখন থেকে আমাকে একা থাকতে হবে, দূরে, অনেক দূরে। তুমি যদি না আসো, সম্পূর্ণ একা নিঃসঙ্গ আমি। তুমি আসবে না ক্যেরী ?

—আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না আমি। ক্যেরী জোর দিয়ে বলে।

ট্রেনটার গতি মন্থর হয়ে আসছে। এইবার এই মুহূর্তে ঠিক করতে হবে তাকে। চরম মুহূর্ত এটা। ক্যেরী চঞ্চল অস্থির হয়ে ওঠে।

হার্স্টউড্ বলে, চলে যেও না ক্যেরী। যদি কোনদিন আমাকে ভালবেসে থাক, এসো আমরা নতুন করে জীবন শুরু করি। তুমি যা বলবে তাই হবে। আমি বিয়ে করবো তোমাকে।—যদি চাও ফিরেই যেও তুমি। এখন চলো আমার সঙ্গে। ভেবে দেখো একটু। তোমাকে ভাল না বাসলে এমন করে সব ছেড়ে চলে আসতাম আমি ? কেন বুঝছো না ক্যেরী ? ভগবান্ জানেন ক্যেরী, তোমাকে ছেড়ে বাঁচতে পারবো না আমি। বাঁচতে চাইও না।

হার্স্টউডের আকুলতা ক্যেরীর মনকে স্পর্শ করে। মমতা জাগে ওর। এই বিপদের দিনে হার্স্টউড্ চায় ওকে।

ওর হাত দু'টো চেপে ধরে হার্স্টউড্ ব্যাকুল অনুনয়ে।

ট্রেনটা প্রায় থেমে এসেছে। ক্যেরীর অবস্থা অদ্ভুত। মনস্থির করতে পারছে না। জানালায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। ক্যেরী হার্স্টউডের কথা ভাবছে।

একটার পর একটা মুহূর্ত কেটে যায়। ক্যেরী ঠিক করতে পারে না। পা দু'টো আটকে গেছে তার।

বলে, আমি যখন চাইবো ফিরে আসতে দেবেন আমাকে ? যেন সেই সত্যি সত্যি জিতে গেছে এই দোটানার যুদ্ধে।

হার্স্টউড্ বলে, নিশ্চয়ই, তুমি তো জানো ক্যেরী, তুমি যা চাইবে তাই হবে।

ক্যেরী যেন মরা করেছে শুধু এই মুহূর্তের জন্যে। তারপর সব তো তার হাতেই।
ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করেছে। হার্স্টউড্ এবার অন্য কথায় আসে।
—খুব ক্লান্ত লাগছে তোমার, না?
ক্যেরী বলে, না।
—শোবে? ঠিক করে দেবো?
ক্যেরী ঘাড় নাড়লো—না দরকার নেই। হার্স্টউড্ জোর করেই কোটটা পেতে দেয়। —দেখো একটু আরাম লাগবে।
হার্স্টউড্ পাশে বসে বলে, ভীষণ বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।
ক্যেরী বলে, হ্যাঁ। উত্তেজনাটা কমে আসছে এবার। বৃষ্টির শব্দে যেন ঘুম পাড়ানি গান আছে। ট্রেনটা ছুটে চলেছে নতুন আর একটা দুনিয়ায়।

ক্যেরীকে ঠাণ্ডা করে এবার হার্স্টউড নিজের কথা ভাবে। কী করলো সে, কেন করলো? এই ক'টা টাকায় কী হবে ওর? সব কিছু ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে এই ক'টা টাকা নিয়ে এসে। চুরি! টাকাটা কী ফেরৎ দেওয়া যায় না। যদি সে গিয়ে বুঝিয়ে বলে ময়কে হয়তো ক্ষমা করবে ওরা, আবার ফিরিয়ে নেবে।
দুপুরবেলায় ডেট্রয়েট এসে গেলো। ট্রেন থেকে নামতে বুক কাঁপে হার্স্টউডের। এতক্ষণে পুলিশ জেনে গেছে—খবর ছড়িয়ে গেছে শহরে শহরে। হার্স্টউডের মুখ ছাইয়ের মত সাদা, হয়তো ডিটেক্টিভরা তার জন্যে অপেক্ষা করছে স্টেশনে।
ক্যেরী লক্ষ্য করে তার উত্তেজনা, কিন্তু কেন তা সে কেমন করে জানবে। হয়তো তাকে নিয়ে পালিয়ে আসার জন্যই।
আঃ, ট্রেনটা যদি সোজা মন্ট্রীলে যেতো, অনেক সময় বাঁচানো যেতো তাহলে। হার্স্টউডের খেয়াল হয় মস্তবড় ভুল করেছে খোঁজ না নিয়ে। কণ্ডাক্টারটাকে জিজ্ঞাসা করতে সে বললো, পাশের বগিখানা যাবে। আরো খবর নিতে হবে এন্‌কোয়ারীতে।
স্টেশনে নেমে হার্স্টউড্ এদিক ওদিক তাকায়। যেন ক্যেরী আসছে কিনা, কোথাও হারিয়ে গেল কিনা দেখছে।

মনট্রীলের ট্রেনটা কুড়ি মিনিট পরেই ছাড়বে। টিকিট কিনে হার্স্টউড্ বলে, এখুনি ট্রেন পাওয়া যাবে।

ক্যেরী পরিশ্রান্ত। বিষণ্ণ-গম্ভীর-স্বরে সে বলে, ভালো লাগছে না আমার।

হার্স্টউড্ প্রবোধ দেয়, মনট্রীলে পৌঁছুলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ক্যেরী বলে, আমার কাছে একটা জামাকাপড়, রুমাল পর্য্যন্ত নেই।

হার্স্টউড্ বলে, এই তো, একটু কষ্ট করো লক্ষীটি। ওখানে পৌঁছে গেলে সব ব্যবস্থা করে ফেলবো।

ট্রেনটা ছাড়লো। নদীটা পার হতে হলো ফেরী বোটে। তারপর আবার ট্রেনে উঠে বসলো ওরা। হার্স্টউড্ এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বলে, আর বেশীক্ষণ লাগবে না। ঠিক ভোরেই পৌঁছে যাবো আমরা।

ক্যেরী কোন উত্তর দিলো না।

হার্স্টউড্ বলে, ডাইনিং কার আছে কিনা দেখতে হবে। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে আমার।

বাইশ

নতুন দৃশ্য, নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ। এসবের একটা মোহ আছে। সব কিছু দুঃখ কষ্ট বেদনা, চিন্তাভার ভুলিয়ে দেয়। 'আমি চলে যাচ্ছি'—এই ছোট্ট কথাটুকুর মধ্যে কতকিছু আবেগ আর অনুভূতি লুকোনো আছে।

ক্যেরীও ভুলে যায়, হার্স্টউড্ তাকে মিথ্যে কথা বলে ভুলিয়ে নিয়ে চলেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নতুন দেশ নতুন দৃশ্যে তন্ময় হয়ে যায় সে।

মাঝে মাঝে ভাবে ক্যেরী, এই তো তার জীবনের শুরু। কে হার্স্টউড্? ও তো উপলক্ষ্য মাত্র। না, পরাজিত হয়নি সে জীবন-যুদ্ধে। বড় সহরে কত আশা কত স্বপ্ন। এই পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি আছে তার সেখানেই। খুঁজে নেবে সে নিজের পথ, সুখী হবে সে।

মনট্রীলে আগেও এসেছে হার্স্টউড্। চেনা হোটেলটায় গিয়ে ওঠে সে। রেজিষ্ট্রি খাতায় লেখে, মিস্টার ও মিসেস্ মার্ডক।

ঘরটা ভালোই, ক্যেরী খুশী হয়।

হার্স্টউড্ প্রসাধনের টুকিটাকির জন্য বেয়ারাকে ডাকে। জিনিষপত্র কেনার জন্য বেরিয়ে যাবার আগে হাতটা এগিয়ে দেয় ক্যেরীর দিকে। ক্যেরী হাত বাড়ায় না।

হার্স্টউড্ বলে, তুমি কি আমার ওপর ভীষণ রাগ করেছ?

উদাসীন ভাবে ক্যেরী বলে, না।

আমার জন্য একটুও মমতা হয় না তোমার?

ক্যেরী উত্তর দেয় না।

আমাকে একটুও ভালোবাসো না তুমি? আগে তো বাসতে।

হার্স্টউড্ ওর হাতটা ধরে অনুনয়ের ভঙ্গীতে। টেনে নেবার চেষ্টা করে ক্যেরী।

বলে, কেন আমাকে এমন করে ঠকালেন আপনি?

হার্স্টউড্ বলে, তাছাড়া উপায় ছিল না যে ক্যেরী। তোমাকে যে চাই-ই আমার!

ক্যেরী স্পষ্ট করে বলে, কোন অধিকার নেই আপনার আমাকে চাওয়ার।

হার্স্টউড্ ব্যথিত হয়ে বলে, আচ্ছা ক্যেরী, এখন তো সে সব কথা তুলে লাভ নেই। এখন, এখন কি আমার জন্যে একটু মমতাও হয় না তোমার?

ক্যেরী ঘাড় নাড়ে, না।

—আচ্ছা নতুন করে তো শুরু করা যায়। আজ থেকে তুমি আমার স্ত্রী—

ক্যেরী সরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায়। হাতটা ধরে রেখেছে হার্স্টউড্। হার্স্টউড্ টেনে নেয় ওকে আরো কাছে। ক্যেরী ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে নিজেকে। হার্স্টউডের রক্তে জোয়ার আসে।

ক্যেরী বলে, না, না, ছেড়ে দিন আমাকে।

উত্তেজিত হার্স্টউড্ বলে, আমাকে ভালবাসবে না তুমি? আজ থেকে এখন থেকে আমার, সম্পূর্ণ আমার তুমি, লক্ষ্মীটি।

হার্স্টউডের আকর্ষণ ক্যেরীর কাছেও কম নয়। হার্স্টউডের বুকের মধ্যে নিষ্পিষ্ট হয়ে ক্যেরীর সব বাধা ভাঙতে শুরু করেছে। এই হার্স্টউড, বলিষ্ঠ

আবেগোচ্ছল পুরুষ তাকে ভালবাসে। প্রাণ দিয়ে চায় তাকে। ওর প্রেমকে মেনে না নিয়ে উপায় কী তার। কোথায় যাবে সে পালিয়ে, কার কাছে, কোথায়? নিঃসহায়, নিঃসঙ্গ ক্যেরীর অন্য কি উপায় আছে।

ক্যেরীর মুখটা তুলে ধরে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় হার্স্টউড্। কী ভাষা, কী আবেগ, কী আবেদন ওর চোখে। ক্যেরী মুগ্ধ হয়, এই মুহূর্তে ওর সব অপরাধ, সব অন্যায়, সব প্রবঞ্চনা মিথ্যে হয়ে যায়। সত্য শুধু ওর প্রেম, সত্য শুধু ওর আবেগ।

হার্স্টউড্ বুকের মধ্যে মিশিয়ে দেয় ক্যেরীকে, দুটি মুখও এক হয়ে গেছে। ক্যেরী জানে, বাধা নিষ্ফল।

বলে, আমাকে বিয়ে করবে তুমি? উল্লসিত হার্স্টউড্ বলে, এখুনি, এই মুহূর্তে।

বেয়ারাটা এসে ধাক্কা দেয়। ক্ষুন্নমনে ছেড়ে দিতে হয় ক্যেরীকে।

হার্স্টউড্ বলে, তুমি তাহলে তৈরী হয়ে নাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি।

হার্স্টউড্ নেমে যায়, প্রথমে একটা সেলুন দেখতে হবে। যা হয়েছে চেহারা। মনে হার্স্টউডের খুশীর জোয়ার। ক্যেরীকে পেয়েছে সে। যত কিছু বিপদ ঝুঁকি সব সার্থক। সার্থক হয়েছে তার সব দুঃখ কষ্ট।

হঠাৎ কে ডাকলো চেনা গলায়? হার্স্টউড্ চমকে ওঠে।

—আরে জর্জ যে, এখানে কোত্থেকে? কী ব্যাপার?

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটি। হার্স্টউডের বন্ধু কেনি।

হার্স্টউড্ বলে, এই একটু ব্যক্তিগত কাজ আছে। কেনি নিশ্চয়ই তা হলে কাগজ পড়েনি।

—তারপর? তোমার সঙ্গে এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে কে ভেবেছিল। আছ কোথায়? এখানেই নাকি?

হার্স্টউড্ বলে, হ্যাঁ।—রেজিষ্ট্রি খাতায় অন্য নাম সই করেছে সে, ভয় হয়।

—ক'দিন থাকছ?

—এই দু একদিন।

—তাই নাকি, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে?

হার্স্টউড্ মিথ্যা কথা বলে, হ্যাঁ, একটু সেলুনে যাচ্ছি।

—একটু খেয়ে গেলে হতো না!

—না, এখন না, পরে হবে। তুমি আছো তো এখানেই। আমি ডেকে নেবো তোমাকে।

—আচ্ছা, হ্যাঁ, চিকাগোর খবর কী সব?

—এই যেমন চলছিল আর কি! নতুন কিছু নয়।

—মিসেস্ এসেছেন না কি সঙ্গে।

—না।

—আচ্ছা, তাহলে ঘুরে এসো—ডেকো কিন্তু আমাকে, কতদিন পরে দেখা।

হার্স্টউড্ কথা দিয়ে চলে যায়। এইটুকু কথা বলতে ওর যেন হৃৎকম্প হচ্ছিল।

কেনির সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িত। তার ফেলে আসা জীবনের সব কিছু মনে পড়িয়ে দেয় কেনি। চিকাগো, জুলিয়া, ফিজেরাল্ডের আড্ডা। কেনি কত কথাই জিজ্ঞেস করলো। সে সব ফেলে এসেছে হার্স্টউড্।

এখুনি, একটু বাদে চিকাগোর কাগজ এসে যাবে। আজই খবর থাকবে। শিউরে ওঠে হার্স্টউড্, ক্যেরীকে পাওয়ার আনন্দ উড়ে যায় মন থেকে। এখুনি সবাই জানবে, সে চোর। সেফ্ ভেঙে টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছে সে।

এখানে থাকা চলবে না। অন্য কোন ছোট অজানা হোটেলে উঠতে হবে।

ফিরে এসে সন্তর্পণে দেখে হার্স্টউড্। না লবীতে কেউ নেই। পিছনের গেটটা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে তো জিনিষপত্র নেই, কেউ সন্দেহ করবে না।

লবীর ওদিকে কাউণ্টারে কিন্তু কে একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে ওকে। দেখলে মনে হবে ক্লার্কটার সঙ্গে কথা বলছে, কিন্তু আসলে সে লক্ষ্য করছে হার্স্টউডকে, এদের চিনতে কষ্ট হয় না হার্স্টউডের। নিশ্চয়ই লোকটা সি. আই. ডি। তাড়াতাড়ি চলে যায় হার্স্টউড্ যেন দেখেনি লোকটাকে। মনের মধ্যে আবার নতুন করে তোলপাড় জাগে।

কী করতে পারে এরা? য়্যারেষ্ট। আইনে কি বলে ঠিক জানে না হার্স্ট'উড্, বিদেশীকে কি য়্যারেষ্ট করতে পারে এরা? কিন্তু যদি করে? যদি ক্যেরী জেনে ফেলে ওর ইতিহাস?

না, মন্ট্রীলে নয়। পালাতে হবে এখান থেকে।

ক্যেরী স্নানটান সেরে অপেক্ষা করছিল। অনেকটা মেঘ কেটে গেছে, তবু কেমন যেন গম্ভীর দেখায় ক্যেরীকে। ওর প্রাণে প্রেমের জোয়ার বইছে না। হার্স্ট'উড্ অনুভব করে সেটা। হয়তো সে টেনে নিতে পারতো ক্যেরীকে, ক্যেরীও হয়তো বাধা দিতো না। তবু তার আচরণে কি একটা বাধার ভঙ্গী।

—কী, তৈরী তো?

—হ্যাঁ।

—ভাবছি, বাইরে কোথাও গিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে আসি। এ হোটেলটা আমার কেমন পছন্দ হচ্ছে না।

—বেশ।

লবা দিয়ে নেমে আসতে হার্স্ট'উড্ লক্ষ্য করে, সেই লোকটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লোকটার দৃষ্টিতে এমন একটা ঔদ্ধত্য, হার্স্ট'উডও তারদিকে জ্বলন্ত চোখে না তাকিয়ে পারে না।

একটু দূরে একটা রেস্টুরেণ্টে ঢোকে ওরা। ক্যেরীরও ভাল লাগেনি শহরটা। চিকাগোর কাছে কিছুই নয়। তাছাড়া চোখে ভাসছে তার নিউ ইয়র্ক।

হার্স্ট'উড্ খুসী হয়, সেও তো থাকতে চায় না এখানে। ক্যেরী নিজে থেকেই বল্‌ছে।

—বেশ তো, এখানে আমরা থাকবো না। খেয়ে নাও, তারপর জামাকাপড় দুএকটা কিনে নিয়ে চলো নিউ-ইয়র্কেই চলে যাবো আমরা।

শুধু দেখতে চায় হার্স্ট'উড্ কী করে এরা। ফিজেরাল্ড ময় কী ব্যবস্থা করে ওর বিরুদ্ধে। তারপর নিউ-ইয়র্কের জনারণ্যে লুকিয়ে যাবে সে। তবুও কি

চিন্তার শেষ আছে? ফিজেরাল্ড, ময়-রা নিশ্চয়ই তার পিছনে সি. আই. ডি. লাগাবে।

হোটেলে ফিরে ক্যেরীকে ওপরে পাঠিয়ে চিকাগোর কাগজগুলো দেখে হার্স্টউড্। চেনাজানা কেউ নেই লবীতে, তবু সাহস হয় না সেখানে বসে পড়তে। দোতালার বসার ঘরে গিয়ে কাগজগুলো দেখে হার্স্টউড্। এই তো রয়েছে! বেশী না, আধকলম মাত্র। ছেপেছে সবাই।

যদি ফিরিয়ে দেওয়া যেতো? এসব যদি সত্যি না হতো? কতবড় ভুল করেছে সে আগে যদি বুঝতো।

কাগজগুলো এখানেই রেখে যাওয়া ভালো, ক্যেরীর হাতে না পড়ে।

ক্যেরী জানালার দিকে তাকিয়ে বসেছিলো।

হার্স্টউড্ বলে, কেমন লাগছে এখন?

ক্যেরী বলে, ভালই আছি।

হার্স্টউড্ কী একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজায় একটা ধাক্কা পড়ে।

ক্যেরী বলে, বোধহয় আমার কাপড় জামা কিছু নিয়ে এসেছে।

দরজা খুলে হার্স্টউড্ দেখলো সেই লোকটি। বলে, আপনিই তো মিঃ হার্স্টউড্ না?

হার্স্টউড্ বলে, হ্যাঁ। এইসব লোককে ঘৃণা করে ও। এদের গ্রাহ্যই করতো না সে মানুষ বলে আগে।

লোকটি যেন চুপে চুপে বলে, কেন আমি এখানে এসেছি, তাতো জানেন নিশ্চয়ই আপনি?

—হ্যাঁ, আন্দাজ করতে পারছি।

—আপনি কী টাকাটা রাখতে চান, না—

হার্স্টউড্ কঠিনভাবে বলে, সেটা আমার ব্যাপার, আমি বুঝবো।

হার্স্টউডের আপাদমস্তক একবার দেখে নেয় লোকটি, তারপর বলে, সে তো আর হয় না, ভাল করেই তা জানেন আপনি!

হার্স্টউড্ এবার গম্ভীরভাবে বলে, দেখুন মশায়, এসম্বন্ধে, আপনি কিছু

জানেন না, আপনার কাছে কৈফিয়ৎ দিতেও চাই না আমি। আমি যা করবো নিজেই করবো, অন্য কারো উপদেশ মত চলবো না আমি। আপনি এখন যেতে পারেন।

লোকটি বলে, দেখুন, পুলিশের কাছে এসব কথা বলে লাভ নেই। অনেক রকম গোলমাল করতে পারি আমরা। যেমন ধরুন আপনি হোটেলে অন্য নামে সই করেছেন, তাছাড়া যাঁকে স্ত্রী বলছেন, উনি আসলে স্ত্রী নন আপনার। আর কাগজওয়ালারা এখনো জানে না যে আপনি এখানে আছেন উপস্থিত। এসব গুলো ভেবে দেখা উচিত আপনার।

হার্স্টউড্ বলে, কী জানতে চান্ আপনি ?

—টাকাটা আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন কিনা ?

হার্স্টউড্ নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবে। শেষে বলে, দেখুন ব্যাপারটা আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। আপনার আমাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করেও কোন লাভ নেই। কী আপনারা করতে পারেন আর কী পারেন না সে কথা আমি ভালভাবেই জানি। আমি ফিজেরাল্ড ময়কে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছি। এখন আমি আর কিছু বলতে পারবো না। ওঁদের কাছ থেকে খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কথা বলতে বলতে হার্স্টউড্ দরজার কাছ থেকে সরে এসেছিলো, ক্যেরী যাতে না শুনতে পায় এসব কথা। বড় বসবার ঘরটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা।

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তাহলে আপনি টাকাটা ফেরৎ দিচ্ছেন না ?

লোকটির কথায় মাথায় রক্ত চড়ে যায় হার্স্টউডের। সে চোর নয়, টাকাগুলো চায় না সে। ফিজেরাল্ড ময়কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারলে আবার হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

হার্স্টউড্ বলে, দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলে লাভ নেই। আমি জানি আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু যাঁরা ব্যাপারটা মোটামুটি জানেন তাঁদের সঙ্গেই কথা বলতে চাই আমি।

লোকটি বলে, কিন্তু ক্যানাডা থেকে আপনি টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না।

—আমি চলে যেতে চাই-ও না। যখন সব ঠিক হয়ে যাবে, কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে।

হার্স্টউড্ ঘরে ফিরে আসে। সি. আই. ডি. টা একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ওর দিকে তারপর নেমে যায়।

ক্যেরী বলে, কে ?

হার্স্টউড্ উত্তর দেয়, চিকাগোর এক বন্ধু।

কেন যে টাকাটা নিয়েছে হার্স্টউড্, কোন্ অবস্থায় নিতে বাধ্য হয়েছে সে কথা কেউ ভেবে দেখে না। কাগজগুলো শুধু এই কথাই লিখেছে টাকাটা নিয়ে পালিয়েছে। চোরের মত পিছনে লেগেছে ওব। সব ব্যাপার না জেনেই ওকে চোর ধরে নিয়েছে সবাই। হার্স্টউডের দুঃখ হয়।

সেদিন ঘরে বসে হার্স্টউড্ ঠিক করে, টাকাটা পাঠিয়ে দেবে সে। সব বুঝিয়ে লিখবে সে ফিজেরাল্ড আর ময়কে। হয়তো তারা ক্ষমা করবে, হয়তো আবার ফিরে যেতে বলবে তাকে।

কী লিখবে সে ? স্ত্রীর কথাটা কি বলা যায় বুঝিয়ে ? না। শেষ পর্য্যন্ত সে লিখলো, রাত্রে মদের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়েছিল, তারপর সেফ্টা খোলা থাকায় টাকাগুলো দেখতে পেয়ে হাতে নিয়ে দেখছিল। ইতিমধ্যে সেফ্টা বন্ধ করে ফেলে সে ভুলে। অত্যন্ত অনুতপ্ত সে। কিছু টাকা সে অবশ্য খরচ করে ফেলেছে, সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরৎ দেবে সে।

তাকে কি ফিরিয়ে নেওয়া যায় ? একথাটা সে ইঙ্গিতে জানালো মাত্র।

চিঠিটা লেখার সময় ভুলে গেল হার্স্টউড্, পুরোনো অফিসে আর চাকরী করা তার পক্ষে সম্ভব কিনা। ভুলে গেলো স্ত্রীর কথা, ক্যেরীর কথা, নিজের আর্থিক অবস্থার কথা। অতীত জীবনকে যে সে একটি কুঠারাঘাতে ছিন্ন করে ফেলেছে সেকথা মনে হলো না হার্স্টউডের।

এদিকে ক্যেরী সামনে। হার্স্টউড্ ক্যেরীকে নিয়ে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। তন্ময়ই হয়ে যায়। আকাশে বাতাসে কিসের ইশারা ? যদি ক্যেরী তাকে

ভালবাসতে পারে, সব ভুলে যাবে হার্স্টউড্। সব দুঃখ সব চিন্তার যেন সমাধান ক্যেরী। ক্যেরীই ওর জীবনের একমাত্র আনন্দ।

—ক্যেরী, লক্ষ্মীটি, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো? বলো?

ক্যেরী চোখ তুলে তাকায় আনমনে। হার্স্টউডের মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা বোধ হয়। দুঃখের সাধনায় তাজা বলিষ্ঠ প্রেমের আবেগ সেখানে। ক্যেরী করুণাভরা দৃষ্টিতে হাসে।

হার্স্টউড্ বলে, এখন থেকে তুমিই আমার সব ক্যেরী। আমাকে গ্রহণ করো তুমি, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। চলো নিউ ইয়র্কে গিয়ে বাসা বাঁধবো আমরা। আবার ব্যবসা করবো আমি। তুমি আর আমি। আর কেউ নেই মাঝখানে। আমার হবে না তুমি ক্যেরী?

ক্যেরী উদাসভাবে শোনে, তার অন্তরে হার্স্টউডের জন্যে আগের সে প্রেম আর নেই, তবু মমতা হয়। একটু প্রীতি স্নেহ আসে বৈকি ওর জন্য।

—আমার সঙ্গে থাকবে তো তুমি, না?

ক্যেরী বলে, হ্যাঁ।

হার্স্টউড্ এগিয়ে এসে ক্যেরীকে বুকে টেনে নেয়, তারপর চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেয়।

ক্যেরী বলে, কিন্তু বিয়ে করতে হবে আমাকে।

হার্স্টউড্ বলে, আজই আমি লাইসেন্স নিয়ে নেব।

—কী করে?

—নতুন নামে। আজ থেকে নতুন নামে নতুন জীবন শুরু করবো আমি। এখন থেকে আমার নাম মার্ডক।

ক্যেরী বলে, না ও নাম নয়?

—কেন?

—ও নামটা ভাল লাগে না আমার।

—তবে কী নাম তুমি বলে দাও।

—যা হোক কিছু, শুধু ওটা নয়।

—আচ্ছা, হুইলার?

—আচ্ছা।

—আজই তাহলে ঠিক করে ফেলি, কেমন?

এক ব্যাপ্‌টিস্ট পাদ্রীর সাহায্যে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

কদিন পরে চিকাগোর চিঠি এলো। ময় লিখেছেন, খুবই অবাক্‌ হয়েছেন তাঁরা। খুবই দুঃখিত। যাই হোক্‌ টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় হার্স্টউড্‌ ওঁরা কোন মামলা আর করতে চান না। হার্স্টউডের বিরুদ্ধে কোন আক্রোশ নেই ওঁদের। আর ওর ফিরে যাওয়ার সম্বন্ধে ভেবে দেখছেন ওঁরা। পরে জানাবেন।

এর অর্থটা হার্স্টউডের কাছে অস্পষ্ট নয়। কোন আশা নেই চাকরীটা ফিরে পাবার। হার্স্টউড্‌ ঠিক করলো সাড়ে ন' হাজার ডলার ফেরৎ দেবে বাকী দেড় হাজার কাছে রাখবে, এমনি খরচের জন্যে যতদিন অন্য কিছু না পায়। ময়ের লোকের হাতে টাকাটা দিয়ে রসিদ নিয়ে নিলো হার্স্টউড্‌। তারপর ক্যেরীকে বললে তৈরী হয়ে নিতে নিউ ইয়র্ক যাবার জন্যে।

মনে মনে দারুণ ভয় ওর, কেউ যদি জেনে ফেলে। যদি ধরে ফেলে ওকে। সীমানা ছেড়ে যাওয়ার সময়।

ক্যেরী কিন্তু কিছুই জানলো না এ সবের।

নিউ ইয়র্ক। মহানগরী নিউ ইয়র্ক। ক্যেরীর স্বপ্ন!

স্টেশনে পৌঁছে হার্স্টউড্‌ দুরুদুরু বুকে সাবধানে তাকায় এদিক ওদিক। আইনের হাত কি এতদূর এগিয়েছে? না:, কেউ নেই এখানে। তবু কে কোথায় অপেক্ষা করছে কে জানে। হার্স্ট উড্‌ দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে আসে। ক্যেরীর কথা পর্য্যন্ত ভুলে যায় উত্তেজনায়।

না কেউ নেই। শুধু গাড়োয়ানগুলো চেঁচামেচি ডাকাডাকি শুরু করেছে।

ক্যেরী এগিয়ে এসে বলে, আমি ভাবলাম আমাকে ফেলেই পালাচ্ছ বুঝি।

হার্স্টউড্‌ আশ্বস্ত হয়েছে এতক্ষণে। মহানগরীর জনারণ্যে মিশে যেতে পারলে, আর কে ধরবে তাকে? হেসে বলে, না, এই গিল্‌সি যায় কোন্‌ গাড়ীটা তাই দেখছিলাম।

ক্যেরী ওর কথা শুনলোই না। নিউ ইয়র্কের আশ্চর্য্য ব্যস্ততা লক্ষ্য করছে সে।

—আচ্ছা কত বড নিউ ইয়র্ক ?

—তা, প্রায় দশ লক্ষেরও বেশী লোক থাকে।

গাডী ডাকার সময হার্স্টউড্ হঠাৎ অনুভব করে কেমন একটা পরিবর্ত্তন। কী এটা ? ওঃ, আজ থেকে খুচরো টাকাপযসাও হিসেব করে খরচ করতে হবে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ঠিক করে নেয, কোনও হোটেলে উঠবে না সে। বরং কম ভাডায সুন্দর ছোট একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া করবে। ক্যেরীকে বললো কথাটা। ক্যেরী বললো, বেশ তো।

কিন্তু উপস্থিত কোথায যাবে সে। না, বড হোটেলে না। হযতো মন্ট্রীলের মত কোনো বন্ধু বা চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

বেলফোর্ডে যেতে বললো সে গাডোয়ানটাকে।

এত বড় বড পাঁচ ছ'তলা বাডী শুধু ? থাকবার বাড়ীগুলো কোন্ দিকে ? ক্যেরী জিজ্ঞাসা করে।

হার্স্টউড্ ভালভাবেই চেনে নিউ ইয়র্ক শহরটাকে। বলে, কেন এই তো সব জাযগাতেই, এই বাডীগুলো তো থাকবার। মাঠ, গাছপালা বিশেষ নেই এখানে।

ক্যেরী বলে, নাঃ তাহলে তো ভাল নয শহরটা।

ক্যেরীরও আজকাল নিজের মতামত আছে। সাহস করে বলেও সে।

তেইশ

গ্রেপ্তাবের ভয়টা চলে যাবার পর ধীরে ধীরে অন্য সমস্যাগুলো মাথা তোলে হার্স্টউডের মনে। তেরশো ডলার তো মাত্র তার আছে। ঘরভাডা, খাওয়া, পোষাক, কতদিন চলবে ? দু'মাসেই এর চেয়ে বেশী খরচ করে এসেছে সে এতদিন। সে কথাটা মনে পডে, কাঁটার মত খোঁচা দেয।

হার্স্টউড্ খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করে।

ওযারেণ স্ট্রীটে একটা ছোট মদের দোকান সম্বন্ধে খোঁজ নেয সে। ব্যবসাটা লক্ষ্য করে সে, দোকানটার রোজ বিক্রী কতো হয।

ক'দিন পরে মালিককে বলে, আচ্ছা, দু'জনে চলে যাবে এতে না ?

— নিজেই তো দেখছেন। আরো একটা দোকান আছে আমার নাসাউ ষ্ট্রীটে। দু'টো একসঙ্গে দেখতে পারি না, তাই ভাবছিলাম, অভিজ্ঞ কাউকে যদি পাই, তার সঙ্গে এটা শেয়ার করে, বুঝলেন না। ওটা আমি দেখতাম। তিনি এটা চালাতেন।

হার্স্টউড্ বলে, অভিজ্ঞতা আমার অবশ্য ভালই আছে। ফিজেরাল্ড ময়ের কথা উল্লেখ করতে সাহস পায় না হার্স্টউড্।

দোকানের মালিকটি বলে, আমার তো মনে হয়, তাহলে আপনার কোন অসুবিধে হবে না, মিঃ হুইলার।

একহাজার ডলারের পরিবর্ত্তে, লাভের তিন ভাগের এক ভাগ দিতে রাজী হলো লোকটি। স্বত্বের প্রশ্ন নেই, কারণ দোকানঘরটা ভাড়া করা। প্রস্তাবটা অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু এতে কী চলবে দু'জনের? হয়তো মাসে একশো ডলার আসবে এথেকে। তবে ভালো করে চালাতে পারলে বেশীও পাওয়া যেতে পারে।

হার্স্টউড্ রাজী হয়ে গেলো শেষ পর্য্যন্ত।

প্রথমে ভালো না লাগলোও ক্যেরী আস্তে আস্তে ভালবেসে ফেললো নিউ ইয়র্ক শহরটাকে। কত ছোট্ট তার ফ্ল্যাট্‌টা। তবু ভালোবাসে ক্যেরী তার ক্ষুদ্র বাসাটাকে। সুন্দর করে সাজালো সে। একটা পিয়ানোও এলো, ক্যেরী শিখবে।

নতুন সংসার, নতুন স্ত্রী নিয়ে হার্স্টউড্ সুখী হবার চেষ্টা করে। ক্যেরীকে পেয়ে খুসী সে। তার নিজের হাজার চিন্তার মধ্যে ক্যেরীকে কোনদিন ঢুকতে দেয় না। ক্যেরী সুখে থাক্, ক্যেরী ভালবাসুক ওকে, এই তো ওর আনন্দ। ক্যেরীর ছোট-খাট আব্দার মেটাতে পেলে খুসী হয় হার্স্টউড্। সারাদিনের পর ক্যেরীর সঙ্গে বসে ডিনার খাবার জন্যে হার্স্টউড ব্যাকুল হয়ে থাকে। ছোট্ট বাসা, তবু কী শান্তি ক্যেরীর সাহচর্য্যে। ছোট-খাট রান্না শেখে ক্যেরী রাঁধুণীটার সাহায্যে, পিয়ানোয় একটা সুর তোলে। হার্স্টউড্ ছেলেমানুষের মত খুসী হয়। ক্যেরীকে সাহস দেয়, প্রশংসা করে।

কয়েকটা মাস কেটে গেলো এমনি করে। শীত এলো। হার্স্টউড্ নিজের জন্যে জামাকাপড় বিশেষ কিছুই কিনলো না, ক্যেরীর জন্যেও বিশেষ কিছু নিজে থেকে আনলো না। খরচপত্র এমনি করে মিটিয়ে চলার চেষ্টা করে হার্স্টউড্। অবস্থাটা জানতে দেয় না ক্যেরীকে। মাঝে মাঝে বলে, অন্য আর একটা ব্যবসায় টাকা লাগাচ্ছে সে। এমনি করে শীতটাও কেটে গেল।

পরের বছর ব্যবসাটায় একটু উন্নতি হলো। হার্স্টউডের আয় বাড়লো, দেড়শো ডলার হোলো মোট। ক্যেরী মেনে নিয়েছে এই ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে ওরা দু'জনে একসঙ্গে বেড়াতে যেতো, কিন্তু আলাপ পরিচয় বিশেষ কারো সঙ্গেই হলো না।

সহজ সাধা-সিধে ভাবে চলে হার্স্টউড্। আগের সে ঔজ্জ্বল্য নেই, ওর চেহারায়, পোষাকে বা আচরণে। ক্যেরীর সঙ্গে ব্যবহারটাও সহজ হয়ে এসেছে। চিকাগোর মত দু'হাতে খরচ করার, ফূর্তি আমোদ প্রমোদের সুযোগ পায় না ক্যেরী। কিন্তু ক্যেরী খুব ক্ষুণ্ণ নয়। হার্স্টউডের প্রতি মমতা বোধ করে সে। কী আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে। কিন্তু ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হার্স্টউডের পরিচয়ের পরিধিটাও বাড়ে। একদিন হার্স্টউড্ বাসায় ডিনার খেতে এলো না। অবশ্য খবর পাঠালো সে।

ক্যেরী অনুযোগ করে, এলে না যে?

হার্স্টউড্ বলে, অফিসে আটকা পড়ে গেলাম, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি।

ক্যেরীর মায়া হয় ওর উপর, আজ এলে না তুমি, আজ যা চমৎকার রান্না করেছিলাম!

এমনি পর পর আরো দু'বার হলো। তৃতীয়বার হার্স্টউড্ খবরও পাঠায়নি। ক্যেরী অসন্তুষ্ট হয়।

হার্স্টউড্ বলে, এমন আটকা পড়ে গেলাম।

—কোন খবরও পাঠাতে পারলে না?

—ভুলে গিয়েছিলাম ক্যেরী, সত্যি। এমন সময় মনে পড়লো, অনেক দেরী হয়ে গেছে তখন।

হার্স্টউড্ মনে মনে ভাবে, ক্যেরী আসলে বেশ ঘরোয়া ধরণের মেয়ে। খুসী হয় সে, এমন স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করা কতো সহজ।

ক্যেরীকে বাইরে নিয়ে নাইবা গেল সে। ও তো সংসার নিয়েই খুসী থাকে। হার্স্টউড্ নিশ্চিন্ত মনে আবার বাইরের দিকে মন দিতে শুরু করে। একদিন একাই থিয়েটারে গেল সে। আর একদিন পার্টিতে গেল বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে। টাকা হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের জীবনে ফিরে যেতে চায় সে। তবে বড় বড় জায়গায় সে যায় না, হয়তো পুরোনো চিকাগোর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

ক্যেরী এদিকে ধীরে ধীরে লক্ষ্য করে হার্স্টউডের পরিবর্ত্তন। খুব বেশী মাথা ঘামায় না সে। হার্স্টউডের প্রতি প্রেম অত গভীর নয় ওর, ঈর্ষ্যার স্থান নেই সেখানে। ক্যেরীও বন্ধুত্ব পাতায় পাশের ফ্ল্যাটের একটি মেয়ের সঙ্গে। মিষ্টার ও মিসেস্ ভ্যান্স। স্বামী স্ত্রী দু'জন মাত্র লোক, দু'জনের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে ক্যেরীর।

একদিন ভ্যান্সদের ফ্ল্যাটে ক্যেরীর নিমন্ত্রণ হয় তাস খেলার। বেশ জমে ওঠে সন্ধ্যাটা। বাসায় বলা ছিল হার্স্টউড্ এলে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয় এখানে।

হার্স্টউড্ আসতে আলাপ করিয়ে দেয় ক্যেরী। মিসেস্ ভ্যান্সের দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকায় হার্স্টউড্।

মিঃ ভ্যান্স শেক্‌হাণ্ড করে বলেন, কী ভেবেছিলেন, আপনার স্ত্রী পালিয়ে গেছে, না?

হার্স্ট উড্ হেসে বলে, কী জানি, হয়তো আমার চেয়ে ভালো কোন স্বামী জুটেও তো যেতে পারে।

সবাই হাসে। ক্যেরী কিন্তু লক্ষ্য করে হার্স্টউডের দৃষ্টি। সুন্দরী মহিলা, মিসেস্ ভ্যান্স। ক্যেরীও প্রথমে হার্স্টউডের এই দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়েছিল। এখন আর ক্যেরীর দিকে এমনি প্রশংসমান মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় না হার্স্টউড্। নিজের পোষাকটার দিকে খেয়াল করে ক্যেরী, মিসেস্ ভ্যান্সের মত সুসজ্জিতা নয় সে।

ক্যেরী পুরোনো, সাধারণ হয়ে গেছে! অবলুপ্ত অসন্তুষ্ট আকাঙ্ক্ষা মাথা তোলে ক্যেরীর মনে।

একদিন মিসেস্ ভ্যান্স বললেন, চলুন থিয়েটারে যাই। ক্যোরী রাজী হলো, কতো লাগবে?

—এই এক ডলার মতো।

ক্যোরী সাজলো তার সাধ্যমত। তবু কোথায় যেন একটা স্পষ্ট পার্থক্য বিঁধিয়ে তোলে ওর মনকে। মিসেস্ ভ্যান্সের উজ্জ্বল বেশ, প্রসাধন, উজ্জ্বল ভঙ্গীর পাশে ক্যোরী কিছু না।

ব্রডওয়েতে এসে ক্যোরী অবাক হয়ে যায়। স্বপ্ন-পুরীর রাজ্য কোনো। মহৎ বিরাট, ঐশ্বর্য্য গর্ব্বী ঝলমল ব্রডওয়ে। এখানে আর কোনদিন আসেনি ক্যোরী।

মিসেস্ ভ্যান্সের কাছে নতুন কিছু নয়। ব্রডওয়ে ভালো লাগে, অবাক্ করে না ক্যোরীর মত। সুন্দর পুরুষ সুবেশ মহিলাদের ভীড়। মিসেস্ ভ্যান্স ওদেরই একজন। কেউ কেউ সোজাসুজি তাকায় মিসেস্ ভ্যান্সের দিকে, মিসেস্ ভ্যান্স গম্ভীর হয়ে যান। ক্যোরীর দিকেও অনেকে তাকায়, চোখ টেপে।

একী দেশ, একী শহর? অসভ্য দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকানোটাই এখানে রেওয়াজ। কেউ কোন বাধা দেয় না, কেউ কিছু বলে না। ভালো-মন্দর তফাৎ করা প্রায় অসম্ভব এখানে। অনেক, অধিকাংশ, প্রায় সবই মন্দর দলে। ভালো যারা তারা মুষ্টিমেয়, এই মন্দর ভীড়ে খুঁজেই পাওয়া যায় না প্রায়।

এরিমধ্যে ক্যোরী ভাবে, অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করছে মিসেস্ ভ্যান্সের মত সুসজ্জিতা নয়, সে ওর মতো সুন্দরী নয়।

চব্বিশ

বছর তিনেক প্রায় একই ভাবে কাটলো। হার্স্টউড্ একই ভাবে চলেছে। না উন্নতি, না অবনতি। বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না হার্স্টউডের কোন মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু হার্স্টউড্ কি বদলায়নি? মানসিক বিকাশের পথ, জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে তার, যেদিন সে ক্যোরীকে নিয়ে চিকাগো ছেড়েছে সেইদিন থেকেই। মানুষের ভাগ্য তার স্বাস্থ্যের মতই বদলাতে থাকে। হয় উন্নতির দিকে নয়তো অবনতির পথে। একইভাবে চলছে,

কথাটার আসলে কোন অর্থ নেই। যৌবনের প্রারম্ভ থেকে শুরু করে পূর্ণ মানুষ হবার পথে সে বাড়ে, শরীরে, মনে, চিন্তাশক্তিতে। তারপর চলে বার্দ্ধক্যের দিকে তার অব্যাহত গতি, শক্তি কমে দেহে, মনেও। এমন একটা সময়ও অবশ্য থাকে যৌবন বার্দ্ধক্যের মাঝামাঝি যখন দু'টো দিকে তার পূর্ণ সামঞ্জস্য। তারপর শুরু হয় ধাপে ধাপে নীচে নামা। প্রথমে ধীরে, তারপর দ্রুত গতিতে। মানুষের ভাগ্যও তাই। অবশ্য যারা ধনী তারা এই অবনতিটাকে ঠেকিয়ে রাখে অন্যের যৌবনকে কাজে লাগিয়ে। তাদের বুদ্ধি তাদের কর্ম্মক্ষমতা সে কিনে নেয় অর্থের বিনিময়ে।

যৌবনের অস্ফুট বিদায়গীতি শুরু হয়েছে হার্স্টউডের জীবনে। সম্পূর্ণ পরিস্ফুট নয় শুধু এই কারণে যে নতুন পরিবেশে এখনও সেই সামঞ্জস্যটা পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায়নি। তা'ছাড়া আত্মবীক্ষণ বা মননে সে অভ্যস্ত নয়, তাই দেহে মনে তা'র পরিবর্ত্তনটা তার কাছে ধরা পড়ে না। শুধু মনটা ভরে আসে কিসের একটা অস্পষ্ট বেদনায়। ফেলে আসা জীবনের সঙ্গে নতুন পরিবেশের গরমিলটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অনুতপ্ত বেদনার্ত্ত হার্স্টউড্ দমে যায়। ভারাক্রান্ত বিষণ্ণতার বিষ শরীর মনকে জর্জ্জরিত করে দেয়।

হার্স্টউডের চাহনিতে সে দীপ্তি নেই, গতিভঙ্গীতে নেই আগের সেই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

মনের মধ্যে কুঁকড়ে যায় হার্স্টউড্, ভাবে। তার আজকের বন্ধুরা কেউ বিখ্যাত নয়। কেউ প্রথিতযশা নয়, না যশে না ধনে, না মননশীলতায়। সাধারণ, অতি সাধারণ প্রমোদলিপ্সু নরনারী তার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গী। এদের সঙ্গে সাহচর্য্য বা বন্ধুত্ব তার কাছে প্রীতিকর নয়। ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণা জাগে। এদের আপ্যায়ন করার মত ধৈর্য্য তার হারিয়ে যায়।

যে জীবনটাকে ফেলে এসেছে তারই জন্য তৃষ্ণা তার। ওরা নিজেদের নিয়ে মত্ত, ওর কথা কেউ ভাবে না। সেখানে তার অধিকার নেই। হার্স্টউড্ যেন কোন হাস্যোজ্জ্বল প্রাসাদ তোরণে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে লক্ষ্য করে অন্দরের আনন্দ-সমারোহ। প্রবেশ নিষেধ। ওখানে কড়া পাহারা, হার্স্টউডের অনুমতি নেই ওদের আনন্দ কোলাহলে অংশ গ্রহণ করার, এমন কি দেখারও নয়।

সিংহ-তোরণের এপাশে নিরানন্দ ধূ ধূ মাঠের হা-হুতাশ। একদিন সে-ও ছিল এই প্রাসাদের একজন রাজপুরুষ। আজ সে নির্ব্বাসিত।

খবরের কাগজে আনন্দ-নগরীর প্রমোদোচ্ছ্বাসের বিবরণ পড়ে হার্স্টউড্। কারা আসে সেই আনন্দ-প্রাসাদে, শিজেরাল্ড ময়ে? কারা গান গায় চিকাগোর প্রমোদ-ভবনে?

কে হুইলার? কে চেনে এই নগণ্য ওয়ারেণ স্ট্রীট?

হার্স্টউডের এই চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো ওয়ারেণ স্ট্রীটের পণ্যশালায়। ক্রেতা কমতে লাগলো। হার্স্টউড্ বিরক্ত হলো। আরো চিন্তা আরো উদ্বেগ।

একদিন রাত্রে ক্যারীর কাছে স্বীকার করতে হলো তাকে ব্যবসায় মন্দা পড়েছে। ক্যারী কয়েকটা স্বল্পদামী জিনিষ কিনতে চেয়েছিলো। সে ভাবলো এটা একটা অজুহাত। আজকাল হার্স্টউড্ তার দিকে মোটেই মনোযোগ দিতে চায় না, তারই একটা অভিব্যক্তি এই অজুহাত। ক্যারী মনে মনে বিদ্রোহ করে। আজকাল তাকে আনন্দ উপভোগের সঙ্গী খুঁজতে হয় ভ্যান্স দম্পতির কাছে।

এরাও চলে যাচ্ছে এখান থেকে। বাইরে যাবে পাঁচ ছ' মাস। কী হবে এ বাসাটার ভাড়া গুণে? ফিরে এসে অন্য একটা খুঁজে নিলেই হবে।

ক্যেরীর শেষ আশ্রয়ও চলে যাচ্ছে, দুঃখ পায় সে। মিসেস্ ভ্যান্সের সঙ্গে একরকম করে কেটে যেতো তার দিনগুলো।

হার্স্টউড্ বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাসীন, ভ্যান্সরাও চলে গেলো। ক্যেরীর ভীষণ বিশ্রী লাগে। অস্থির অসন্তুষ্ট বিষণ্ণ হয়ে ওঠে সে-ও। শুধু হার্স্টউডের ওপরই নয়, এই ফ্ল্যাটটা, এই জীবন সবই কিছু অসহ্য লাগে তার। কেন, কেন, কেন? অন্য কী কোন উপায় নেই? ক্যেরী চোখের জলে স্বস্তি খোঁজে।

এমনি করে একঘেয়ে বিষণ্ণ দিনগুলো কাটতে থাকে।

একদিন হার্স্টউড্ বলে, শঘনেসির সঙ্গে আর চালানো যাবে না, ভাবছি।

ক্যেরী অবাক হয়ে বলে, কেন?

হার্স্টউড্ বলে, অত্যন্ত কুঁড়ে, লোভী লোকটা। এত করে বলছি, আরো

কিছু টাকা দিয়ে দোকানটার একটু ভোল ফেরাতে, কোন কথাই শুনবে না সে। এমনি করে আর কতদিন চলবে?

—বোঝাতে পারলে না ওকে?

—না, অনেক চেষ্টা করেছি। ও কিছুই করতে রাজী নয়। নিজস্ব একটা কিছু না হলে, কোন উন্নতিই করা যাবে না।

—তাই তাহলে করছ না কেন?

হার্স্টউড্ বলে, টাকাগুলো যে সব আটকে রয়েছে ওখানে। এক যদি কিছু কিছু জমানো যেতো—

ক্যেরী বলে, বেশ তো, জমাও না।

হার্স্টউড্ ইতস্ততঃ করে বলে, তাই তো ভাবছি যদি একটা ছোট ফ্ল্যাটে উঠে যেতাম, কিছু বাঁচানো যেতো। তারপর নিজের একটা ব্যবসা হলে—

ক্যেরী অবাক হয়, সত্যিই তাহলে এই অবস্থা? বলে, আচ্ছা তাই করো, আমার কোন অসুবিধা হবে না।

কী আর বলতে পারে সে?

নতুন বাসায় এসে ক্যেরী আরো দমে যায়। আরো সংকীর্ণ ক্ষুদ্র দরিদ্র জীবন। হার্স্টউডকে এখন আর তার প্রেমিক বলে ভাবতে পারে না ক্যেরী। না স্বামী বলেও মনে হয় না ওকে। তবু সে ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে, ওরই স্ত্রী সে।

ক্যেরী লক্ষ্য করে হার্স্টউডের বিষণ্ণ, খুঁৎখুতে মেজাজ। বলিষ্ঠ উজ্জ্বল যুবক সে নয়। বয়সে অনেক বড়। অবসাদের চিহ্ন ওর চোখে-মুখে। ক্যেরী অনুভব করে, ভুল করেছে সে। সেই বা করেছে কোথায়? হার্স্টউড্ জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে তাকে!

কোন ঝি-নেই এখন আর। ক্যেরী তবু প্রাণপণে চেষ্টা করে সংসারটাকে গুছিয়ে চালাতে, এই সংকীর্ণ ফ্ল্যাট্‌টুকুকেই সুন্দর করে সাজাতে। মন ওঠে না, বিরক্তি আসে, তবুও উপায়ই বা কী?

হার্স্টউড্ বোঝাতে চেষ্টা করে এমন কিছু ঘাবড়াবার নেই। কিছুদিন কষ্ট

করলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আগের চেয়েও আরো স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে তারা। ক্যেরী বিশ্বাস করতে চায়, পারে না। দমে গেছে সে।

হার্স্টউডের মনে শান্তি নেই। অবসন্ন চিন্তায় সারাক্ষণ মগ্ন থাকে সে। শুধু খবরের কাগজ আর অনুশোচনা, চিন্তা। প্রেমের আনন্দ উড়ে গেছে কোন্ দিন। শুধু সাধারণ অতিসাধারণ, তার চেয়েও ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন নিয়ে কোনমতে বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

হঠাৎ একদিন শঘনেসি 'হেরাল্ড'খানা হার্স্টউডের হাতে তুলে দিয়ে বললো, দেখেছেন?

কাগজখানায় চোখ বুলিয়ে হার্স্টউড্ বলে, কী? নাতো!

—আমাদের বাড়ীর মালিক যে এটা বিক্রী করে দিয়েছেন।

—ঁয্যা? সে কি?

হার্স্টউড্ চমকে উঠে সম্পত্তি বিক্রয়ের কলমটা পড়ে।—সত্যি! এইতো নোটিশ।

হার্স্টউড্ চিন্তান্বিত হয়ে বলে। আমাদের লীজ কবে শেষ হচ্ছে? ফেব্রুয়ারীতে! না?

শঘনেসি বলে, হ্যাঁ।

হার্স্টউড্ বলে, নতুন মালিক এটা নিয়ে কী করবেন লেখে নি কিছু দেখছি।

শঘনেসি বলে, শীগ্রিই জানা যাবে, নিশ্চয়।

জানা গেল ঠিকই। মিস্টার শ্লসন্ ওখানে নতুন অফিস বিল্ডিং তুলবেন।

কী হবে তাহলে দোকানটার? হার্স্টউড্ শঘনেসির কাছে পরামর্শ চাইলো। আচ্ছা, কাছাকাছি আর কোথাও দোকানটা তুলে নিয়ে গেলে হয় না?

—জায়গা পাচ্ছেন কোথা?

—অন্য কোথাও উঠিয়ে নিয়ে গেলে, কী বলেন, চলবে না?

—আমি তো ওসব ঝুঁকি নিতে যাবো না মশাই।

অর্থাৎ! অর্থাৎ হার্স্টউডের একহাজার ডলার জলে যাবে এক বছরের মধ্যেই! এর মধ্যে একহাজার ডলার আবার জমানো কী সম্ভব? হার্স্টউড্

বোবে নতুন বাড়ীটা উঠলে শঘনেসি লীজ নেবে, অন্য কারুর সঙ্গে ভাগে আবার দোকানটা চালাবে।

তাড়াতাড়ি আর একটা কিছু ব্যবস্থা না করতে পারলে বিপর্য্যয় আসছে হার্স্টউডের সামনে। হার্স্টউড্ অস্থির হয়ে ওঠে। এখানে ওখানে ঘোরে। সুযোগ সহজে মেলে না। চিন্তায় চিন্তায় দেহে মনে তার ভাঙন ধরেছে এখন। এখন আর হার্স্টউডের আগের সে ব্যক্তিত্ব নেই। দেখে খুসী হয়ে ওঠে না লোকে।

তা ছাড়া আগের মত তেরোশো ডলার হাতেও নেই তার। কীসের জোরে কথা বলবে সে?

শঘনেসি স্পষ্ট জানিয়ে দিলে মিঃ ক্লসন লীজটা বাড়াতে কিছুতেই রাজী নন।

—তাহলে, ভীষণ দুঃখিত আমি, আমাদের চুক্তিটা—হার্স্টউড্ গম্ভীর ভাবে বলে, কী আর করা যাবে, উপায় যখন নেই।

দু'একদিন পরে হার্স্ট উডকে কথাটা ভাঙতে হলো ক্যেরীর কাছে।

—জানো ক্যেরী, ব্যবসাটা নষ্ট হয়ে গেল একেবারে।

ক্যেরী অবাক হয়ে গেল, মানে? কী বলছ? কী করে?

—বাড়ীর মালিক ওটাকে বিক্রী করে দিয়েছে—দোকানটা উঠিয়ে দিতে হবে।

—কেন, অন্য কোন জায়গায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

—জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, তাছাড়া আসলে শঘনেসির ইচ্ছে নেই।

—টাকাগুলোও তাহলে কী নষ্ট হয়ে যাবে?

হার্স্টউড্ কোনমতে উচ্চারণ করে, হ্যাঁ।

ক্যেরী বলে, সে কি? সর্ব্বনাশ!

হার্স্টউড্ বলে, চালাকি করেছে লোকটা, অন্য আর এক জায়গায় নিশ্চয় খুলবে সে।

ক্যেরী হার্স্টউডের মুখের দিকে তাকায়। বিপর্য্যয়ের আভাস সুপরিস্ফুট সেখানে।

ভয়ে ভয়ে ক্যেরী বলে, আর কি কিছু একটা পাবে তুমি, আশা আছে কোনো শীঘ্রি?

হার্স্টউড্ চিন্তা করে। টাকা খাটানোর সব গল্প এবার ধরা পড়ে যাবে। ক্যেরী কয়েকদিনের মধ্যেই জানতে পারবে, মিথ্যা কথা সে সব, বানানো গল্প হার্স্টউডের। আর কোন টাকা নেই তার।

গম্ভীর বিষণ্ণ গলায় হার্স্টউড্ বলে কী জানি দেখি চেষ্টা করে।

পঁচিশ

পরদিন সকালে উঠে তন্নতন্ন করে বিজ্ঞাপন কলম দেখে হার্স্টউড্। অধিকাংশই রুটিওয়ালা, রাঁধুনী, কম্পোজিটার, ড্রাইভার এমনি ধরণের লোক চায়। শুধু দু'টো বিজ্ঞাপনের নোট নিলো সে। হোল্‌সেল একটা ফার্ণিচারের দোকানে ক্যাশিয়ার চায়, আর একটা হুইস্কির দোকানে সেল্‌সম্যান চায়।

হুইস্কির দোকানটার নাম য়্যাল্‌সবেরী এণ্ড কোম্পানী।

চেহারা আর পোষাক দেখে খাতির করে বসায় ম্যানেজার। সে ভেবেছে মফঃস্বলের কোন খরিদ্দার বোধ হয় হবে।

হার্স্টউড্ ইতস্ততঃ না করেই সোজাসুজি বলে, আপনি সেল্‌সম্যানের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম।

ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গী বদলায়, হ্যাঁ।

হার্স্টউড্ গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে বলে, আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে, সে জন্যেই এলাম আপনার কাছে।

—ও, অভিজ্ঞতা আছে আপনার, কোথায় কাজ করেছেন আগে?

—অনেকগুলো মদের দোকান আগে চালিয়েছি আমি ম্যানেজারের পোষ্টে। তা ছাড়া ওয়ারেণ স্ট্রীটে একটা দোকানের আমি অংশীদার ছিলাম।

লোকটি বলে, ও।

হার্স্টউড্ অপেক্ষা করে কী বলে লোকটি।

—আমাদের একজন সেল্‌সম্যান চাই। কিন্তু আপনি কি?

হার্স্টউড্ বলে, দেখুন, বর্ত্তমানে যা অবস্থা আমার যা পাই তাতেই রাজী হতে হবে আমাকে। যদি খালি থাকে কাজটা, আমি নিতে রাজী আছি।

ম্যানেজারটি এমন লোক চায়, যে টিকে থাকবে। 'বর্তমানে যা পাই' শুনে সে খুসী হলো না। তা ছাড়া হার্স্টউডের বয়স হয়েছে। অল্পবয়সী কেউ, যে অল্প টাকায় খুসী মনে কাজ করবে, সেই রকম লোক চায় সে। হার্স্টউডের চেহারায় আভিজাত্যের ভাব আছে, দোকানের মালিক থেকেও তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশী প্রখর।

শেষে সে বলে, আচ্ছা আপনার দরখাস্ত রেখে যান। আমরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবো। ক'দিন বাদে এ সম্বন্ধে ঠিক করবো আমরা। হ্যাঁ, এর মধ্যে আপনার রেফারেন্সগুলো না হয় দিয়ে যাবেন।

হার্স্টউড্ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসে। হোল্‌সেল ফার্ণিচার হাউসটা বাইরে থেকে লক্ষ্য করে হার্স্টউড্। না, এখানে নয়। ওরা বোধ হয় হপ্তায় দশ ডলার মাইনের কোনো মেয়ে ক্যাশিয়ার চায়। আর কোথা যাওয়া যায় ভেবে পায় না হার্স্টউড্। এমনি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলের লবীতে গিয়ে বসে হার্স্টউড্। না, এখানে কারুর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয় নেই। বসে বসে ভাবে হার্স্টউড্, আকাশ পাতাল হাজার চিন্তা। রাস্তার ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের থেকে টেনে এনে পরিশ্রান্ত শরীরটাকে ডাই-ভানের ওপর এলিয়ে দেওয়া কত আরাম।

হার্স্টউড্ চেয়ে দেখে হোটেলের অতিথিদের ; সুবেশ সুন্দর বলিষ্ঠ চিন্তা-ভারমুক্ত নরনারী। আজ কাজ নেই ওর। অলস অবসরে বসে হার্স্টউড্ ভাবে, কী এত কাজ ওদের, কী করে ? এত উজ্জ্বল চঞ্চল কেন ওরা ?

এক একটি মেয়ে ইঙ্গিতভরা দৃষ্টিতে তাকায় হার্স্টউডের দিকে। কেমন করে মিশতে হয় এদের সঙ্গে, কেমন করে জীবন উপভোগ করতে হয় সে তা জানে হার্স্টউড্ ভালো ভাবেই। আজ তার টাকা নেই।

চারটে বাজলো। সকাল সকালই ফিরলো সে। একটা অস্বস্তি অনুভব করে সে। ক্যেরী ভাববে সে চেষ্টা করছে না ভালো করে। তবু বাইরের এই উদাসীন ব্যস্ত জীবনযাত্রা থেকে বাসায় রকিং চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ার মধ্যে একটু শান্তি পায় হার্স্টউড্।

ফ্ল্যাটের মধ্যে এরই মধ্যে আধো অন্ধকার। হার্স্টউড্ বলে, চোখে লাগবে ক্যেরী এত অন্ধকারে পড়ো না।

কোটটা খুলে রেখে চেয়ারে বসে হার্স্টউড্ ভাবে, আজ কী কী চেষ্টা করেছে সে, কী হয়েছে তার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার ক্যেরীর কাছে।

—একটা হোল্‌সেল মদের দোকানে কথা হলো। হয়তো হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

ক্যেরী বলে, তাই নাকি? ভালোই তো হবে, না?

হার্স্টউড্ বলে, মন্দ হবে না চাকরীটা মনে হচ্ছে।

রোজ দু'টো কাগজ কেনে হার্স্টউড্। কাগজ দু'টো তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে, এবার পরদিনটা আরো খারাপ লাগলো। আজ আর কোথাও যাবার নেই। কোথায় যাবে সে, কোথায়? সারাদিন বসে থাকা তো আর যায় না বাসায়!

ক্যেরী ধীরভাবে বলে, এ হপ্তার টাকাটা দিয়ে যেও কিন্তু।

প্রতি সপ্তাহে হার্স্টউড্ বারো ডলার করে দেয় ক্যেরীকে। এখানে এসে-থেকে এই ব্যবস্থাই চলে আসছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হার্স্টউড্ পার্সটা খোলে। শুধু বের করে যাচ্ছে সে, কিছুই আর আসছে না। ভগবান্, আর কতদিন চলবে এমনিভাবে?

ক্যেরীকে কিছুই বললো না সে। কিন্তু ক্যেরী বোঝে, টাকা চাওয়াতে হার্স্টউড্ বিব্রত হয়েছে? কিছুদিন পরে টাকা দেওয়া খুবই কষ্টকর হয়ে পড়বে। কিন্তু সেই বা কী করতে পারে। কেনই বা সে মাথা ঘামাতে যায়?

হার্স্টউড্ ব্রডওয়ের দিকেই চললো। গ্র্যাণ্ড হোটেলের লবীটায় কী আরাম, একটু বসলে হয়। না, তার আগে দাড়িটা কামিয়ে নেওয়া ভালো, বিশ্রী লাগছে।

কতক্ষণ বসে থাকা যায় চুপচাপ? সকাল সকাল বাসায় ফিরলো সে। আরো কটা দিন কেটে গেল এমনি করে।

তারপর তিন দিন খুব ঝড়বৃষ্টি হলো। হার্স্টউডকে আর বার হতেই

হলো না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বরফ পড়া শুরু হলো। পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত থামলো না। আবহাওয়ার রিপোর্টে জানাচ্ছে বরফ ঝড় হবে। হার্স্টউড্ বললো, আজ আর বেরুবো না ভাবছি, ভীষণ বরফ ঝড় হবে, কাগজে বল্‌ছে।

ক্যেরী বললো, আমার কয়লা দিয়ে যাচ্ছে না এখনো কিন্তু।

হার্স্টউড্ বলে, আচ্ছা আমি দেখে আসি একবার। সংসারের কাজে এই প্রথম হার্স্টউডকে দেখা গেল। চুপ-চাপ কিছুই না করে বসে বসে খাওয়ার মধ্যে একটা গ্লানি আছে বোধ হয়।

সারাদিন সারারাত ঝড় চললো। বরফে রাস্তা ঢেকে গেছে, যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে গেল।

হার্স্টউড্ তার নিজের কোনটিতে বসে বসে শুধু কাগজ পড়ে। কাজের কথা ভুলে যায় সে, এই বরফ ঝড়ে তো আর বার হওয়া যায় না। হার্স্টউড্ বসে বসে আরাম করে পা দু'টো সেঁকে চুল্লীর পাশে।

ক্যেরী ওর নিশ্চিন্ততা দেখে ভয় পায়। ঝড় যাই হোক, এমনি করে বসে বসে আরাম করবে সে। অস্বাভাবিক লাগে ওর কাছে।

দার্শনিকের মত বিজ্ঞ গাম্ভীর্য্য নিয়ে হার্স্টউড্ কাগজ পড়ে শুধু, আর কোন দিকে খেয়াল নেই ওর।

ক্যেরী সংসারের কাজ করে। কোন বাধা দেয় না হার্স্টউডকে।

পরপর আরো দু'টো দিন এমনি করে চললো। হার্স্টউড্ বসে রইলো বাসায়। দু'বার সে সংসারের কাজে বাইরে গেল অবশ্য নিজে থেকেই, একবার মাংসওয়ালার কাছে, আর একবার মুদীর দোকানে। কিছুই না। তবু সে ভাবে যে একেবারে বসে নেই, সংসারের দু'টো কাজ তো সে করলো।

চতুর্থ দিন ঝড়বৃষ্টি থামলো। হার্স্টউড্ ভাবে রাস্তাঘাট আজও তো ভীষণ প্যাচ্‌পেচে। সকাল দুপুরটা বসে বসে কাটালো সে। বিকেলের দিকে বের হলো, একটা ছোট বিজ্ঞাপন আছে পার্ল স্ট্রীটের একটা হোটেলের।

ব্রডওয়ে সেন্ট্রালে পৌঁছে কিন্তু মত পাল্টালো হার্স্টউড্। কী হবে চেষ্টা করে? ওতে আর কী হবে তার? কিছুই হবে না। শেষ পর্য্যন্ত বড় হোটেলটায় এসে লবীতে বসলো।

বসে বসে ভাবছিলো সে কী করা যায়। একজন সুসজ্জিত ভদ্রলোক ওকে লক্ষ্য করলেন যেন ঠিক মনে পড়ছে না। তারপর এগিয়ে এলেন ওর কাছে।

কারগিল। চিকাগোর অনেকগুলো অশ্বশালার মালিক কারগিল। ক্যেরী যেদিন থিয়েটারে নামে, সেই শেষ ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হার্স্টউডের।

এই লোকটি সেদিন ওর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন হার্স্টউডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে, আর আজ?

হার্স্টউড্ মরমে মরে যায়।

কারগিল ভাবেন আঃ আগে কেন চিনতে পারলেন না ওকে। তাহলে আর এভাবে আলাপ করতে হতো না! এখন আর কী করা যায়? বলেন,—

·আরে হার্স্টউড্ যে!

হার্স্টউড্ বলে, হ্যাঁ, কেমন আছেন?

কারগিল বলেন, ভালই।

তারপর আব কী বলা যায় ভেবে পান না। খানিক বাদে বলেন, তারপর এখানেই আছ নাকি এখন?

হার্স্টউড্ বলে, না, এখানে কাজে এসেছি।

—শুনেছিলাম চিকাগোয় নেই তুমি। ভাবছিলাম কোথায় আছ তা হলে।

হার্স্টউডও অস্বস্তিকর পরিবেশটা থেকে মুক্তি পেতে চায়, কোনরকমে বলে, এখন তো এখানেই রয়েছি।

—ভালই আছ আশা করি।

—হ্যাঁ, ভালই আছি।

—সুখী হলাম শুনে।

দুজনেই অস্বস্তি বোধ করেন।

কারগিল শেষে বলেন, ওপরে এক বন্ধুর সঙ্গে একটু কাজ আছে। আচ্ছা।

হার্স্টউড্ মাথা নেড়ে সায় দেয়।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বলে সে, জানতাম এমনি একদিন হবে।

আরো কিছুটা এগিয়ে যায় সে। মোটে দেড়টা বেজেছে। কোথায়ই বা

যাওয়া যায়। বসা যায় না কোথাও! পা দু'টো ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা লাগে। [illegible] পারে না সে। শেষে একটা গাড়ীতে উঠে বসলো হার্স্টউড্।

সেভেন্থ এভিনিউ। এখানেও তো একই প্রশ্ন। কোথায় যাবে সে। মনে মনে ভাবে তার বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে। নাঃ, আজকের দিনে এমনভাবে না ঘোরাই ভাল। বাড়ী ফিরে এলো সে।

এত সকাল সকাল বাসায় ফিরে আসতে দেখে ক্যেরী আশ্চর্য্য হয়।

হার্স্টউড্ কৈফিয়ৎ দেয়, বাইরে ভীষণ অবস্থা। তারপর জুতো আর কোটটা ছেড়ে ফেলে চেয়ারটায় গিয়ে বসে।

রাত্রে জ্বর জ্বর বোধ হয় হার্স্টউডের। কুইনাইন খেয়ে ফেললো সে খানিকটা। প্রায় সকাল পর্য্যন্ত রইলো জ্বরভাবটা। হার্স্টউড্ বসে বসে ক্যেরীর সেবা খায়।

এইটুকুতেই ভীষণ বিশ্রী দেখায় তাকে। দুর্ব্বল রুগ্ন হার্স্টউডকে রুক্ষ চুলের গোছায় কেমন জরাগ্রস্ত দেখায়। ক্যেরী লক্ষ্য করে। মমতাময়ী হবার চেষ্টা করে সে, কিন্তু হার্স্টউডের চেহারায় কী একটা এসে গেছে, ওকে দূরে ঠেলে দেয়। বিকেল বেলায় ক্যেরী আতঙ্কিত হয় ওর চেহারা দেখে। বলে, এখুনি শুয়ে পড়ো তুমি। তোমার বিছানা করে দিচ্ছি। আজ একাই শোও কেমন, ভালো লাগবে অসুস্থ শরীরে।

হার্স্টউড্ বলে, আচ্ছা, তাই দাও।

বিছানা পেতে হার্স্টউডকে শোয়াতে শোয়াতে ক্যেরী ভাবে, এই কি জীবন আমার?

হার্স্টউড্ কাগজ পড়ে একমনে। ক্যেরী কাজ করতে করতে হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে। হার্স্টউড্ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে আসছে। ওকে কী এমনি করে শুশ্রূষা করতে হবে ক্যেরীর বাকী জীবন? কী খাবে ওরা? কেমন করে চলবে? এই কি ক্যেরীর কপালে লেখা ছিল।

একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে বেকার রুগ্ন অলস উদাসীন একটা বার্দ্ধক্যগ্রস্ত লোককে নিয়ে তাকে কাটাতে হবে সারাজীবন। আজ সে কিছুই নয় ওর কাছে। শুধু দাসী মাত্র। পাশের ঘরে গিয়ে ক্যেরী কাঁদে। হায় ভগবান্।

বিছানা পেতে দিয়ে ক্যেরী ডাকে হার্স্টউডকে। হার্স্টউড্ লক্ষ্য করে ক্যেরীর ছল্‌ছলে মুখ। বলে, কী হয়েছে?

উস্কোখুস্কো চুল ওর, ভাঙা গলা। হার্স্টউডের প্রশ্নটা অদ্ভুত শোনায় ক্যেরীর কাছে। বলে, কিছু না।

হার্স্টউড্ বলে, কাঁদছিলে তুমি।

ক্যেরী বলে, না কাঁদিনি।

হার্স্টউড্ জানে, তার অসুখের জন্য সমবেদনায় কাঁদেনি ক্যেরী। বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে সে বলে, কেঁদো না, এতো ভাবনার কিছু নেই। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

দু'একদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে গেলো হার্স্টউড্। কিন্তু আবহাওয়াটা মোটেই ভাল নয়। বাসা থেকে বের হলো না সে। কাগজওয়ালা বাসায় কাগজ দিয়ে যাচ্ছে রোজ। হার্স্টউড্ লোভীর মতো আগ্রহ নিয়ে কাগজ পড়ে।

আর দু'একবার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু পুরোনো আর একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে হোটেলের করিডরে গিয়ে বসে থাকতে আর সাহস পায় না এখন। প্রথম প্রথম ক'দিন তাড়াতাড়ি ফিরে এলো সে। তারপর একেবারেই ছেড়ে দিলো বের হওয়ার ভানটুকুও।

সারাদিন বাড়ীতে বসে থাকতে থাকতে ক্যেরীর কাজকর্ম্ম লক্ষ্য করে সে। ঘর সংসারের কাজে ক্যেরী খুব পটু নয়। অনেক ছোটখাট জিনিষ নজরে পড়ে তার। ক্রমশঃ টাকা দেওয়াটা আরো কষ্টকর হয়ে ওঠে।

প্রতি মঙ্গলবার টাকা দিতো সে ক্যেরীকে। একদিন মঙ্গলবার সকালবেলা সে বললো, আচ্ছা খরচপত্র আর কি কিছু কমানো যায় না?

ক্যেরী বললো, যতদূর সাধ্য কম করেই তো চালাচ্ছি।

সেদিনের মতো আর কিছু বললো না হার্স্টউড্। পরদিন বললো, আচ্ছা কোথা থেকে বাজার করো তুমি? গ্রানসেভুর্ট মার্কেটে গিয়েছিলে কোনদিন?

ক্যেরী বলে, শুনিনি তো ও বাজারটার নাম।

—ওখানে শুনলাম সস্তায় জিনিষপত্র পাওয়া যায় সব।

কথাটা ক্যেরী বিশেষ গ্রাহ্য করে না। এসব কথা মোটেই পছন্দ করে না সে।

একদিন হার্স্টউড্ জিজ্ঞেস করলো আবার, আচ্ছা মাংস কী দরে কেনো তুমি ?

ক্যেরী বললো, কতো রকম দর আছে। মেটের দাম হলো বাইশ সেণ্ট।

—ওঃ খুব দাম নেয় তো তা'হলে।

এমনি করে প্রায়ই জিজ্ঞেস করতে লাগলো সে জিনিষপত্রের দাম। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট।

শেষে এটাই তার একটা যেন রোগ হয়ে দাঁড়ালো। খুঁটিয়েখুঁটিয়ে জিনিষপত্রের দাম জিজ্ঞেস করা, আর বলা 'ঈস্ ভীষণ দাম নিচ্ছে তো'।

আস্তে আস্তে সংসারের কাজে মন দেয় হার্স্টউড, যেন কিছু একটা করছে দেখাতে চায় সে। একদিন ক্যেরী বেরুতে যাচ্ছে সে বললো, আমিই যাচ্ছি, তুমি থাকো।

ক্যেরী রাজী হয়। রোজ বিকেলবেলা সে কাগজটা আনতে যাবার আগে এখন জিজ্ঞাসা করে, তোমার কিছু আনতে হবে তো বলো ?

ধীরে ধীরে ক্যেরীও কাজে পাঠাতে শুরু করে হার্স্টউডকে। অবশ্য এর ফলে একসঙ্গে বারো ডলার আর পায় না সে এখন। একদিন মঙ্গলবার সে বললো, আজ টাকা দিতে হবে আমাকে।

হার্স্টউড্ বলে, কতো ?

এর অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না ক্যেরীর। সে বলে, এই গোটা পাঁচেক। কয়লা-ওয়ালা পাবে।

সেইদিনই হার্স্টউড্ বিকেলে বলে, ইটালীয়ানটা পঁচিশ সেণ্টে বিক্রী করছে কয়লা, ওর কাছ থেকেই নেবো এবার থেকে।

ক্যেরী বলে, আচ্ছা।

এরপর শুরু হলো—

'জর্জ, আজ কয়লা আনতে হবে'। অথবা 'আজ মাংসটা নিয়ে এসো কিন্তু'।

একদিন হার্স্টউড্ আধ পাউণ্ড মাত্র মাংস এনে দিয়ে বললো, আমাদের এর চেয়ে বেশী আর কী লাগবে, কী বলো। এতেই চলে যাবে, য়্যাঁ ?

এই সব অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছতায় ক্যেরীর প্রাণ হুহু করে কেঁদে ওঠে।

লোকটা কি অদ্ভুত বদলে গেছে। সারাদিন এইখানে বসে থাকে সে। পৃথিবীর কোন বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই, উৎসাহ নেই, প্রাণ-ই নেই যেন ওর। ক্যেরী ঘৃণা করতে শুরু করে ওকে।

হার্স্টউডের আসে বিতৃষ্ণা, অসন্তোষ। পথ নেই, কোন পথ নেই তার। ক্ষুদ্র সঞ্চয় শেষ হয়ে আসছে।

মাত্র পাঁচশো ডলার আছে আর। হার্স্টউড্ আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় এই কটা টাকাকে। যেন কোনো মন্ত্রবলে ঠেকিয়ে রাখবে সে প্রয়োজনের কড়া তাগিদ।

বাড়ীতে বসে থাকতে থাকতে আগে একদিন সে পুরোনো জামাকাপড়গুলো পরেছিল, কোথাও তো আর যাচ্ছি না। পরলেই বা, কী বলো?—সেদিন কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিলো তাকে।

আজ সেগুলোই চিরস্থায়ী হয়েছে হার্স্টউডের। সেই পুরোনো জামা-কাপড়ই সে সারাদিন পরে থাকে। তারপর দাড়ি কামানোর খরচটাও কমিয়ে ফেলেছে সে। প্রথমে পনেরো সেণ্ট আর দশ সেণ্ট বকশীষ দিতো সে। বকশীষটাকে কমিয়ে করলো পাঁচসেণ্ট। তারপর একেবারে বন্ধ করে দিলো বকশীষ দেওয়া। তারোপরে দশ সেণ্টে একজায়গায় কামিয়ে দেখলো, না এমন কিছু খারাপ কামায়না তো। তারপর থেকে সেখানেই দাড়ি কামায় হার্স্টউড্ আস্তে আস্তে রোজ থেকে একদিন অন্তর। দুদিন, তিনদিন তারপর সপ্তাহে একবার মাত্র। শনিবারটা দাড়িতে ভরে যায় সারামুখটা। অদ্ভুত দৃশ্য! নিজের কাছে আত্মসম্মান নষ্ট হয়ে যায় তার, ক্যেরীর কাছেও।

লোকটার মাথায় কী-যে ঢুকেছে ভেবে পায় না ক্যেরী। ভালো একটা স্যুট এখনো রয়েছে ওর, টাকাও কিছু রয়েছে। ঠিকমতো কাপড়জামা পরলে ততো খারাপ নয় দেখতে। তবু কেন এমন করে? প্রথম প্রথম চিকাগোতে তার নিজের অবস্থাটা ভুলে যায়নি ক্যেরী, কিন্তু সেতো চেষ্টা করতো পরিচ্ছন্ন থাকবার, একটা কিছু পাবার। আজকাল চেষ্টাই করে না হার্স্টউড্, এমনকি খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো পর্য্যন্ত দেখে না।

একদিন ক্যেরীর মনের অসন্তোষ ফুট বের হয়। হার্স্টউড্ সকালে বললো, এত মাখন দাও কেন রুটিতে? ক্যেরী বলে, কেন আবার; খেতে ভালো হবে বলে।

হার্স্টউড্ বলে, কী দাম মাখনের খেয়াল করেছ আজকাল?

ক্যেরী বলে, চাকরী থাকলে এসব খেয়াল তুমিও করতে না।

এরপর চুপ করে গেল হার্স্টউড্। ক্যেরীর ইঙ্গিতটায় বুকের ভিতরটা জ্বালা করে। এই প্রথম ক্যেরী এমন ভাবে ব্যথা দিয়ে কথা বললো।

সেদিন রাত্রে ক্যেরী বাইরের ঘরটায় শুতে গেল। হার্স্টউড্ লক্ষ্য করলো শুতে গিয়ে। বাঃ, ক্যেরী কোথা গেল?

পড়ছে হয়তো। হার্স্টউড্ বিশেষ মাথা ঘামালো না, ঘুমিয়ে পড়লো।

সকালে উঠে দেখলো ক্যেরী নেই সে ঘরে। কোন কথা বললো না হার্স্টউড্।

ক্যেরী নিজেই বললো সেদিন সন্ধ্যাবেলা, আমি একা শোব আজ ভাবছি, মাথাটা ধরেছে। হার্স্টউড্ বললো, আচ্ছা।

পরের দিনও ক্যেরী বাইরের ঘরে শুলো। সেদিন আর কোন কৈফিয়ৎ দিলো না সে। হার্স্টউড্ আঘাত পেলো খুবই। কিন্তু কোন মন্তব্য করলো না। ভ্রূ কুঁচকে আপন মনে বললো হার্স্টউড্; আচ্ছা, তাই হোক, একলাই শুক ও।

ছাব্বিশ

অবশেষে একদিন শেষ পঞ্চাশ ডলারে এসে ঠেকলো হার্স্টউডের সঞ্চয়।

এত চেষ্টা করেও জুন মাসের বেশী চললো না। শেষ একশো ডলারে যখন হাতে পড়লো, হার্স্টউড্ আকারে ইঙ্গিতে আসন্ন বিপর্য্যয়ের আভাস দিলো ক্যেরীকে।

একদিন মাসের খরচ নিয়ে কী কথা তুলে হার্স্টউড্ বললো, ভীষণ খরচ হচ্ছে আমাদের, এমন করে—

ক্যেরী বললো, আমার তো মনে হয়, এমন কিছু বেশী খরচ মোটেই করছি না।

হার্স্টউড্ বলে, আমার টাকা প্রায় সবশেষ হয়ে গেছে। কী করে যে হলো বুঝতে পারছি না।

ক্যেরী বলে, সে কি? সব, সাতশো ডলার শেষ হয়ে গেছে?

—প্রায়, শ'খানেক মাত্র আর আছে।

এমন অদ্ভুত অবসন্ন দেখায় হার্স্টউডকে। ক্যেরী ভয় পায়। বলে, জর্জ একটা চাকরী বাকরী দেখছোনা কেন তুমি? একটা চাকরী তো চেষ্টা করলে পাও তুমি।

হার্স্টউড্ বলে, চেষ্টা কি আর করিনি। চাকরী কেউ দিতে চায় না।

হতাশ দৃষ্টিতে তাকায় ক্যেরী—কী করবে ভেবেছ? একশো ডলারে আর ক'দিন চলবে? তারপর?

হার্স্টউড্ বলে, কীযে করবো জানি না। দেখি চেষ্টা করি।

শেষ সংবাদটা শুনে ক্যেরী ভয় পেয়ে গেলো ভীষণ। মরিয়া হয়ে সে পথ খোঁজার চেষ্টা করে। বহুবার ভেবেছে সে থিয়েটারের কথা। যদি সে অভিনেত্রী হতে পারতো।

চিকাগোর মতই শেষ অবস্থায় যখন অন্য কোন উপায় নেই, এই কথাটাই তার বারবার মনে হতে লাগলো। ওর একটা চাকরী না হলে তাকে একটা কিছু তো করতেই হবে। আবার হয়তো একাই নামতে হবে তাকে জীবন-যুদ্ধে।

ভাবে সে, কেমন করে একটা পথ পাওয়া যায়। চিকাগোর অভিজ্ঞতায় জেনেছে সে চাকরী পাওয়ার পথ ও নয়। লোক চাই, সাহায্য করার জন্যে প্রভাবশালী লোক চাই।

একদিন ব্রেকফাস্টে বসে ক্যেরী থিয়েটারের কথা তোলে। সারা বার্ণহার্ড্ট নিউ-ইয়র্কে আসছে এই প্রসঙ্গে কথাটা উঠলো। ক্যেরী সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা জর্জ লোকে কী করে থিয়েটারে ঢোকে?

হার্স্টউড্ বললো, কী জানি ঠিক জানিনা। বোধ হয়, এজেণ্ট আছে সব।

ক্যেরী কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল। মুখ না তুলেই বললো। মানে চাকরী খুঁজে দেওয়ার জন্যে সব লোক আছে?

হার্স্টউড্ বলে, তাই তো মনে হয়।

হঠাৎ ক্যেরীর প্রশ্ন করার ভঙ্গীটা ওর কানে লাগে। বলে, তুমি কি সেই অভিনেত্রী হবার কথাটা আবার ভাবছ নাকি?

ক্যেরী বলে, না, এমনি বলছিলাম।

থিয়েটারের প্রসঙ্গটা তোলায় হার্স্টউড্ খুসী হয়নি। ওর ধারনা ক্যেরী এ লাইনে কিছুই করতে পারবে না। অত্যন্ত বেশী সরল, বেশী নমণীয় সে। ক্যেরীর মত মেয়ে ও লাইনে গেলে নীচু দরের কোন ম্যানেজারের হাতে আর পাঁচজন মেয়ের মত সস্তা হয়ে যাবে। ক্যেরী দেখতে ভালই, নিজে সে একরকম করে চালিয়ে নেবে কিন্তু তার পর কী হবে? হার্স্টউড্ বলে, আমি হলে ওসব কথা মোটেই মনে স্থান দিতাম না। তুমি যা ভাবছ অত সহজ না।

ক্যেরী ভাবলো হার্স্টউড্ ওর অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করলো। সে বলে, চিকাগোতে তুমি বলেছিলে আমি ভালই অভিনয় করতে পারি।

—হ্যাঁ, ভালই তো করেছিলে। কিন্তু এটা নিউ-ইয়র্ক শহর ভুলে যেও না। অনেক তফাৎ এখানে।

ক্যেরা জবাব দিল না। মনে মনে আহত হলো সে। হার্স্টউড্ বলে, বড় একটা কিছু হতে প্যারলে নাট্য-জগৎটা মন্দ নয়, কিন্তু বড় না হতে পারলে সাধারণের পক্ষে কোন ভবিষ্যৎ নেই ও রাস্তায়।

ক্যেরী একটু উত্তেজিত হয়, কী জানি।

একমুহূর্ত্তে ক্যেরীর ইঙ্গিতের অর্থটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চরম সংকটে ক্যেরী যদি চলে যায়, ওকে ফেলে? ক্যেরীর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে হার্স্টউড্ অত্যন্ত ভুল ধারণা করেছে। আবেগের মহত্ব সে বুঝতে পারে নি ক্যেরীর মধ্যে। ধীশক্তিতে প্রখর না হয়েও মানুষ আবেগের দিকে অনেক উর্দ্ধে উঠে যেতে পারে এধারণা তার ছিল না। আভেরি হল কতদূর? অনেক দূর। সে কথা তার স্পষ্ট মনে পড়ে না। আর ক্যেরীকে সে এত কাছে থেকে তিন বছর দেখছে।

হার্স্টউড্ বলে, আমি কিন্তু জানি। আমি হলে ও কথা চিন্তাই করতাম না। মেয়েদের পক্ষে এটা মোটেই ভাল লাইন নয়।

—না খেয়ে থাকার চেয়ে তো ভালো, ক্যেরী এবার সাহস করে বললো।—

বেশ তুমি যদি আমাকে না যেতে দিতে চাও নিজে একটা চাকরী অন্ততঃ জোগাড় করে নাওনা কেন ?

একথার কোন জবাব নেই হার্স্টউডের। আরো কতবার এই কথা শুনেছে সে ক্যেরীর মুখে। সে বলে, ৎ হ্যাঁ, সে তো দেখাছই।

এরপর ক্যেরী গোপনে গোপনে খোঁজ নিতে শুরু করলো। হার্স্টউডের কথার ওপর নির্ভর করে সে তো আর না-খেয়ে শুকিয়ে মরতে পারে না। অভিনয় সে করতে জানে। দেখা যাক্ চেষ্টা করে। তখন কী বলবে ও ? ক্যেরী মনে মনে ছবি আঁকে। ব্রডওয়ের কোন বড় স্টেজে নামছে সে,.... মেক্-আপ্ করছে...রোজ সন্ধ্যায় অভিনয় করছে...। হোক্ না ছোটখাট পার্ট, না হোক্ সে স্টার, একটু ভাল মাইনে পেলেই সে খুসী হয়ে চাকরী নেবে। মনের মত পোষাক, ইচ্ছামত খরচ করার স্বাধীনতা এইটুকুই সে চায়। সারাদিন ক্যেরী এই সব কথাই ভাবে এখন। হার্স্টউডের বিষণ্ণ হতাশ গাম্ভীর্য্যের চেয়ে কত সুন্দর প্রোজ্জ্বল এই জীবন।

আশ্চর্য্য! হার্স্টউডের মাথাতেও আস্তে আস্তে এই চিন্তাটাই ঢুকলো। সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে, এর পর কী ? তাকেও তো বাঁচতে হবে। ওর নিজের যতদিন কিছু না হয়, মন্দ কি ক্যেরী যদি কিছু রোজগার করতে পারে ?

একদিন সন্ধ্যাবেলা এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরলো সে। ক্যেরীকে বললো, জানো আজ জন ড্রেকের সঙ্গে কথা হলো, ও একটা হোটেল খুলছে শীগ্রি। বলছে আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে তখন।

ক্যেরী শুধায়, কে জন ড্রেক ?

—চিকাগোর গ্র্যাণ্ড প্যাসিফিক্‌টা চালায় ও।

ক্যেরী বলে, ও।

—বছরে তা প্রায় চোদ্দশোর মত পাবো।

ক্যেরী সহানুভূতির সুরে বলে, তাহলে তো বেশ ভালই হবে না ?

হার্স্টউড্ বলে, এই গ্রীষ্মের ক'টা মাস যদি কোন রকমে কাটিয়ে দেওয়া

যেতো—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। আমার পুরোনো বন্ধুদের কাছ থেকে খবরাখবর পাচ্ছি এখন।

ক্যেরী হার্স্টউডের কাহিনীটা বিশ্বাস করলো। সত্যি যদি গ্রীষ্মটা চালিয়ে নেওয়া যেতো। কষ্ট হয় বৈকি অসহায় লোকটার জন্যে।

—কত টাকা আর আছে তোমার কাছে?

—আর মাত্র গোটা পঞ্চাশেক আছে।

—হায় ভগবান্, এতে তো কিছুই হবে না। আর দিন কুড়ি পরে তো ঘরের ভাড়াই দিতে হবে।

হার্স্টউড্ হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকে অসহায়-ভাবে। খানিকপরে মাথা তুলে বলে, যদি তুমি থিয়েটারে কোন একটা কাজ এই ক'মাসের জন্য পেয়ে যাও—

ক্যেরী একটু খুসী হয়, হার্স্টউড্ সমর্থন করেছে তার মতটাকে। সে বলে, চেষ্টা করলে বোধ হয় পেয়ে যেতে পারি।

ক্যেরীকে খুসী হতে দেখে হার্স্টউড্ একটু সাহস পায়। সে বলে, আমিও অবশ্য দেখছি, যা কিছু একটা পাই নিয়ে নেবো, কী বলো?

একদিন হার্স্টউড্ বেরিয়ে যাওয়ার পরে ক্যারী ওর ওয়ার্ডরোব খুলে সবচেয়ে ভালো পোষাকটা বার করে পরলো, তারপর অনেক যত্নে প্রসাধন সেরে ব্রডওয়ের দিকে বেরিয়ে পড়লো। এদিকটা ভাল চেনে না সে। তবু থিয়েটার-গুলো যখন এদিকেই, এজেন্টদের অফিসগুলোও এর কাছাকাছি হবে।

প্রথমে ম্যাডিসন স্কোয়ার থিয়েটারে গিয়ে খোঁজ নেওয়াই ঠিক করলো সে। বুকিং ক্লার্কটি বললো, থিয়েটারের এজেন্ট? কী জানি আমি তো বলতে পারছি না। 'ক্লিপারে' দেখুন ওখানে সব বিজ্ঞাপন থাকে।

—ওটা কি কোনো পত্রিকা?

ক্যারীর প্রশ্নে লোকটি অবাক হয়, এটাও জানে না মেয়েটি। সে বলে, হ্যাঁ কাগজওয়ালাদের কাছে খোঁজ করুন, ওখানে পাবেন।

ক্যেরী অনেকক্ষণ চেষ্টা করলো এজেন্টদের খুঁজে বার করতে। না এত সহজ নয় কাজটা। কাগজটা হাতে করে বাসায় ফিরে এলো সে।

হার্স্টউড্ ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে। সে বললো, কোথা গিয়েছিলে?

—থিয়েটারের এজেন্টদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ক্যেরীর চেহারা দেখে হার্স্টউডের সাহস হয় না আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে। ক্যেরীকে কাগজটা পড়তে দেখে সে জিজ্ঞসা করলো, কী দেখছো? ওটা কি কাগজ?

—'ক্লিপার'। একটা লোক বললো এই কাগজটায় সব বিজ্ঞাপন থাকে।

—তুমি কি এটা জানতেই ব্রডওয়ে পর্যন্ত গিয়েছিলে? কী মুস্কিল, আমিই তো জানতাম।

—তুমি বলোনি কেন? ক্যেরী মাথা না তুলেই জবাব দেয়।

—বাঃ, তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি আমাকে।

ক্যেরী আনমনাভাবে বিজ্ঞাপনের কলমগুলো হাতড়ায়। হার্স্টউডের ঔদাসীন্যে ওর মনটা খিঁচড়ে গেছে। লোকটা শুধু তার কষ্ট বাড়াবে, কোন সাহায্যেই আসবে না? কোন সহানুভূতিও নেই ওর? ক্যেরীর চোখে জল টলটল করে।

হার্স্টউড্ যেন লক্ষ্য করলো সেটা। বললে, আমাকে দাও কাগজটা, আমি দেখে দিচ্ছি।

ওর হাতে কাগজটা দিয়ে ক্যেরী বাইরে ঘরটায় গিয়ে বসলো একটু পরে ফিরে এলো সামলে নিয়ে।

হার্স্টউড্ একটা সাদা খামের ওপর পেন্সিল দিয়ে লিখ্ছিল। বললে, এই নাও, তিনটে পাওয়া গেছে।

ক্যেরী পড়ে দেখলো মিসেস্ বারমুডেজ, মার্কাস জেঙ্ক্স্, পার্সি উইল। তিনটে ঠিকানা লেখা রয়েছে পাশে। খামখানা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে। যেতেযেতেই বললো, এখুনি চলে যাই, দেখি।

ওকে বেরিয়ে যেতে দেখে হার্স্টউডের পৌরুষে একটু লাগলো।—আমি বসেই আছি!

টুপিটা হাতে নিয়ে হার্স্টউড্ আপন মনেই বললো, না, আমিও বেরুই, দেখি।

কোথায়ই বা যাবে। এমনি এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে লাগলো সে।

মিসেস্ বারমুডেজের ঠিকানাই সবচেয়ে কাছাকাছি। প্রথমে ক্যোরী ওখানেই গেলো। অফিসটা একটা ক্লাবের মধ্যে, সোবার ঘরটায় 'প্রাইভেট' লিখে অফিস করা হয়েছে হলঘরটাকে। ক্যোরী ঢুকতে গিয়ে লক্ষ্য করলো অনেক লোক এমনি ঘোরাফেরা করছে। কাজ নেই, এমনি মনে হলো।

খানিকক্ষণ বসে থাকার পর, প্রাইভেট-ঘরটা থেকে পুরুষালি চেহারার দুটি মহিলা বেরিয়ে এলো। সাদা-কলার, আর শক্ত হাতাওয়ালা আঁট-সাঁট পোষাক ওদের পরনে। ওদের দু'জনের পিছনে এলো বছর পঁয়তাল্লিশ বয়সের আর একটি মহিলা। একে দেখে একটু ভরসা হয় ক্যোরীর। অন্ততঃ অমায়িক হাসিহাসি মুখের ভাবটা তো' আছে।

পুরুষালি চেহারার একটি মহিলা বললো, দেখো ভুলে যেও না যেন।

হাসিমুখী মহিলাটি বলে, না, না। হ্যাঁ, ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহটা কোথা থাকছ তুমি?

—পিট্‌স বার্গে।

—আচ্ছা আমি চিঠি লিখবো তোমাকে।

—'আচ্ছা' বলে সেই মহিলা দু'টি বেরিয়ে গেলো।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটির চোখের দৃষ্টি প্রখর গম্ভীর হয়ে উঠলো। ক্যোরীকে দেখে বললো, কী চান আপনি বলুন।

—আপনিই কি মিসেস্ বারমুডেজ?

—হ্যাঁ।

ক্যোরী একটু ইতস্ততঃ করে বলে, আপনি কি থিয়েটারে নামার জন্যে কাজ খুঁজে দেন?

—হ্যাঁ।

—আমার জন্য একটা দিতে পারেন জোগাড় করে। ক্যোরী কী করে গুছিয়ে কথা বলবে ভেবে পায় না।

—কোন অভিজ্ঞতা আছে?

—সামান্য।

—কার সঙ্গে প্লে করেছেন আগে ?

ক্যেরী বলে, না এমন কারো সঙ্গে না, এমনি একটা চ্যারিটি শো—

বাধা দিয়ে মহিলাটি বলে, ও, তাই তো এখন তো কিছু নেই।

ক্যেরী দমে যায়।

মিসেস্ বারমুডেজ বলে, নিউ-ইয়র্কের অভিজ্ঞতা থাকা চাই, তবে চাকরী মিলবে। আচ্ছা, তা যাই হোক। আপনার নামটা লিখে রাখছি আমি। দেখি পরে যদি কিছু—।

মহিলাটি ভিতরে ঢুকে যেতে একটি মেয়ে কাউণ্টার থেকে বলে, আপনার ঠিকানাটা।

এগিয়ে গিয়ে ক্যেরী বলে, মিসেস্ হুইলার। ঠিকানাটা লিখে নেয় মেয়েটি। ক্যেরী আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।

মিঃ জেঙ্কসের অফিসেও ঠিক এমনি কথাই হলো। শুধু শেষে জেঙ্কস বললো যদি এমনি কোন মফঃস্বলের হাউসেও প্লে করেন, আর তার প্রোগ্রামটা, মানে, আপনার নামটা এনে দিতে পারেন, তা' হলে বোধহয় কিছু করতে পারি আমি।

এবার শেষ ভরসা। পার্সি উইল জিজ্ঞাসা করলো, কী ধরণের কাজ চান আপনি ?

ক্যেরী বুঝতে পারলো না, বললে, কী জানতে চাইছেন আপনি, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

লোকটি বলে, মানে আপনি কি কোন কমেডিতে নামতে চান, না এমনি যা হোক কিছু, না কোরাস্‌গার্ল ?

ক্যেরী বলে, যে কোন একটা পার্ট চাই আমি।

—তাতে তো বেশ কিছু দিতে হবে আপনাকে।

ক্যেরী বলে, কত ;—আশ্চর্য্য টাকা যে লাগবে একথাটা তার মনেই হয়নি।

লোকটি চতুর ভাবে বলে, সে তো আপনার উপর নির্ভর করছে। আপনিই বলুন।

ক্যেরী ওর দিকে অবাক হয়ে তাকায়। কেমন করে আর আলাপটা চালানো

যায় মাথায় ঢোকে না তার। অনেক ভেবে বলে, আচ্ছা টাকা দিলে পার্ট পাইয়ে দিতে পারবেন আমাকে ?

—না পারলে টাকা ফেরৎ পাবেন আপনি।

ক্যেরী বলে, ও।

এজেন্টটি বুঝতে পেরেছে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ক্যেরী। সেই ভাবেই কথা চালায় সে।

—দেখুন পঞ্চাশ ডলার দিতে হবে আপনাকে। এর কমে কে আপনার জন্যে কষ্ট করবে বলুন।

ক্যেরী যেন এতক্ষণে ধাতস্থ হলো। সে ধন্যবাদ দিয়ে বললো, আচ্ছা ভেবে দেখি একটু।

বেরিয়ে যেতে গিয়ে আবার ফিরে এলো সে। জিজ্ঞাসা করলো, কতদিনের মধ্যে চাকরী পাবো আমি তা'হলে ?

—সেটা ঠিক বলা শক্ত। এক সপ্তাহেও হয়ে যেতে পারে, একমাসও লাগতে পারে। আপনার উপযুক্ত একটা কিছু পেলেই আপনার জন্যে ব্যবস্থা করবো আমরা।

আচ্ছা, বলে একটু হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্যেরী বেরিয়ে এলো।

পার্সি উইল একটু তাকিয়ে দেখলো তাকে, তারপর আপন মনেই বললো, স্টেজে নামার জন্য মেয়েগুলো যেন পাগল।

পঞ্চাশ ডলার দিতে হবে শুনে অনেক সাত পাঁচ ভাবে ক্যেরী। যদি টাকাটা মেরে দেয় ওরা ? তারপর ভাবে তার টুকরো টাকরা যা দু'একটা গহনা আছে বিক্রী করে বা বাঁধা দিয়ে পঞ্চাশ ডলার সহজেই পাওয়া যেতে পারে।

হার্স্টউড্ আগেই ফিরে এসেছে। এতক্ষণ ধরে ক্যেরী চাকরী খুঁজে বেড়াবে, সে মোটেই ভাবে নি।

বলে, তারপর ? কিছু খোঁজখোঁজ পেলে ? ক্যেরী গ্লাভস্‌টা খুলতে খুলতে বলে, না আজ কিছু হয় নি। সবাই টাকা চায়।

—কত চাইলো ?

—পঞ্চাশ ডলার।

—আর কিছু, নয় তো?

—সবাই সমান। টাকা তো না হয় দিলাম, তারপর যদি না করে তারা?

—হ্যাঁ, সে হিসেবে টাকাটা দেওয়া একটু গোলমেলে ব্যাপারই তো। যেন টাকাটা হাতে নিয়ে সে ভেবে দেখছে দেবে কি দেবে না।

ক্যেরী বলে, তাইতো, ভাবছি, দু'একজন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবো।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা? শুনে আজ আর চমকে উঠলো না হার্স্টউড্। শুধু রকিং চেয়ারটা দোলায়। হাতের একটা আঙুল কামড়ায়।

এমন একটা চরম অবস্থায় সব কিছু মেনে নিতে হয়। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

সাতাশ

পরের দিন আবার বেরুলো ক্যেরী। এবার ক্যাসিনো। এখানে ক্যেরী বুঝতে পারলো কোরাস্ গার্লের চাকরীও এমন কিছু সহজ লভ্য নয়। মোটামুটি সুন্দরী মেয়ের সংখ্যাই কী কম? শুধু চেহারটা দেখে ওরা। অন্য কোন গুণাগুণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

ক্যাসিনোয় গিয়ে গেট-কীপারকে জিজ্ঞাসা করলো ক্যেরী, মিঃ গ্রে-কে কোথায় পাওয়া যাবে এখন?

লোকটি বললো, এখন দেখা হবে না।

—কখন হতে পারে?

—আগের থেকে কোন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে?

—না।

—তা'হলে অফিসে যান।

ঠিকানাটা নিয়ে ক্যেরী ভাবলো এখন অফিসে গিয়ে কোন লাভ নেই। পাওয়া যাবে না মিঃ গ্রে-কে।

এ সময়টা কী আর করা যায়? আরো কয়েকটা জায়গায় ঘুরলো সে। ঘোরাই সার। মিঃ ড্যালি আগের থেকে সময় ঠিক করে না এলে দেখা

করেন না। তাও ক্যেরী জানতে পারলো ঘণ্টাখানেক ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর।

এম্পায়ার থিয়েটার, লাইসিয়াম। একটা গম্ভীর অশোভন পরিবেশ। কী চাই, সোজাসুজি স্পষ্ট করে বলে ফেলো, আমাদের সময় নেই দেখছো না? এমনি একটা ভাব সবার ভঙ্গীতে।

ক্যেরী ফিরে এলো হতাশ হয়ে। হার্স্টউড্ খুঁটিয়ে শোনে ক্যেরীর অভিযান-কাহিনী।

—কারো সঙ্গেই দেখা হলো না। শুধু এখানে ওখানে ঘুরলাম আশায় আশায়।

হার্স্টউড্ কী আর বলবে?

ক্যেরী খানিক পরে বলে, কেউ একজন জানাশোনা না থাকলে খুব মুস্কিল।

আরো তিনদিন চেষ্টা করার পর ক্যাসিনোর ম্যানেজারের দেখা পেলো ক্যেরী। বললেন, আস্ছে সপ্তাহের প্রথমদিকে আসবেন, কিছু বদ্লান হবে, ভেবে দেখবো তখন।

মোটা-সোটা স্বচ্ছল জীবনের প্রতীক লোকটি। মেয়েমানুষ তাঁর কাছে মেয়ে-মানুষই। ক্যেরীর চেহারাটা ফিগারটা ভালই মনে হচ্ছে। অভিজ্ঞতা থাক না থাক, ওকে হয়তো নিয়ে নেওয়া যায়। মালিকরা বলছিলেন সখীদের চেহারাগুলো বেশ চমকদার নয়।

পরের সপ্তাহের এখনো দেরী আছে। এদিকে মাস শেষ হয়ে এলো। ক্যেরী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

একদিন সে হার্স্টউডকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা তুমি কি সত্যিই চেষ্টা করছো তো, না?

হার্স্টউড্ চটে যায় ইঙ্গিতটা বুঝে, বাঃ কে বললে করছি না?

ক্যেরী বলে, আমি হলে যা পাই তাই নিয়ে নিতাম। এদিকে মাস শেষ হয়ে গেলো।

ক্যেরী হতাশায় ভেঙে পড়ে।

হার্স্টউড্ কাগজটা রেখে উঠে পড়লো, তারপর বেরিয়ে গেলো। দেখি, আজ একটা চেষ্টা করতেই হবে। মদের কারখানায় হয়, তাই সই। তাই দেখবে সে চেষ্টা করে।

ঠিক আগের মত। দু'একটা জায়গায় ধাক্কা খেয়ে ওর প্রতিজ্ঞাটা উপে গেলো। নাঃ বাসায় ফিরে যাওয়াই ভালো।

হঠাৎ মনে হয় আর ক'টা মাত্র টাকা আছে! হার্স্টউড্ তার পোষাকের দিকে তাকিয়ে দেখে, সবচেয়ে ভালো স্যুটটাও কেমন অতি-সাধারণ নগণ্য দেখায়।

ক্যেরী ফিরে এসে বললো, অপেরা পার্টির ক'জন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে এলাম। সবাই অভিজ্ঞ লোক চায়।

· হার্স্টউড্ বলে, আমি দু'একটা মদের কারখানায় গিয়েছিলাম। একজন বলেছে দু'তিন হপ্তার মধ্যে একটা চাকরী দেবে।

একটা কিছু বলতে হবে, একটা কিছু চেষ্টার কথা, একটা কোন আশার কথা বলতে হবে তাকে, তাই এই মিথ্যাচার।

সোমবারে ক্যেরী আবার ক্যাসিনোয় গেল। ম্যানেজার ওরদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আজ কি আসতে বলেছিলাম আপনাকে?

—ঠিক আজ না, আপনি বলেছিলেন এই সপ্তাহের প্রথমে।

—তীক্ষ্ণভাবে প্রশ্ন করে লোকটি, আগে কোথাও করেছেন?

ক্যেরী স্বীকার করে, না।

লোকটি কাগজ ঘাঁটতে ঘাটতে বলে, ও, কাল আসবেন সকালে, দেখা যাবে। লোকটি মনে মনে খুসী হয়েছে ক্যেরীর চেহারায়।

ক্যেরীর বুকটা যেন লাফিয়ে উঠলো। কোনমতে সে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

ক্যেরী বুঝতে পেরেছে লোকটি চায় ওকে। চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায় ও। সত্যি কি চাকরী একটা দেবেন ভদ্রলোক?

চিন্তায় বাধা পড়লো ক্যেরীর। হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে ম্যানেজার বললে, ঠিক সময়ে আসা চাই। না হলে বাদ পড়ে যাবেন।

ক্যেরীর পা দু'টো যেন মাটিতে পড়ে না। হার্স্টউড্ বেকার অলস বলে

আজ আর ঝগড়া করবে না সে। ওর একটা চাকরী হয়েছে। চাকরী পেয়েছে সে। বাড়ীতে গিয়েই বলবে সে হার্স্টউডকে। কিন্তু বাড়ী যাওয়ার পথে আর একটা কথা মনে পড়লো তার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে একটা চাকরী পেয়ে গেলো। আর হার্স্টউড্ মাসের পর মাস চুপ করে বসে আছে। কেন সে জোগাড় করে নেয় না একটা কিছু? আমি যদি পারি, সে পারে না? একি একটা কথা!

ক্যেরী ভুলে যায় তার চেহারা তার যৌবনের কথা। বয়সের বাধার কথা তার মনে ওঠে না।

তবু সে কথাটা গোপন করতে পারলো না। উদাসীন হয়ে থাকার চেষ্টা করলে কী হবে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হার্স্টউড্ কিছু একটা বুঝতে পারে।

—কী, ব্যাপার?

—একটা চাকরী পেয়েছি।

হার্স্টউড্ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে টেনে টেনে আরাম করে—য়্যাঁ, তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—কী চাকরী?

—কোরাসে।

—সেই যে ক্যাসিনোর কথা বলছিলে, সেখানে?

ক্যেরী বলে, হ্যাঁ, কাল থেকেই রিহার্শাল। বাড়তি খবরটা ক্যেরী বলে মনের আনন্দে।

শেষে হার্স্টউড্ টাকার কথাটা জিজ্ঞাসা করে। কত করে পাবে? বলছে কিছু?

—না, আমি ঠিক জিজ্ঞাসাও করিনি। মনে হয় বারো চোদ্দ ডলার দেবে হপ্তায়।

হার্স্টউড্ বলে, হ্যাঁ, এইরকমই হবে।

সেদিন রাত্রে রান্নার আয়োজনটা ভালভাবেই হলো। হার্স্টউড্ দাড়িটা কামিয়ে এসে অনেক স্বস্তি বোধ করলো। আপন মনে বললো, নাঃ এবার আমাকেও ভালো করে একটা কিছু ধরতে হবে।

পরের দিন সকালে ক্যোরী ঠিক সময়েই হাজির হলো।

রিহার্শাল হবে স্টেজেই। ফাঁকা বিরাট হল্‌টায় গত রাত্রির গন্ধ-উচ্ছ্বাস এখনো জড়ানো আছে যেন। ক্যোরী আশ্চর্য্য হয়ে তাকিয়ে দেখে, অনুভব করে নাট্যশালার ঐশ্বর্য্য। সাধারণ জীবন থেকে অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। নাট্য-শালার ধনৈশ্বর্য্য অসাধারণত্বের প্রতীক। নগণ্য ক্ষুদ্রের স্থান নেই এখানে। ক্যোরীকে এর উপযুক্ত হতে হবে। অবাক বিস্ময়ে সে বোঝবার চেষ্টা করে নাট্য-জগৎটাকে। আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্রস্থল এই নাট্যশালা। আজ থেকে ক্যোরী এই আনন্দ কেন্দ্রের একটি অংশ হয়ে গেলো।

ড্রিল করতে করতে ম্যানেজার শুধোলো, আপনার নাম?

ক্যোরী উত্তর দেয়, ম্যাডেণ্ডা, ক্যোরী ম্যাডেণ্ডা।

লোকটি বেশ ভদ্রভাবেই বলে, আচ্ছা, মিস্‌ ম্যাডেণ্ডা, আপনি এইখানে দাড়ান।

তারপর একজন মেয়েকে বলে, মিস্‌ ক্লার্ক, তুমি এর জুড়ী হবে যাও।

মেয়েটি এগিয়ে এলো, ক্যোরী দেখাদেখি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। এর পর রিহার্শাল শুরু হলো।

রিহার্শালটা আভেরি হলের মতই। তবে এখানে পরিচালকের ভঙ্গীটা আরো একটু কর্ত্তৃত্ব ব্যঞ্জক। একটু যেন রূঢ়। অত্যন্ত ছোট-খাট খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে সে চেঁচামেচি করে। মর্য্যাদাজ্ঞান বা নিরীহতা সে এইসব মেয়েদের মধ্যে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। যেন ঘৃণা করে এ দু'টো গুণকে।

বলে, ক্লার্ক পা মিলিয়ে চলো, হাঁ করে আছ কেন?

—চার জন করে, ডাইনে, আঃ, ডাইনে। ডাইনে বলছি আমি।—চীৎকার করে ওঠে সে।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে গলা ফেড়ে, মেট্‌ল্যাণ্ড, মেট্‌ল্যাণ্ড।

একটি নার্ভাস গোছের মেয়ে এগিয়ে আসে। মেয়েটির জন্যে ক্যোরীই ভয়ে কাঁপে।

আজ্ঞে, মেয়েটি বলে।

—তোমার কি কানের কোন দোষ আছে?

—আজ্ঞে না।

—যা বললাম কথাটার মানে কি তুমি জানো না ?

—জানি স্যার।

—তবে ডানদিকে হোঁচট খাচ্ছিলে কেন ? লাইনটা ভেঙে দেবার মতলব করছিলে ?

—না স্যার, আমি—

—না স্যার, খেঁকিয়ে ওঠে ম্যানেজার। কান দু'টো খাড়া করে ভালো করে শুনো কী বলছি আমি।

ক্যোরী নিজের কী হবে তাই ভেবে কাঁপে এবার। এবার আর একজনের পালা।

হাত দু'টো যেন ছুঁড়ে ফেলে পরিচালক বলে, দাঁড়াও, থামো সব।

রুক্ষ গলায় গর্জ্জন করে ওঠে, এল্‌ভার্স। তোমার মুখে কী ওটা ?

মিস্ এল্‌ভার্স বলে, কিছু না স্যার। অন্যেরা ভয়ে ভয়ে হাসবার চেষ্টা করে।

—তবে কি কথা বলছিলে ?

—না স্যার।

—তবে ? মুখটা বন্ধ করে থাকতে পারো না ?

—হ্যাঁ, স্যার।

দাঁড়াও সবাই, পরিচালক আবার হাঁক দেয়।

এরপর ক্যোরী। সব কিছু ভাল করতে গিয়েই বিপত্তিটা বাধলো তার।

পরিচালক ডাকলো, ম্যাসন, মিস্ ম্যাসন।

ক্যোরী তাকিয়ে দেখে কাকে ডাকছে। পাশের মেয়েটি ঠেলা দেয় ওকে। ক্যোরী কিন্তু বুঝতে পারে না।

পরিচালক ফেটে পড়ে এবার, তুমি, তুমি। তুমি কী শুনতে পাও না ?

ক্যোরী যেন লজ্জায় মরে যায়, ওর মুখ থেকে বেরোয়, য়্যাঁ ?

তোমার নামটা কি ম্যাসন নয় ?

—আজ্ঞে না স্যার, আমার নাম ম্যাডেণ্ডা স্যার।

—অ, তোমার পায়ে কী হয়েছে ? তুমি কি নাচোনি কখনো ?

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে নাচছো না কেন। থপ্ থপ্ করছো কেন ব্যাঙের মতন? একটু জ্যান্ত মানুষের মত হাত পাগুলো নাড়াও না।

ক্যেরী লজ্জায় লাল হয়ে যায়, বলে, হ্যাঁ স্যার।

তিনটে ঘণ্টা এমনি করে কাটলো। ফেরার পথে ক্যেরীর হাত-পাগুলো যেন অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু উত্তেজনায় ক্যেরী সেটা লক্ষ্যই করে না। সে মনে মনে ভাবে বাড়ীতে গিয়ে আবার প্র্যাক্‌টিস্ করবে সে স্টেপগুলো। আর কোনোবার ভুল হবে না তার।

হার্স্টউড্ তখনো ফেরেনি। বোধ হয় কাজ খুঁজছে। ক্যেরী কোনমতে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে প্রাক্‌টিস শুরু করে? ক্লান্তি নেই। আনন্দ উত্তেজনায় সব মুছে গেছে।

হার্স্টউড্ ফিরতে ওকে খেতে দিতে হলো, বাধা পড়লো ক্যেরীর। বিরক্ত হয়, প্র্যাক্‌টিসও করতে পারে না সে। সারাদিনের পরিশ্রম, প্র্যাক্‌টিস, তারপর আবার সংসারের কাজ। এতগুলো সম্ভব হবে না তার দ্বারা। চাকরীটা পাকা হয়ে গেলেই বাসার রান্না বন্ধ করে দেবে সে। বাইরেই খাবে।

সখীর দলে নাচাটা এমন কিছু মজার ব্যাপার নয়। ক'দিনেই টের পেয়ে গেল ক্যেরী। পরিচালকের দাঁত খিঁচুনি, আর অসহ্য পরিশ্রম। তারপর মাইনেটা বারো ডলারই ঠিক হলো। আরো ক'দিন পরে থিয়েটারের গণ্যমান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের দেখতে পেলো সে। ওদের কেমন সমীহ করে চলে সবাই। ওরা অন্য জগতের মানুষ। ক্যেরী কিছুই না।

এদিকে হার্স্টউড্ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দিনের পর দিন। কিছুই করে না, কোথাও যায়ও না। শুধু ক্যেরীকে খোঁচায়, কতদূর এগোলো। কেমন হচ্ছে? উন্নতির আশা আছে কিছু? এমনভাবে প্রশ্নগুলো করে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় ওর নিজের কিছু করার ইচ্ছে নেই। ক্যেরীর উপার্জ্জনেই খাবে সে বসে বসে।

ক্যেরী বিরক্ত হয়, উদ্বিগ্ন হয় কিন্তু যত স্বাধীনই সে হোক হার্স্টউডকে

কঠিন কথা সে বলতে পারে না ড্রুয়েরর মত। সমানে সমানে কথা বলা যায় না ওর সঙ্গে। ওর মধ্যে কোথাও একটা প্রচ্ছন্ন শক্তি লুকনো আছে। ক্যেরী ওকে সমীহ না করে পারে না।

একদিন খানিকটা মাংস কিনে এনে হার্স্টউড বললো, কিছু জমানোর চেষ্টা করতে হবে এবার। সপ্তাহখানেক তো তুমি এখন কিছু পাবে না বোধ হয়।

ক্যেরী একচিত্তে কী একটা নাড়ছিল, বললো, না। হার্স্টউড বললো, আমার কাছে ভাড়া বাদে আর মাত্র তের ডলার মতো আছে।

ক্যেরী মনে মনে ভাবে, ও তাই। এর পর থেকে আমাকেই খরচা চালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তার কয়েকটা জিনিষ কিনবে ভেবেছিলো সে। কাপড়জামা কিছু চাই-ই। হ্যাট্ও একটা নতুন হলে ভালো হয়। বারো ডলারে এই ফ্ল্যাটের সব খরচা তো চলবে না। ও কেন কিছু একটা করেছে না?

প্রথম অভিনয়ের দিনটা এগিয়ে এলো। ক্যেরী হার্স্ট'উডকে যেতে বললো না। হার্স্টউড্ও যাওয়ার কথা ভাবলো না। কী হবে ক'টা টাকা খরচ করে। ক্যেরীর তো ছোট্ট একটু সখীর পার্ট।

পোস্টার পড়ে গেছে। গণ্যমান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে।

ক্যেরী কে? সে কিছুই না।

চিকাগোর মতই স্টেজে ঢোকার সময় যত এগিয়ে আসে ক্যেরী তত কাঁপে। তারপর একসময়, সময় এসে গেলো। চরম মুহূর্ত্তে আর কিন্তু সে কাঁপলো না। এত ক্ষুদ্র নগণ্য যে, কি আসে যায়? কে লক্ষ্য করছে? এই হতাশ চিন্তাটাই ওর ভয় কাটিয়ে দিলো শেষ পর্য্যন্ত। 'ভাগ্যক্রমে ওর পোষাকটা লজ্জাকর হলো না। পা পর্য্যন্ত স্কার্ট রইলো ওর, বেঁচে গেলো সে।

স্টেজে নেমে নাচতে নাচতে গান গাওয়ার মধ্যেও ক্যেরী একবার লক্ষ্য করে নেয় দর্শকদের। হাততালি পড়লো বহুবার। কিন্তু ক্যেরী লক্ষ্য করলো গণ্যমান্যরা কতটুকুই বা তার দাবী করতে পারে। এমন কিছু অসাধারণ শক্তিশালী অভিনয় ওরা মোটেই করে না।

অনেকবারই সে মনে মনে বলে, আমি ওদের চেয়ে এ জায়গাটা অনেক ভাল করতে পারতাম।

অভিনয়ের শেষে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় বদলে নিলো সে। পরিচালক ক'জনকে ডেকে ধমকালো ওকে কিন্তু কিছু বললো না। ক্যেরী ধরে নেয় ওর নিশ্চয় ভালোই হয়েছে।

বাইরে অনেক গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। অনেকগুলি যুবক ঘোরাফেরা করছিল। একটু চোখ টিপলে বা একটু কারো দিকে তাকালে অনেক সঙ্গ জুটে যেতে পারতো ক্যেরীর। সে কিন্তু সে সব কিছুই করলো না।

একটি সাহসী যুবক এগিয়ে এলো নিজে থেকেই।—আপনি একা বাড়ী যাচ্ছেন?

ক্যেরী কোন কথা না বলে দ্রুত পা চালিয়ে চলে আসে। প্রথম পাব্‌লিক স্টেজে নামার উত্তেজনায় সে মশগুল। অন্য কোনোদিকে নজর দেবার তার অবকাশ নেই।

সপ্তাহের শেষের দিকে হার্স্টউডকে জিজ্ঞাসা করে ক্যেরী, কোন খবর পেলে সেই মদের কারখানাটা থেকে?

কিছুই না, শুধু হার্স্টউডকে কাজের চেষ্টার জন্যে খোঁচানো।

হার্স্টউড্ বলে, না, এখনও ঠিক হয়নি ওদের। তবে ওখানে একটা হয়ে যাবে ঠিক।

ক্যেরী আর কোন কথা বলে না। মনে মনে ফোঁসে সে।

হার্স্টউড্ জানে ক্যেরীর প্রকৃতি। নরম স্বভাবের সৎ মেয়ে সে। তারও লজ্জা হয় এমন করে বসে বসে খেতে। কিন্তু সে তো আর চিরকাল এমনি থাকবে না। কাজ একটা জুটবেই। মাঝে কিছুদিন শুধু ক্যেরী চালিয়ে দিক।

হার্স্টউড্ ঠিক করে টাকা চাইবে এবার। ভাড়া দেবার দিনেই ভালো সুযোগ।

টাকাটা গুণে দিতে দিতে সে বললো, এই শেষ। শীগ্রি কিছু না পেলে তো আর—

ক্যেরী বোঝে এবার টাকা চাইবে সে। কোন কথা বলে না।

হার্স্টউড্ বলে, আর কিছুদিন যদি চলে যায়, আমার একটা কিছু হবেই। ড্রেক তো সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিশ্চয়ই খুলবে হোটেলটা।

এখনো একমাস। ক্যেরী বলে, সত্যি খুলবে নাকি?

এবারে হার্স্টউড্ সোজাসুজি অনুনয়ের স্বরে চেয়ে বসে, আচ্ছা, সে ক'দিন তুমি সাহায্য করতে পারো ক্যেরী? তারপর আমি বলছি, আবার ঠিক হয়ে যাবে।

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় মুহ্যমান ক্যেরী। বলে, না। ঠিক আর হবে না বোধ হয়। আমার মনে হয় একটু হিসেব করে চালালে, আমাদের ঠিক চলে যাবে। আমি তোমাকে দিয়ে দেবো এর পরে টাকাটা।

হার্স্টউডকে অনুনয় করতে দেখে ক্যেরীর দয়া হয়। তবু নিজের টাকায় নিজের কিছু করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ হয় সে। বলে, আচ্ছা, দেবো আমি।

তারপর বলে, আচ্ছা এই, এ-ক'দিন যাহোক একটা কিছু করো না তুমি? কী যায় আসে তাতে? পরে ভালো কিছু পেলে আবার ছেড়ে দেবে না হয়।

হার্স্টউড্ আশ্বস্ত হয়েছে। তবু আহত সুরে সে বলে, পেলে তো নেবোই। কুলিগিরি করতেও পিছ্‌পা নই আমি। কে চেনে এখানে আমাকে?

ক্যেরীরও দুঃখ হয় ওর কথা শুনে। বলে, না, না, তা কেন করতে যাবে তুমি। ভদ্রলোকের কাজও তো অনেক পাওয়া যায়।

হার্স্টউড্ যেন প্রতিজ্ঞা করে বলে, একটা কিছু জোগাড় করবই আমি।

তারপর কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে বসে।

আটাশ

হার্স্টউড্ প্রতিজ্ঞাটা সেদিন করে বসলো বটে, কিন্তু তারপর আর তার কোন চাড় দেখা গেলো না। আজকের দিনেই যে কাজ পেতে হবে এমন তো আর সে প্রতিজ্ঞা করে বসেনি। রোজই এই কথাই ভাবে সে, আর একটা করে দিন কেটে যায় আলস্যে। ক্যেরী এদিকে মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠে। যতই ওর মনে হয় তার টাকায় সে কিছুই কিনতে পারবে না নিজের জন্যে, ততই তার গহনাপত্র প্রসাধন আর ভালো পোষাকের আকাঙ্ক্ষাটা তীব্র হয়ে ওঠে।

হার্স্টউড্ যেদিন তার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছিল সেদিন সত্যই তার মনে অনুকম্পা জেগেছিল। ক'টা দিন কেটে যাওয়ার পর তার কিন্তু চিহ্নও আর নেই আজ। আজ শুধু মনটা জুড়ে আছে ভালভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা।

হার্স্টউডের পুঁজি যখন দশ ডলারে এসে ঠেকলো হঠাৎ তার মনে হলো রোজ রোজ ক্যেরীর কাছে গাড়ীভাড়া, দাড়ি কামানোর জন্য তো টাকা চাওয়া যাবে না এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভাল। সেই মুহূর্ত্তে সে বলে ফেললো তার কাছে এক কপর্দ্দকও আর নেই।

ক্যেরী বিশেষ গায়ে মাখলো না কথাটা, বললো পার্শে আছে নিয়ে নাও। সে লক্ষ্যও করলো না নতুন দায়িত্বের এই সবে শুরু হলো। ছোট-খাট খরচগুলো ক্যেরীই দিতে লাগলো। একদিন বিকেলবেলা ক্যেরী বললো, দেখো আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, তুমি ময়দা আর আধপাউণ্ডখানেক মাংস নিয়ে এসো।

হার্স্টউড্ বললো, অত লাগবে না। কোয়ার্টার পাউণ্ডেই চলে যাবে আমাদের।

ক্যেরী আধ ডলার দিয়ে গেলো হার্স্টউডকে।

হার্স্টউড্ সস্তাদরে খুঁজে খুঁজে আনলো জিনিষ দু'টো, তারপর বাকী যা রইলো বাইশ সেণ্ট রেখে দিলো রান্নাঘরের তাকে। ক্যেরী ফিরে এসে খুচরো পয়সাগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলো। আহা, ও শুধু দু'মুঠো খেতে চায় আর কিছুই না। ক্যেরী কি নিষ্ঠুর। এরই জন্যে সে গুমরে মরছিলো। হার্স্টউড্ লোকটা আসলে ভালই, সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করছে। একটা কিছু জুটিয়ে নেবে ঠিক।

সেদিনই সন্ধ্যায় কিন্তু ক্যেরী যখন তার এক সঙ্গিনীকে দেখলো নতুন জামা পরতে ওর মনটা আবার বিগড়ে গেলো।

—ও তো এই মাইনেতেই বেশ ভালো জামা পরতে পারে। আমিও পারতাম যদি টাকাটা সংসারে দিতে না হতো সব। একটা টাই-ও নেই আমার। ক্যেরী মনে মনে চিন্তা করে। পায়ের দিকে অন্যমনস্কভাবেই তাকায়, জুতোটা কি বিশ্রী হয়ে গেছে। তারপর মনে মনে বললো সে, আসছে শনিবার জুতোটা কিনবোই আমি। যা হয় হোক।

ওদের দলের মধ্যে একটি নিরীহগোছের মেয়ের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেলো ক্যোরীর। বোধ হয় ক্যোরীর মধ্যে ভয় করার কিছু নেই বলেই ও সাহস করে বন্ধুত্ব করতে এলো। নীতি বা রুচি হয়তো ওর আর সবার মতই, তবু সঙ্গীর সঙ্গে ওর ব্যবহারটা মিষ্টি। ওদের অনবসর কাজের মধ্যে কথাবার্তা গল্প আলাপের অবকাশ প্রায় মেলেই না তবু এরই মধ্যে কথা বলে ওরা।

মেয়েটি বলে, আজ বেশ গরম, না?

ক্যোরী খুসী হয় ওর সঙ্গে কথা বলায়, বলে হ্যাঁ বেশ গরম লাগছে।

ক্যোরী দেখে মেয়েটির কপালে স্বেদবিন্দু জমেছে। মেয়েটি বলে, ওহ্, এই বইটায় যা নাচতে হচ্ছে, সারা জন্মেও এমন খাটতে হয়নি আমাকে।

ক্যোরী অবাক হয়, ও তুমি তাহলে অন্য বইয়েও নেমেছ?

মেয়েটি বলে, অনেক, অনেক। তুমি নামোনি এর আগে?

ক্যোরী বলে, না, এইতো আমার প্রথম।

—তাই নাকি! আমার যেন মনে হচ্ছিল 'কুইন্‌স মেট্' বইটায় তোমায় দেখেছিলাম।

—না তো। সে তাহলে অন্য কেউ।

সেদিন আলাপে ছেদ পড়লো এখানেই। অর্কেষ্ট্রা বেজে উঠলো। পরের দিন মেয়েটি স্টেজে নামবার ঠিক আগে আবার এসে ক্যোরীর পাশে দাঁড়ালো।

—শুনেছো, বইটা নাকি টুরে নিয়ে বেরুবে।

ক্যোরী বলে, তাই নাকি, শুনিনি তো।

—হ্যাঁ, আমি শুনলাম। তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

—কীজানি, যদি নিয়ে যায়—।

—নেবে না আবার। ঠিক নেবে তোমাকে। আমি কিন্তু যাবো না ভাই। বেশী তো আর দেবে না, নিজের খেতেপরতেই সব খরচ হয়ে যাবে। আমি কখনো বাইরে যাই না। এখানে অনেক বই চলছে এখন।

—তুমি কি চট্‌পট্ অন্য জায়গায় কাজ পেয়ে যাও?

—তা পাই আমি। ব্রডওয়েতে একটা বই চল্‌ছে, ভাবছি দেখি চেষ্টা করে, ঢুকে পড়বো ওখানে।

ক্যেরী খবরটা আগ্রহ নিয়ে শোনে। একবার ঢুকলে তাহলে এ লাইনে চাকরী পাওয়া কিছু কঠিন নয়। এটা চলে গেলে সেও হয়তো আর একটা জোগাড় করে নিতে পারবে।

—আচ্ছা ওরা কি সব এই মাইনেই দেয়?

—এতো দেবেই। কখনো কখনো বেশীও পাওয়া যায়। এই কোম্পানীটা ভাল দেয় না।

ক্যেরী বলে, আমাকে বারো ডলার দেয়।

মেয়েটি বলে, বলো কী? আমিতো পনের পাই। অথচ তুমি আমার থেকে অনেক বেশী খাটো। আমি হলে তো ছেড়ে দিতাম। কম দিচ্ছে, এরা জানে যে তুমি নতুন লোক কিনা, অতশত জানো না। তোমার অন্তত পনের তো পাওয়া উচিত।

—পাচ্ছি কৈ?

—অন্য আর একটায় গেলে নিশ্চয়ই বেশী পাবে এর চেয়ে।

মেয়েটি ক্যেরীকে পছন্দ করে। বলে, তুমি বেশ ভালো নাচো। কোম্পানীও তা জানে। কথাটা সত্যি। ওর ভঙ্গীতে এমন একটা মাধুর্য্য আছে সবারই সেটা চোখে পড়ে, ভালো লাগে।

ক্যেরী বলে, আচ্ছা ব্রডওয়েতে গেলে বেশী পাবো এর চেয়ে, বলছ তুমি?

মেয়েটি বলে, নিশ্চয়ই। তুমি আমার সঙ্গে যেও বরং কথাবার্ত্তা আমিই কইবো না হয়।

ক্যেরী কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানায়। মেয়েটি কত অভিজ্ঞ। ক্যেরী ভাবে, এভাবে যদি কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে, কে আমাকে রুখ্‌বে? আমার পথ আমি নিশ্চয়ই করে নিতে পারবো।

কিন্তু সকালে যখন রান্না করতে হয়, ঘর পরিষ্কার করতে হয়, বাসন পত্র ধুতে হয় আর হার্স্টউড্‌ নিরুদ্বেগে বসে থাকে সামনে, তখন ওর মনটা আবার দমে যায়। হার্স্টউড্‌ যে ভাবে হিসেব করে সংসার চালায় তাতেও খাওয়াটা বাদে কোনরকমে ভাড়াটাই দেওয়া যায়, তারপর আর কিছু থাকে না। ক্যেরী

এবার সত্যিই জুতো আর দু'একটা টুকিটাকি কিনে ফেললো। ভাড়া দেওয়ার সময় ওর খেয়াল হলো টাকা কম পড়ে যাচ্ছে।

—ঈস্, ভাড়ার টাকা পুরো নেই যে। হার্স্টউড্ বললো, কত আছে তোমার কাছে?

—বাইশ ডলার আছে, তারথেকে এ-সপ্তাহের খরচ চালাতে হবে। আস্‌ছে হপ্তার টাকা থেকে এগুলো দিলে পরের হপ্তা চলবে কী করে? তোমার সেই বন্ধুটি কি এ-মাসে হোটেলটা খুলবে?

হার্স্ট উড্ বলে, তাইতো কথা, বলেছে তো।

একটু ভেবে হার্স্টউড্ আবার বলে, সেজন্যে ভেবো না তুমি। মুদীকে বলে সামনের হপ্তাটা চালিয়ে নেওয়া যাবে। এতদিন জিনিষ নিচ্ছি আমরা, দু'এক হপ্তাও আর বিশ্বাস করবে না।

ক্যেরী বলে, করবে কি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় ঠিক করবে।

হার্স্টউড্ সেইদিনই মুদীর সঙ্গে কথা বললো, এক পাউণ্ড কফির অর্ডার দেওয়ার পর বললে, আচ্ছা, সপ্তাহের শেষে যদি একেবারে টাকাটা দিই আপনাকে, চল্‌বে তো?

মুদী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাতে কী হয়েছে!

হার্স্টউডের নিজের দশটা ডলারও ছিলো। কোনরকমে ব্যবস্থা করে ফেললো সে। ক্যেরীকে সে বলে ভেবো না সব ঠিক আছে। ক্যেরীর যে কিছুর প্রয়োজন থাকতে পারে নিজের সেকথা সে ভাবেই না। ভাড়াটা দিয়ে সংসারের খরচাটা পুরোপুরি চালিয়ে নিতে পারলেই সে খুসী। ক্যেরীর পিত্তি জ্বলে যায়—ভেবো না! নিজে যদি এতটুকু ভাবতো তো এমন করে আমার কথায় নির্ভর করে বসে থাকতো না। সাত মাস চেষ্টা করলে একটা মানুষ কোন কিছু একটা জোটাতে পারে না?

আধময়লা পুরোনো কাপড় পরে এক কোণে গম্ভীরভাবে বসে থাকে হার্স্টউড। ক্যেরীর বিশ্রী লাগে ওর সান্নিধ্য। পালায় সে বাইরে সুযোগ পেলেই।

আজকাল দু' একাটি সঙ্গীর কাছে যায় সে, তার মধ্যে সেই মেয়েটির কাছেই

বেশী। লোলা অসবোর্ণ ওর নাম। ফোর্থ এভিনিউর কাছাকাছি ওর ঘরটা। পরিচ্ছন্ন সুন্দর, জানালা দিয়ে তাকালে কয়েকটা বড বড গাছও নজরে পড়ে।

একদিন লোলাকে জিজ্ঞাসা করলো ক্যেরী, তোমার বাড়ী তো এখানেই, না?

—হ্যাঁ এখানেই। বাড়ীর সঙ্গে বনে না আমার। সব্বার কথামতো কেন চলতে যাবো আমি? তুমিও তো এখানেই থাকো?

—হ্যাঁ।

—তোমার বাড়ীর সব এখানে?

—ক্যেরীর লজ্জা করে। কেমন করে বলবে সে স্বামী আছে তার। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এত বেশী উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সে লোলার কাছে, আজ আর বলতে পারে না সে সত্য কথাটা। চেপে গিয়ে বলে, এক আত্মীয়ের কাছে থাকি আমি।

মিস্ অসবোর্ণ ধরে নিলো, তার মত ক্যেরীও স্বাধীন, যথেষ্ট অবসর আছে ওর। সে নিমন্ত্রণ করলো ওকে, এখানে আজ থেকে যাও না, চলো বেরিয়ে আসি বাইরে কোথাও। এমনি করে ক্যেরী মাঝে মাঝে লোলার পাল্লায় পড়ে বাইরে খেতে শুরু করলো। হাস্ট´উড্ লক্ষ্য করলো, কিছু বললো না। ওর সঙ্গে ঝগড়া করার জোর কোথায় তার? মাঝে মাঝে ক্যেরী হয়তো ঘণ্টাখানেক আগে বাসায় ফিরে কোনরকমে একটা কিছু সেদ্ধ করে দিয়েই থিয়েটারে দৌড়য়।

হাস্ট´উড্ আপত্তিটা আর চাপতে পারলো না। একদিন জিজ্ঞাসা করে ফেললো, তোমাদের কি বিকেলেও রিহার্শাল হচ্ছে আজকাল?

ক্যেরী বলে, না, অন্য একটা চাকরীর চেষ্টা দেখ্ছি।

চাকরী সে খুঁজছিল ঠিকই। কথাটা মিথ্যে নয়। তবু মিথ্যেও। চাকরী খুঁজতে তার এত সময় লাগে না, লাগে বাইরে একটু নিশ্বাস ফেলতে।

হাস্ট´উডের কথায় ক্যেরী মনেমনে চটলো, ওর স্বাধীনতার দিকে হাত বাড়াচ্ছে হাস্ট´উড্। কত কিছুই তো জলাঞ্জলি দিয়েছে, বেড়াবার সময়টুকুও পাবে না সে?

হার্স্টউড্ বোঝে সবই। কিন্তু অভদ্র আচরণ সে করতে পারে না, এনিয়ে ঝগড়া করার মত ছোট মন তার নয়।

দু' জনের মধ্যে গহ্বরটা বেড়েই চলে।

একদিন ম্যানেজার উইংসের ফাঁক দিয়ে নাচ লক্ষ্য করতে করতে নৃত্য পরিচালককে বললো, ওই মেয়েটি কে, চার নম্বরে নাচছে?

পরিচালক বললো, মিস্ ম্যাডেণ্ডা।

—মেয়েটি তো দেখতে ভালোই, ওকে লাইনের মাথায় দিচ্ছেন না কেন?

পরিচালক বলে, তাই দেবো স্যার।

—হ্যাঁ তাই করবেন, প্রথমে লাইনে ও মেয়েটার চেয়ে একে অনেক ভালো দেখাবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরের দিন পরিচালক ডেকে পাঠালো ক্যেরীকে। যেন কোন ভুলের জন্যে ধমকই দেবেন।

—আজ তুমি প্রথম লাইনের মাথায় থাকবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—একটু প্রাণ দিয়ে, ফীলিঙ্ দিয়ে নাচতে হবে, বুঝেছ?

ক্যেরী বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

অবাক হয়ে ক্যেরী ভাবলো ওদের দলের নেত্রীটি বোধহয় অসুস্থ। কিন্তু যখন দেখলো না সেও তো রয়েছে অপ্রসন্নমুখে তখন আরো অবাক হলো। ওর কদর হচ্ছে তা' হলে, ক্যেরী উল্লসিত হয়ে ওঠে। মাথাটা দুলিয়ে এমন ভাবে হাতের একটা ভঙ্গীকরে সে, বেশ ভালো হয় ওর অভিনয়টা।

এরপরে একদিন ম্যানেজার বললো, মেয়েটার ভঙ্গী টঙ্গী গুলো বেশ মিষ্টি।

ওর ইচ্ছা হয় নিজেই গিয়ে কথা বলে। কিন্তু ম্যানেজার হয়ে সোজাসুজি গিয়ে কথা বলাটা কেমন অশোভন দেখায়, কোনদিন করেনি সে। শেষ পর্য্যন্ত পরিচালককে ডেকে বলে, ওই মেয়েটাকে প্রথম সারির মাথায় দিন। প্রথম সারিতে কুড়িটি মেয়ে; ওদের পোষাকটা আরো সুন্দর, সম্মানও ওদের একটু বেশী, তাছাড়া ক্যেরীর মাইনেও বাড়লো। আঠারো ডলার।

হার্স্টউড্ কিন্তু এসবের কিছুই জানলো না। ক্যেরী ঠিক করলো এ-টাকাটা সে নিজে খরচ করবে। আসলে সে আগেই খরচ করতে শুরু করে দিয়েছে এ-মাস থেকে। এদিকে ঘরভাড়া আর ধার নিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে সে।

ক্যেরী হিসেব করে আঠারো ডলা'রই যদি নিজের জামাকাপড় গহনার জন্য খরচ করতে পারতো। সে ভুলে যায় একা থাকলেও তার জন্যে ঘর ভাড়া আর খাওয়ার খরচ দিতে হতো। এর সবটাই সে জামাকাপড়ে খরচ করতে পারতো না।

কিন্তু ক্যেরী মরিয়া হয়ে গেছে। একদিন একটা জিনিষ কেনার পর বারো ডলার থেকেও কিছু বেরিয়ে গেলো। ক্যেরী জানে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সে, কিন্তু মেয়েলি সখটা ছাড়তে পারে না।

পরের দিনই হার্স্টউড বললো, মুদীকে সাড়ে পাঁচ ডলার দিতে হবে।

ক্যেরী ভ্রূ কুঁচকে তাকায়, এতো? পার্শটা খুলে দিতে গিয়ে বলে, আমার কাছে মোট আট ডলার রয়েছে আর।

হার্স্টউড্ বলে, দুধওয়ালাকে আট ডলার মত দিতে হবে। ক্যেরী বলে, হ্যাঁ, তারপর কয়লাওয়ালা আছে।

ক্যেরী নতুন জিনিষ কিনছে আজকাল বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে থাকে, সংসারের কাজে তার গাফিলতি এসেছে, সব কিছুই লক্ষ্য করেছে হার্স্টউড্। জানে একটা কিছু ঘটবে এবার, কিন্তু কিছুই বলে না।

ক্যেরী বলে, কী জানি, কী করে চলবে। আমি একা পারিনা না আর, কী-ই-বা মাইনে পাই।

প্রতিবাদের ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। হার্স্টউড্ হজম করে অপমানটা।— সব সময়ের জন্যে তো নয়, শুধু আমার যে ক'দিন কিছু না হয়,—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব সময়েই এই একই কথা। আমি কোত্থেকে দেবো আর? কী যে করি আমি বুঝছি না।

হার্স্টউড্ বলে, আমি কি চেষ্টা করছি না মনে করো? কী বলতে চাও আমাকে? কী চাও তুমি বলো।

—তুমি নিশ্চয়ই ভালো ভাবে চেষ্টা করো না, এই তো আমি কি পেলাম না?

হার্স্টউডও এবার আঘাত খেয়ে রেগে যায়,—চেষ্টা অনেক করেছি আমি। তোমাকে আর চাকরী দেখিয়ে খোঁটা দিতে হবে না আমাকে। চেষ্টা করছি না আমি? এই ক'টা দিন একটু সাহায্য করতে বলেছি—এখনও মরিনি আমি,—বুঝলে?—হার্স্টউড্ রাগ চাপবার চেষ্টা করে, তবু গলাটা কেঁপে যায় ওর।

ক্যেরীর রাগটা পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। নিজেরই লজ্জা হয় এবার। পার্শটা খুলে টাকাগুলো সব টেবিলে বার করে দেয়। বলে, এই ক'টা টাকা শুধু আছে আমার কাছে, কী করে সব দেওয়া যাবে তাই ভাবছি। আচ্ছা, ওরা শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না, তাহলে—

হার্স্টউড্ বিষণ্ণভাবে বলে, শুধু মুদীরটা দাও আমাকে, বাকীটা তোমার কাছে থাক।

বাকী টাকাটা পার্শে তুলে রাখে ক্যেরী। ঠিকসময়েই রান্না করলো। রাগ দেখিয়ে লজ্জা করে। মিটমাট করে ফেলতে চায় সে।

খাওয়ার পর চেয়ারে বসে দু' জনেই নিজের নিজের ভাবনাগুলো রোমন্থন করে। হার্স্টউড্ ভাবে, ও নিশ্চয়ই আরো বেশী টাকা পায়। বারো ডলারের মধ্যে এত সব জামাকাপড় আসে কোত্থেকে! বেশ রাখুক ওর নিজের টাকা। আমার একটা হয়ে যাক্, তারপর মরুক্‌গে ও। আমার কী, আমি ঠিক এবার একটা জুটিয়ে ফেলবো।

রাগের মাথায় মনেমনে সে বললো বটে কথাগুলো, কিন্তু কাজের জন্য বেরুতে হবে, একটা কিছু করতে হবে, এই ভেবে আবার পিছিয়ে এলো।

ক্যেরী ভাবে, ওকে জোর করে কাজে পাঠাতে হবে দেখ্‌ছি। আমি কি চিরকাল ওর খরচ জোগাবো নাকি?

এর মধ্যে ক'জন ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ক্যেরীর। মিস্ অসবোর্ণের বন্ধু ওরা, হাসি খুসী প্রমোদ-বিলাসী। একদিন লোলার বাসায় বসে গল্প করছে ওরা, এমন সময় দলটা এলো হৈ-হৈ করে।

লোলা বললো, চলো না আমাদের সঙ্গে।

ক্যোরী বলে, না, আমার যাওয়া হবে না।

—কেন হবে না, কোথা যাবে তুমি শুনি ?

ক্যোরী বলে, না পাঁচটার মধ্যে বাসায় ফিরতে হবে আমাকে ।

—কেন ?

—ডিনারের জন্যে ।

লোলা বলে, ও এই, আমি বলি আর কিছু। কিছু ভাবতে হবে না তোমাকে। ওরা খাওয়াবে এখন।

ক্যোরী বলে, না, ভাই আমার যাওয়া হবে না।

—ওসব শুনছি না আজ আমি। যেতেই হবে তোমাকে। এই তো সেণ্ট্রাল পার্কে ঘুরে আসবো, ঠিক সময় ফিরে এলেই তো হলো।

ক্যোরীকে শেষ পর্য্যন্ত রাজী হতে হলো। বললে, আচ্ছা যাচ্ছি চলো, কিন্তু সাড়ে চারটের মধ্যে ফেরা চাই কিন্তু।

কথাটা লোলার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ড্রুয়ে আর হার্স্টউডের সংস্পর্শে আসার পর ক্যোরী এখন আর আগের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না এই প্রমোদবিলাসী যুবকদের সাহচর্য্যে। ওদের অনেক প্রশংসা সত্যিই অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হয়। সে নিজে যেন ওদের চেয়ে একটু বড, অনেক ছেলেমানুষি ওদের চোখে পড়ে তার। তবু দেহে মনে তার যৌবন তো এখনো চলে যায়নি, যৌবনের আবেদন সে উপেক্ষা করতে পারে না।

একটি ছেলে মাথা ঝুঁকিয়ে বলে, মিস্ ম্যাডেণ্ডা কিছু ভাববেন না, ঠিক সময়ে ফিরে আসবো আমরা।

ক্যোরী হেসে বলে, কী জানি।

বেড়াতে বেরিয়ে ওরা হৈ হৈ করে। যৌবনের উচ্ছল স্তুতি, অথবা হাসিখুসী ঠাট্টা, মজার মজার গল্প। ক্যোরী লক্ষ্য করে সুবেশ পুরুষ, সুবেশা তরুণীদের। পোষাক পরিচ্ছদ আর গহনার দিকে নজর যায় তার আপনা থেকে।

কতো ঐশ্বর্য্য সম্পদই না চোখে পড়ে ওর। নিজের দারিদ্র্যটা বুকে বাজে। একসময় সে ভুলে যায় হার্স্টউডের কথা।

হার্স্টউড্ অপেক্ষা করে চারটে, পাঁচটা, ছ'টা, অন্ধকার হয়ে আসছে। এবার চেয়ার ছেড়ে উঠলো সে।

আপন মনে কঠিনভাবে হেসে বললো, আজ আর বোধ হয় আসবে না ও।

ভাবে, এই তো হয়। পথ খুঁজে পেয়েছে ক্যেরী। আজ আর আমার স্থান নেই।

ক্যেরীর খেয়াল হলো পাঁচটার পর। গাড়ীটা তখন ছুটেছে নদীটার কাছে, সেভেন্‌থ এভিনিউ দিয়ে।

ক্যেরী বললো, ক'টা বাজলো? আমাকে যে বাসায় ফিরতে হবে।

ঘড়িটা দেখে সঙ্গীটি বলে, স'পাঁচটা।

কেরী বলে, য়্যাঁ। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার বসে পড়ে। নাঃ এখন আর ভেবে লাভ নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

সঙ্গীটি বলে, হ্যাঁ, এখন আর গিয়ে কি হবে। ওর মাথায় নাচছে চমৎকার একটা ডিনার খাওয়া যাবে একসঙ্গে। তারপর শো-এর পরে আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। ক্যেরীকে ওর ভালো লেগেছে।

ওরিনকে বলে, কী হে, ডেল্‌মনিকোয় গিয়ে কিছু খেয়ে নিলে হয় না এবার?

ওরিন বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ক্যেরী হার্স্টউড়ের কথা ভাবে, এই প্রথম ডিনার তৈরী পাবে না সে।

ডিনারে বসে সঙ্গীটি বলে, কী ভাবছেন এতো মিস্ ম্যাডেণ্ডা? আচ্ছা আমি বলবো দেখবেন।

ক্যেরী বলে, থাক্, আপনাকে আর অত কষ্ট করতে হবে না।

তারপর খেতে শুরু করে সে। হাসিখুসী আড্ডায় হার্স্টউড্ মন থেকে মুছে যায়। ওদের ঠাট্টা ইয়ার্কিতে সে-ও যোগ দেয়, খুসী হয়ে ওঠে।

থিয়েটারের পর দেখা করার কথা উঠতে সে কিন্তু অস্বীকার করে, না। আমার একটা কাজ আছে।

সঙ্গীটি অনুনয় করে, মিস্ ম্যাডেণ্ডা, আজকের মতো—

ক্যেরী বলে, না, মাপ করতে হবে আপনাকে, অনেক ধন্যবাদ।

সঙ্গীটি নিরাশ হয়ে বিষণ্ণ মুখে তাকায়।

অপর সঙ্গীটি বলে, ঘাবড়ো না হে। আরো খানিকটা ঘুরবো আমরা। দেখো না মত পাল্টাতে কতক্ষণ।

উনত্রিশ

ক্যেরী এখন কোন এক মুসলমান রাজার হারেমের সুন্দরী। ওরা শুধু স্টেজে এসে দাঁড়ায়। নতুন সুলতানকে তাঁর উজীর হারেমের ঐশ্বর্য্য দেখাবার সময় এদের হাজির করে তাঁর সামনে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শুধু সৌন্দর্য্য প্রদর্শনী, কোন পার্ট নেই। একদিন প্রধান অভিনেতার কী সখ হলো হঠাৎ শুধিয়ে বসলেন, তুমি কে গো সুন্দরী?

যখন কথাটা বললেন, ক্যেরী তখন কুর্নিশ করছিলো সুলতানকে। যে কেউ-ই হতে পারতো, ঠিক ক্যেরীর জন্যেই কথাটা বলেন নি তিনি। কোন উত্তরও হয়তো তিনি আশা করেন নি। অন্য কেউ হলে নীরবে আর একবার সেলাম জানিয়ে চলে যেতো। ক্যেরীর অভিজ্ঞতা বেড়েছে সাহসও বেড়েছে, সে মধুর কণ্ঠে উত্তর দিলো।

—আমি একান্ত আপনারই জাঁহাপনা।

ছোট্ট একটু কথা। কিন্তু ক্যেরীর বলার ভঙ্গীতে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে গেলো, বিশালকায় সুলতানের সামনে, ক্যেরীর মত হারেম বালিকার এইটুকু উক্তিতে মজা পেলো ওরা। হাসিতে ফেটে পড়লো হলটা। অভিনেতা খুসী হয়ে আর একবার নিজে প্রশংসা পাবার জন্যে বলে উঠলেন, বহুৎ আচ্ছা সুন্দরী। আমিও তো তোমারই।

ক্যেরী এদিকে বাহাদুরিটা করে ফেলে ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে। পরিচালকের কড়া নির্দেশ আছে কেউ কোন বাহাদুরি করবে না, কেউ কোন কথা বলবে না, নতুন কিছু নিজের বুদ্ধি করে করবার চেষ্টা করবে না। তা হলে ফাইন অথবা আরো কিছু গুরুতর শাস্তি পেতে হবে।

উইংসের কাছে সে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়েছিল, অভিনেতা স্টেজ থেকে প্রস্থানের সময় তাকে দেখে চিনতে পারলেন, বললেন, এর পর থেকে এটা বলবে তুমি, বুঝেছ। তবে বেশী কিছু আর বলতে যেওনা যেন।

ক্যেরী বিনীতভাবে বলে, অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। চলে যাওয়ার পরও ক্যেরীর কাঁপুনি থামে না।

সখীদলের একজন বললো, তোমার বরাৎ-টাই ভালো ভাই একটা পার্ট পেয়ে গেলে আর কেউ হলে—পুঁ।

সবাই জানে, এর মানে ক্যেরীর কপাল ফিরতে শুরু করেছে।

ক্যেরী সেদিন বাড়ীতে এলো উল্লসিত হয়ে। কিছুদিন পরেই সুযোগ পেলো ও একটি অভিনেত্রীর অসুখ করতে। ক্যেরীকেই নির্ব্বাচন করা হলো।

মিস্ অস্‌বোর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, কতো পাবি ভাই?

ক্যেরী বললো, তাতো শুধোই নি।

লোলা বলে, আচ্ছা বোকা তো তুই। শুধিয়ে নে, চা', না চাইলে দেবে নাকি ওরা? বল্ল, চল্লিশ ডলার করে দিতে হবে।

ক্যেরী বলে, ওরে বাবা।

লোলা খোঁচায়, কেন ওরে বাবা কিসের! যাই হোক শুধিয়ে তো আয়।

ক্যেরী রাজী হলো শেষ পর্য্যন্ত। তার-ই কি কম আগ্রহ? সাহস হয় না শুধু। পরিচালক যখন কী পোষাক পরতে হবে তার নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠালো তখন ক্যেরী জিজ্ঞেস করলো, কত পাব আমি।

—পঁয়ত্রিশ ডলার।

ক্যেরী এত অবাক হয়ে গেলো যে চল্লিশ ডলারের কথাটা ভুলেই গেল। আনন্দে লোলাকে এসে জড়িয়ে ধরলো সে।

লোলা বললো, এর থেকে আরো বেশী পাওয়া উচিত ছিলো তোর। জামা কাপড় কিনতে হবে তো এখন নিজেকে।

ক্যেরী কথাটায় চমকে উঠলো, তাইতো। টাকা পাবে কোথায় সে? টাকা তো জমানো নেই তার, এদিকে আবার ভাড়া দিতে হবে। মনে মনে বললো সে, এবার দেবো না টাকা আমি। আমি আর কতটুকুই বা ফ্ল্যাটে থাকি। চলে আসবো ওখান থেকে।

এরপর এলো লোলার কাছ থেকে তাগাদা। সে বলে, চলে আয় না ভাই,

এক সঙ্গে থাকবো দু'জনে। দু'জনে থাকলে একটা চমৎকার বাসা নিতে পারবো আমরা। খরচও বেশী পড়বে না।

ক্যেরী বলে, ইচ্ছে তো হয়।

লোলা বলে, তবে চলে আয় না কেন, দু'জনে কেমন মজা করে থাকা যাবে।

ক্যেরী একটু চিন্তা করে বলে, আচ্ছা দাঁড়া দেখি আগে।

হার্স্টউড্ দিন দিন আরো বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে। কথাও বলে কম আজকাল। ক্যেরীর মনকে বোঝাবার পক্ষে এও একটা যুক্তি হয়ে দাঁড়ালো।

সেদিন সাড়ে পাঁচটার সময় যখন হার্স্টউড্ ফিরলো, ফ্ল্যাটটা তখনো অন্ধকার। সে জানে ক্যেরী নেই বাসায়। শুধু অন্ধকারই নয়, কাগজখানা দরজার হাতলে আটকানো রয়েছে। চাবি খুলে গ্যাসটা জ্বালিয়ে ঘরে এসে বসলো সে। একটু পড়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। ক্যেরী এখন এসে গেলেও ডিনারের দেরী হয়ে যাবে। ছ'টা পর্য্যন্ত পড়ে সে উঠে পড়লো। না ক্যেরীর দেখা নেই এখনো। যাহোক খেয়ে নেওয়া যাক্।

হঠাৎ ওর খেয়াল হলো ঘরটা যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার, এমন দেখাচ্ছে কেন। একটু লক্ষ্য করতে দেখতে পেলো হার্স্টউড্ তার পায়ের কাছে একখানা চিঠি পড়ে আছে। চিঠিটা না পড়েই সে বুঝতে পারে তাতে কি লেখা আছে।

তবু চিঠিটা বিমূঢ়ের মত হাতে তুলে নেয় সে। হাতের মধ্যে খামখানা খস্‌খস্ করে উঠলো। খামটার মধ্যে ক'খানা নোট রয়েছে চিঠিটার সঙ্গে। টাকাটা মুঠোর মধ্যে দোমড়াতে দোমড়াতে হার্স্টউড্ পড়ে চিঠিখানা—

প্রিয় জর্জ্জ,

আমি চলে যাচ্ছি। এখানে আর থাকবো না। ফ্ল্যাটটা রাখার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, আমি আর পারছি না চালাতে। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু দু'জনের খরচ চালিয়ে ফ্ল্যাট্‌টার ভাড়া টানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে টুকু বাড়তি থাকে তা দিয়ে আমার জামাকাপড় করাতেই হবে।

কুড়িটা ডলার রেখে গেলাম। আমার কাছে এই কটা টাকাই মোটে ছিলো। কার্ণিচারগুলো তোমার যা ইচ্ছে করতে পারো, আমার দরকার হবে না।

—ক্যেরী।

চিঠিখানা হাত থেকে পড়ে গেল ওর। হার্স্টউড্ এবার বুঝতে পেরেছে কেন ঘরটা কেমন কেমন লাগছিল। তাকের ওপর ক্যেরীর সেই বড ঘড়িটা নেই। সামনের ঘরটায় গেলো হার্স্টউড, বাতিটা জ্বালিযে ফেললো। আলমারির মধ্যে যে দু'একটা রূপোর কাপ-প্লেট ছিলো সেগুলো নেই। আরো কী কী যেন টুকিটাকি নিযে গেছে। টেবিল-ক্লথটাও নেই। ওয়ার্ডরোব্‌টা—না, ক্যেরীর কোন কাপডজামা নেই। ড্রয়ারগুলোও ফাঁকা। ট্রাঙ্কটাও নেই। ওর নিজের ঘরে পুরোনো কাপডগুলো ঝুল্‌ছে, ঠিক যেমন ছিলো। আর সব ঠিক আছে।

বসার ঘরে আসে এবার হার্স্টউড। মেঝের দিকে বিমূঢভাবে তাকিযে থাকে ও। একটা অশ্বস্তিকর নিস্তব্ধতায দম বন্ধ হয়ে আসে। ছোট্ট ফ্ল্যাট্‌টা অদ্ভুতরকম ফাঁকা লাগে। এখনো যে খাওযা হয়নি তাব, বেশ ক্ষিদে পেযেছে, ভুলে গেলো সব হার্স্ট উড্।

মনে পড়লো আরো অনেক পরে। তারো পরে হঠাৎ মনে হলো টাকাটার কথা। তার হাতে এখনো কুডিটা ডলার আছে। বাতিগুলো জ্বালিযে বেরিয়ে এলো সে। ফ্ল্যাট্‌টা ভীষণ ফাঁকা।

মনে মনে বলে হার্স্টউড্ আমিও চলে যাবো এখান থেকে।

একা, একা সে। ক্যেরী ওকে ফেলে চলে গেছে।

কতো আরামের ছিল ফ্ল্যাট্‌টা অনেকদিনের পুরোনো স্মৃতির মত মনে হয়। বাইরে কী ঠাণ্ডা, কী দুর্যোগ। চেয়ারে বসে পডলো হার্স্টউড্ অবসন্নভাবে। হাতের ওপর ঝুঁকে বসে থাকে সে, কিছুই ভাবছে না, শুধু একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি।

নিজের ওপর করুণায ভারাক্রান্ত হযে ওঠে হার্স্টউডের মন। আপন মনে বলে, কেন চলে গেলো ও, আমি একটা জুটিয়ে নিতাম ঠিক।

চেয়ারটা আজ আর দোলায় না সে। খানিক পরে বেশ একটু জোরেই বলে উঠলো, আমি তো চেষ্টা করেছি, আমি তো সত্যি চুপ করে বসে ছিলাম না।

যেন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছে সে। বারোটা বেজে গেছে। এখনো হার্স্টউড্ চেয়ারটায় দোল খাচ্ছে মেঝের দিকে তাকিয়ে।

ত্রিশ

ক্যেরী পরদিন থিয়েটারে এসে দেখলো ওর সাজ-ঘর বদলে গেছে। একটা চাকর বললো, মিস্ ম্যাডেণ্ডা, আজ থেকে এই ঘরটা আপনার। আরো তিনজনের সঙ্গে ছোট একটা ঘুপ্‌টি ঘরে ওকে আর সাজতে হবে না সখীর সাজ। অনেক বড় সুন্দর একটা ঘর ওর একার। ক্যেরী একটা অদ্ভুত আবেগ অনুভব করে, সেটা শারীরিক না মানসিক তাও বলতে পারবে না।

এখন তাকে আর কেউ হুকুম করে না, অনুরোধ করে। সঙ্গিনীরা ঈর্ষ্যার চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে, সহজ স্বাভাবিক পোষাকে সে এখন পার্ট করে। সখীরদলের কিম্ভূত সাজ এখন আর পরতে হয় না ওকে। ওরা কেউ কেউ আলাপ জমাবার চেষ্টা করে, খাতির রাখার প্রয়াসে। সুলতানটি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তার পার্টটা এখন মাটি হয়ে গেলো, ক্যেরীর উন্নতি হয়ে।

ছোট্ট পার্টটার পরে ক্যেরী যখন প্রশংসাগুঞ্জন শোনে, তখন সে লজ্জিতই হয় বেশী। যেন কোনো একটা অপরাধ করে ফেলেছে। সঙ্গিনীরা যখন অভিনন্দন জানায়, সে বোকার মতো হাসে। গর্ব্বিত গম্ভীর বা উদ্ধত সে হতে পারে না এই পদোন্নতিতে। ক্যেরী মনে মনে খুসী সলজ্জ। অভিনয়ের পর লোলার সঙ্গে এখন সে নতুন ঘরে ফিরে যায় কোম্পানীর গাড়ীতে।

তারপর শুরু হলো বাইরের অভিনন্দন। মোটা মাইনে সে পায় নি এখনো, কিন্তু প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি উঠেছে। চিঠি আসে ক্যেরীর কাছে, নিমন্ত্রণ আসে।

একদিন কে এক মিঃ উইদার্স এলেন ক্যেরীর ঘরে। কোত্থেকে বাসার ঠিকানা জোগাড় করেছে কে জানে। নমস্কার জানিয়ে বললেন, মাপ করবেন, আপনি কি বাসা বদল করবার কথা ভাবছেন ?

ক্যেরী বলে, না, কে বললো আপনাকে ?

মিঃ উইদার্স বলেন, মানে, দেখুন আমি ওয়েলিংটন হোটেল থেকে আসছি। ব্রডওয়ের ওপর যে নতুন হোটেলটা হয়েছে, বোধ হয় বিজ্ঞাপন দেখে থাকবেন।

ক্যোরী নামটা শুনেছে বৈকি, আধুনিক কায়দায় তৈরী বেশ বড় হোটেল।

মিঃ উইদার্স বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনবেন বৈকি। দেখুন, আমাদের খুব ভালো ভালো ঘর আছে কখানা, আপনাকে দেখাতে চাই, যদি আপনি অবশ্য অন্য কোথাও যাওয়া না ঠিক করে থাকেন ইতিমধ্যে। সব রকম বেশ ভালো ব্যবস্থা আছে আমাদের, গেলেই দেখতে পাবেন। গরম জল, ঠাণ্ডা জল, প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে বাথরুম, প্রত্যেক তলায় একটা করে বড় হল, লিফ্‌ট। আমি আর কী বলবো, আপনি তো শুনেছেন সবই নিশ্চয়।

ক্যোরী তাকিয়ে থাকে লোকটির দিকে। ও কি ভেবেছে ক্যোরী লক্ষপতি হয়ে গেছে।

ক্যোরী শেষ পর্য্যন্ত বলে, আপনাদের রেট্‌টা?

—হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আপনার কাছে এলাম। একটু প্রাইভেটে কথা বলার জন্যে। আমাদের সাধারণ চার্জ্জ হলো দৈনিক তিন থেকে পঞ্চাশ ডলার।

ক্যোরী যেন চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বলে, দেখুন আমার এত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই।

মিঃ উইদার্স বলেন, না না, সে আমি বল্‌ছি না। বলতে দিন আমাকে সবটা। এটা তো আমাদের সাধারণ রেটের কথা বললাম আপনাকে। স্পেশ্যাল রেট্‌ও আছে আমাদের, সবারই থাকে। আপনি বোধহয় সেটা জানেন না। মানে, আপনি যদি থাকেন, আমাদের হোটেলের পক্ষে আপনার নামের একটা মূল্য আছে বুঝলেন না—

ক্যোরী বলে, ও। এতক্ষণে একটু যেন বুঝতে পেরেছে সে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হোটেলের পেট্রনদের খ্যাতির ওপরেই তো অনেকটা হোটেলের খ্যাতিও নির্ভর করে। আপনার মত একজন সুপরিচিতা অভিনেত্রী—

আর একবার মাথা নোয়ায় লোকটি,—মানে আমাদের হোটেলের উপর লোকের দৃষ্টি পড়বে, না, না, হাসবেন না। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আপনি এলে একজন ভালো নামী পেট্রন পাবো আমরা।

—হ্যাঁ, তা হয়তো—ক্যেরী মনে মনে এই আশ্চর্য্য প্রস্তাবটার কথা ভাবে।

টুপিটা হাতের মধ্যে ধরে, জুতোটা দিয়ে মাটিতে ঠুকঠুক করে ঘা দিতে দিতে লোকটি বলে, আপনি যদি রাজী হন, আপনার জন্য আমাদের হোটেলে ব্যবস্থা করতে চাই আমি। রেট-টেট্ সম্বন্ধে ভাবতে হবে না আপনাকে। এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনারই দরকার নেই। আপনার যা আভরুচি, যা পারবেন, দেবেন।

ক্যেরী বাধা দিতে যাচ্ছিল, সে সুযোগই দিলেন না মিঃ উইদার্স।

—আজ কাল যেদিন ইচ্ছে চলে আসুন আপনি, আজই হলে আজই ভালো। সবচেয়ে ভালো ঘর, যেটা আপনার পছন্দ, বেছে নেবেন।

লোকটির অমায়িকতায় ক্যেরী অভিভূত হয়ে গেছে। বলে, আপনার দয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার যেতে কোন আপত্তিই নেই। কিন্তু আপনাদের যা প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চনা করবো কেন। আপনাদের ক্ষতি করে—

মিঃ উইদার্স বলেন, ও নিয়ে কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। সে সব এমন ব্যবস্থা করবো, আপনার কিছু বলবার থাকবে না। আপনি যদি তিন ডলার দিলে খুসী হন, বেশ তো তাই দেবেন। আপনি সপ্তাহে সপ্তাহেই হোক, বা মাসের শেষেই হোক ওই দেবেন, তবে আমাদের ক্লার্ক আপনাকে রসিদ দেবে, ঘরটার যা রেট বাঁধা আছে, বুঝলেন না।

একটু হেসে নিয়ে ভদ্রলোক বলেন, চলুন না ঘরগুলো দেখে আসবেন।

ক্যেরী বলে, যেতে পারলে খুসী হতাম, কিন্তু আমার একটা রিহার্শাল আছে সকাল বেলাতেই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ সে তো নিশ্চয়ই যে কোন সময়ে আসুন, আচ্ছা আজ বিকেলবেলা সুবিধে হবে আপনার?

ক্যেরী বলে, হ্যাঁ, বিকেলে অবশ্য যেতে পারি।

হঠাৎ লোলার কথা মনে পড়ে যায় ওর। বলে, দেখুন আমার একটি বন্ধু আছে, এই ঘরেই আমার সঙ্গে থাকে। আমি গেলে ও-ও যাবে। ওর কথা এতক্ষণ বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আপনাকে।

—তাতে কী হয়েছে। আপনার সঙ্গে কে থাকবে না থাকবে সে তো আপনার ইচ্ছা। আপনার যাতে সুবিধে হয় তাই হবে। কিচ্ছু ভাববেন না।

নমস্কার করে মিঃ উইদার্স উঠে পড়েন।—তাহলে, চারটের সময় আসছেন তো?

ক্যোরী বলে, হ্যাঁ।

—আমি থাকবো ওখানে। আচ্ছা আসি।

মিঃ উইদার্স আর একবার মাথাটা দুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রিহার্শালের পর ক্যোরী লোলাকে খবরটা বললো। লোলা তো শুনে লাফাতে শুরু করলো—হ্যাঁ, তাই নাকি? সত্যি বল্‌ছিস্? কী মজা। কী মজা। ওয়েলিংটনে থাকবো আমরা! মনে আছে তো তোর সেই যে সেদিন ওরিনরা নিয়ে গিয়েছিলো, মনে নেই।

ক্যোরী বলে, হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি।

লোলা বলে, চমৎকার হবে না?

বিকেলবেলা যে ঘরগুলো দেখালেন মিঃ উইদার্স, তাতে লোলা, ক্যোরীর দুজনেরই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। চকোলেট আর লাল রঙের দেয়াল, রঙ মিলিয়ে পর্দা আর ঝালর, তিনটে ঘর, একটা চমৎকার ঝক্‌ঝকে বাথরুম। রাস্তার দিকে তিনটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালা, ব্রডওয়ের উচ্ছল জনতরঙ্গ দেখা যায় সেদিকে। আর একদিকে পাশের একটা রাস্তা নজরে পড়ে। দেয়ালে বড় বড় আয়না আর দামী ছবি টাঙানো। ডাইভানের ওপর মলমলের চাদর আর মুসলমানী কায়দার বালিশটা যেন মধ্যপ্রাচ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করছে। সাধারণ অবস্থায় এই কামরাগুলোর ভাড়া হবে সপ্তাহে একশো ডলারের মতো।

লোলা এদিক ওদিক ঘোরে আর বলে, সুন্দর, কী চমৎকার, বাঃ, দেখেছিস্।

ক্যোরী তখন পর্দাটা তুলে ব্রডওয়ের রাস্তাটা দেখছিল। সে বললো, হ্যাঁ বেশ আরামের জায়গা।

আরো কিছুক্ষণ দেখবার পর মিঃ উইদার্স বললেন, আপনাদের পছন্দ হয়েছে তো?

ক্যোরী বললে, হ্যাঁ, খুব ভালো লেগেছে আমার।

—তাহলে যে কোন সময় চলে আসুন আপনারা, ঘরটার কাছে চাবী থাকবে আমি বলে যাচ্ছি।

ক্যেরী বেরিয়ে এসে এবার দেখে কার্পেট মোড়া হলটা, মার্বেল পাথরের লবীটা, সুসজ্জিত বসার ঘরটা। এমনি একটা জায়গারই সে স্বপ্ন দেখে এসেছে। তার জীবনের কামনাই ছিল এমনি স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকা।

পরদিনই চলে এলো ওরা।

বুধবার ম্যাটিনীর পর ক্যেরী ড্রেস পালটাচ্ছে এমন সময় ওর ড্রেসিংরুমের দরজায় ধাক্কা পড়লো।

কার্ডটা দেখে ক্যেরী একটু অবাক হয়ে গেলো। বয়টাকে বললো, একটু অপেক্ষা করতে বলো, এখুনি আসছি আমি।

তারপর কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বললো, মিসেস্ ভ্যান্স।

ওকে দেখে মিসেস্ ভ্যান্স বলে উঠলো, ঈস্, চেনাই যায় না তোমাকে। কী করে জোটালে ভাই ?

ক্যেরী খুসীমনে হাসে। মিসেস্ ভ্যান্সের আচরণে কোন বিমূঢ়তার ভাব নেই। সে মোটেই সমীহ করলো না ক্যেরীকে, ক্যেরী যে চলে এসেছে সেজন্য কোন প্রশ্নও করলো না। সব কিছুই সহজভাবে নিয়েছে সে মনে হলো।

ক্যেরী বলে, কী জানি কেমন করে হয়ে গেলো।

—রবিবারের কাগজে ছবি দেখলাম। তারপর কিন্তু নামটা দেখে একটু সন্দেহ হলো, তুমি না অন্য কেউ। তারপর ভাবলাম যাই দেখেই আসি না। অবাক্ করে দিয়েছ ভাই তুমি। তারপর আছ কেমন ?

ক্যেরী বললো, ভালই আছি। তুমি ?

—মন্দ কি ? তা তুমি তো এখন একজন নামজাদা স্টার। কাগজে কাগজে ছবি বেরুচ্ছে। সুখ্যাতি প্রশংসা। আমি তো ভেবেছিলাম গরবে কথাই বলবে না তুমি। আমার ভয়ই করছিল আসতে।

ক্যেরী লজ্জা পেয়ে বলে, কী যে বলো। তোমাকে দেখলে খুশী হবো জানতে না বুঝি তুমি ?

—আচ্ছা সে সব যাক্, চলো আমার সঙ্গে ডিনার খেয়ে আসবে। তা আছ কোথায় তুমি এখন ?

ক্যেরী বলে, ওয়েলিংটনে। কথাটা উচ্চারণ করার সময় একটু গর্কের ভাব এসে গেলো ওর গলায়।

মিসেস্ ভ্যান্স আরো অবাক। তাই নাকি? মিসেস্ ভ্যান্স বুদ্ধি করে হার্স্টউডের নামটা এড়িয়ে গেলো। ক্যেরী যে ওকে ছেড়ে চলে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই ওর।

ক্যেরী বললো, আজ রাত্রে তো হবে না ভাই। আজ অনেক কাজ। এখানে আবার ফিরে আসতে হবে সাড়ে সাতটার মধ্যে। তার চেয়ে তুমিই বরং এসো, আমার সঙ্গে খাবে।

মিসেস্ ভ্যান্স ক্যেরীর বেশভূষা চেহারা লক্ষ্য করছিলো। বললে, খুবই আনন্দিত হতাম ভাই, কিন্তু আজ তো পারবো না। বলে এসেছি, ঠিক ছ'টায় বাসায় ফিরবো। আচ্ছা উঠি আজ। কবে আসছ তাহলে?

ক্যেরী বলে, গেলেই হলো যে কোন দিন।

—বেশ তাহলে কাল। আমরা এখন চেল্‌সীতে আছি।

ক্যেরী হেসে বলে, আবার উঠে গেছ?

—তুমি তো জানো ভাই এক বাসায় ছ' মাসের বেশী থাকতে পারি না আমি। আচ্ছা তাহলে মনে থাকবে তো কাল সাড়ে পাঁচটা।

ক্যেরী বলে, হাঁা, হাঁা, ঠিক মনে থাকবে। ক্যেরী মিসেস্ ভ্যান্সের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চেয়ে এখন কোন অংশে কম নয় সে। হয়তো ওর থেকে ক্যেরীর পদমর্য্যাদা সম্মান অর্থ বেশীই হবে এখন। ওই এখন ক্যেরীর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য এগিয়ে আসছে।

এদিকে ক্যেরীর প্রসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ক্যেরীর চিঠির সংখ্যা বেড়ে গেছে। কতো চিঠিই যে আসে। কতো প্রেম ওর জন্য দুনিয়ার লোকের। কতো অনুনয়, কতো কাকুতি মিনতি শুধু একটিবার দেখা করার অনুমতি চেয়ে। লোলাও দু' একখানা পায় এমনি চিঠি। দু'জনে হাসাহাসি করে।

কোনো কোনো ভদ্রলোক তাঁর সহস্র গুণাবলীর বর্ণনার পর এ কথাটাও উল্লেখ করতে ভোলেন না যে তাঁর গাড়ী-জুড়ীও আছে, অর্থ-সম্পদেও বেশ ভালই।

একজন লিখেছেন—আমার নিজের দশ লক্ষ ডলার আছে। আপনার যে কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারবো আমি। আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলেই লিখছি। অন্ততঃ আধ ঘণ্টার জন্যেও আমাকে একবার দেখা করতে দিন আপনার সঙ্গে। চিঠিতে আমার প্রেমের কী প্রমাণ দেবো? সাক্ষাতে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে দেবেন কি দয়া করে?

এমনি সব প্রেমের চিঠি। অজস্র অসংখ্য। ক্যোরী আর লোলা হাসাহাসি করে।

ক্যোরীর মনে হয় সে হঠাৎ অনির্ব্বচনীয়া সুন্দরী হয়ে গেছে, পুরুষরা যেন ওর জন্য হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। এতই কি সুন্দরী সে সত্যি? ক্যোরী বললে, শুন্‌লি তো? দয়া করে যদি আধ ঘণ্টাও দেখা করতে দেন। ভাবটা বোঝ একবার। পুরুষগুলো কী বোকা রে।

লোলা বলে, মেলা টাকা আছে লোকটার মনে হচ্ছে।

ক্যোরী বলে, হ্যাঁ সবাই তো তাই বলে।

লোলা বলে, যা না, একবার দেখাই করনা, দেখ না কী ওর বলবার আছে?

—আহ্‌া। কী বলবে আমি বুঝি আর জানি না। ওরকমভাবে কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি।

লোলা চোখ দুটো বড় বড় করে হেসে বলে, খেয়ে তো আর ফেলবে না, না হয় একটু মজাই করলি।

ক্যোরী মাথা নাড়ে, না।

—তুই যেন কেমন একটু অদ্ভুত লোলা বলে।

এমনি করে ক্যোরীর জীবনে সৌভাগ্যের শুরু হলো। মোটা মাইনেটা এখনো হাতে পায় নি সে। কিন্তু কী আসে যায়। সবাই বিশ্বাস করে তাকে। বিলাসের সব কিছুই সে পায়। সৌভাগ্য যেন পায়ে হেঁটে চলে আসে ওর কাছে। এই তো এই প্রাসাদতুল্য ঘরগুলো কেমন করে পেয়ে গেলো সে। ফুল আসে, চিঠি আসে, আরো অর্থ সৌভাগ্যের আমন্ত্রণ আসে। তবু ওর স্বপ্নটার শেষ নেই। একশো পঞ্চাশ ডলার, একশো পঞ্চাশ। আলাদীনের

প্রদীপের মতো সৌভাগ্যের দরজা খুলে যাবে। কী করবে সে এতো টাকা নিয়ে, তারই কল্পনা করে। এমন সব উদ্ভট সব চিন্তা ওর, যার কোন মানেই হয় না। পৃথিবীতে সম্ভব হয় না, এমন সব স্বপ্ন ও দেখে।

শেষ পর্যন্ত একশো পঞ্চাশ ডলার সে পেলো একদিন। প্রথমবার। নতুন চক্‌চকে নোট কুড়ি ডলার, দশ ডলার, আর পাঁচ ডলারের তাড়া।

টাকাটা দেওয়ার সময় ক্যাশিয়ার একটু বিনয়ে হাসে, মাথাটা দোলায় সসম্মানে।

—আসুন আসুন, মিস্ ম্যাডেণ্ডা, এই যে একশো পঞ্চাশ ডলার। শো-টা বেশ ভালো চল্‌ছে না ?

ক্যেরী বলে, হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে।

ওর পরেই একজন সখীদলের পুরোনো সঙ্গিনী এলো। ক্যেরী লক্ষ্য করলো ক্যাশিয়ারের গলার স্বরটা বদলে গেলো।

—কতো ?

একদিন ক্যেরীকেও ঠিক এমনি কঠিনভাবেই লোকটা জিজ্ঞেস করতো, কতো ? ক্যেরীর মনটা অতীতের দিকে ফিরে চলে যায় হঠাৎ। সেই জুতোর কারখানার ফোরম্যানের কাছ থেকে সাড়ে চার ডলার নেওয়া। টাকাটা দেওয়ার সময় এমনভাব দেখাতো লোকটা যেন কোন রাজপুত্র ভিক্ষা বিতরণ করছেন। আজকেও তেমনি একদল মেয়ে তার কাছে হাত পেতে টাকা নিচ্ছে চার ডলার, সাড়ে চার ডলার, পাঁচ ডলার। দুপুর বেলা আধ ঘণ্টা ছুটির মধ্যে একখানা শুকনো রুটি আর এককাপ কফি খেয়ে নেবে ওরা তাড়াতাড়ি, তারপর আবার সেই নিষ্ঠুর মেশিনগুলোর কাছে চলে যাবে প্রাণের রস নিঙড়ে দিতে। কতো সহজ ওর কাজ, কতো আরামের, কত সম্মানের। পৃথিবীটা কতো উজ্জ্বল সুন্দর। গাড়ীতে উঠলো না সে। আজ ভাবতে ভাবতে যাবে সে, হাঁটবে।

স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতা, হৃদয়াবেগের কোন প্রশ্নে টাকার কী বা মূল্য। ক'দিনেই তার নিরর্থকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। একশো পঞ্চাশ ডলার নিয়ে কী করবে ক্যেরী ভেবে পায় না। টাকাগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা যায়, স্পর্শ

করা যায়। ক'দিন তাই নিয়েই খুসী থাকা যায়। তারপর? হোটেলে সব টাকা লাগে না, কাপড় জামার তার এখন বেশী প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই আছে। দু-একদিন পরে আবার পাবে একশো পঞ্চাশ ডলার। এই অবস্থায় এমনি করে থাকতে হলে এত টাকার প্রয়োজন নেই তার। এর থেকে ভালোভাবে থাকতে গেলে, আরো অনেক বেশী টাকার দরকার। এতে কুলোবে না।

একজন সমালোচক এলেন ইণ্টারভিউ-এ। উদ্দেশ্যটা হলো দেখানো যে প্রসিদ্ধ লোকরা এমন কিছু অসাধারণ নন। ক্যেরীকে ভাল লাগলো তাঁর। স্পষ্টাস্পষ্টিই তিনি লিখলেন, ক্যেরীকে ভালো লেগেছে তাঁর। মিষ্টি, অমায়িক, ব্যবহার, সুন্দর চেহারা, ভাগ্যবতী ক্যেরী। সমালোচনাটা ছড়িয়ে পড়লো। 'হেরাল্ড' পত্রিকা নিমন্ত্রণ জানালো প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রীদের পার্টিতে। একজন তরুণ নাট্যকার এলেন, তাঁর ধারণা ক্যেরী ছাড়া আর কেউ তাঁর বক্তব্যটা ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। ক্যেরীব মাথা ঘুরে যায়, সে বোঝে না এত সব।

ক্যেরী বাড়তি টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখা শুরু করলো। আস্তে আস্তে এমন অবস্থায় এসে পৌছালো সে যখন হঠাৎ অনুভব করলো, জীবনকে উপভোগ করার রাস্তাটা রুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

প্রথমে ক্যেরী ভাবলো হয়তো গ্রীষ্মকাল বলেই এখন বিরক্তি আসছে। শুধু তাদের অভিনয়টাই চলেছে। আর সব বন্ধ। সারা শহরটা যেন নিঝুম হয়ে গেছে। আগের সে কোলাহল নেই, উজ্জলতা নেই, আবার সামনের সীজনের জন্য সবাই অপেক্ষা করছে ধৈর্য্য ধরে। কিছু করার নেই।

একদিন জানালার ধারে বসে থাকতে থাকতে সে লোলাকে বললো, কি বিশ্রী একা একা লাগছে ভীষণ, তোর লাগছে না?

লোলা বলে, নাতো, সব সময় একা একা লাগবে কেন? তুই তো আর বেরুবি না কোথাও। সে জন্যেই এমন খারাপ লাগে তোর।

—কোথা যাবো বল্?

—কেন, কত জায়গা রয়েছে। সে ভাবে তার ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে ফূর্তির কথা, বলে—তুই যে কারু সঙ্গে যেতে চাস না।

—যারা চিঠি লেখে তাদের সঙ্গে যেতে আমার ভালো লাগে না। তারা কী ধরণের লোক, সে আমি জানি—লোলা বলে, একা একা থাকা ঠিক নয়, বুঝলি একবার বললে তোর পায়ে হাজার হাজার লোক মাথা লুটিয়ে দেবে, অথচ তুই কারো দিকে ফিরে তাকাবি না—

ক্যেরী রাস্তার দিকে তাকিয়ে লোক চলাচল দেখে।

—কী জানি, ভাই।

অলস হাত দু'টো শ্রান্ত হয়ে এসেছে ওর। কিছু ভালো লাগে না।

একত্রিশ

ফার্ণিচার বিক্রী করে পঞ্চাশ ডলার পেয়েছে হাস্ট'উড্। এই পঞ্চাশ আর ক্যেরীর দেওয়া কুড়ি, আগের লুকোনো দশ। আশি ডলার নিয়ে সে একটা সস্তা হোটেলে উঠে এসেছে।

চুপচাপ বিমর্ষ অবসন্ন হয়ে বসে বসে সে কাগজ পড়ে শুধু। গ্রীষ্মটা কেটে গেলো, শীত এসে গেছে। তার সামনে আর কিছু নেই, শুধু একটা বিশ্রী শূন্যতা। টাকাটা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে। পঞ্চাশ সেণ্ট করে রোজ দিতে দিতে যখন দেখলো, আর বেশী দিন চলবে না, তখন সে উঠে এলো আরো সস্তা একটা হোটেলে। পঁয়ত্রিশ সেণ্ট। আরো ক'টা দিন বেশী চলবে।

প্রায়ই ক্যেরীর ছবি দেখতে পায় সে কাগজে। একদিন দেখলো একটা চ্যারিটি শো-এ নেমেছে সে। ওর থেকে কতদূরে চলে যাচ্ছে সে ধীরে ধীরে, অন্য এক জগতে, ওর ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। পোস্টারে ক্যেরীর ছবি দেখে সে থমকে দাঁড়ায় বিমর্ষভাবে। চেহারা আর পোষাক আরো জীর্ণ হয়ে এসেছে ওর। কোথায় ক্যেরী, কোথায় সে!

ক্যেরী যতদিন, ক্যাসিনোয় ছিলো, এতটা একা একা বোধ করে নি হাস্টউড্। সেপ্টেম্বরে ক্যাসিনোর দলটা টুরে বেরিয়ে গেলো। ওর পুঁজি কুড়ি ডলারে যখন ঠেকলো, পনের সেণ্ট দরের একটা নোংরা হোটেলে গিয়ে উঠলো সে। পরিবেশটা অসহ্য লাগে, চোখ বুঁজে সে আগের দিনের কথা

ভেবে এটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। বর্তমানটা যতো অন্ধকার হয়ে আসে, অতীতটা ততো উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠে ওর মনে।

এই অভ্যেসটা পেয়ে বসলো হার্স্টউডকে। সে যেন পুরোনো জীবনেই ফিরে গেছে। একদিন সে ভাবে, ফিজেরাল্ড ময়ে গল্প করছে মরিসনের সঙ্গে। মরিসন বললো, কী হে দক্ষিণপাড়ায় যাবে নাকি আমার সঙ্গে? কিছু জমি কেনার তালে আছে সে ওখানে।

হার্স্টউড্ বলে, না হে, এখন না, জড়িয়ে পড়েছি আমি অনেকগুলো ব্যাপারে।

হার্স্টউড্ হঠাৎ চমকে ওঠে, কথাগুলো সে সত্যিই বললো নাকি?

পরের বার আর সন্দেহ হলো না। সে বলছিলো, লাফাতে পারছো না, লাফাও লাফাও, এই বোকাটা।

অভিনেতাদের সে একটা মজার গল্প শোনাচ্ছিলো। গলার স্বরে সে যখন সম্বিৎ ফিরে পেলো, পাশের একটা লোক অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মজার গল্পটায় হাসছিল হার্স্টউড, এক মুহূর্তে হাসিটা ওর মিলিয়ে গেল। লজ্জা পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো সে।

'ইভনিঙ্ ওয়ার্ল্ডে' বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে সে দেখলো ক্যাসিনোয় নতুন বই হচ্ছে। হঠাৎ একটা হোঁচট খেলো সে মনে মনে, ক্যেরী তাহলে ওখানে নেই আর। অনেকখানি বোধ হয় নির্ভর করছিলো সে ক্যেরীর ওপর। ক্যেরী শহর ছেড়ে চলে গেছে, এখন! কবে ফিরবে সে, কে জানে। আশ্চর্য্য, এত বড় জরুরী ব্যাপারটা সে আগে খেয়ালই করে নি। হাতে আর মাত্র দশ ডলার আছে।

আচ্ছা, এখানে যারা থাকে তাদের কী করে চলে, কী করে ওরা? কিছু করে বলে তো মনে হয় না। বোধ হয় ভিক্ষে করে। বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই। তা না'হলে চলে কী করে ওদের? এ রকম লোকদের সে আগে কত পয়সা ভিক্ষে দিয়েছে। হয়তো সেও অমনি করে চালিয়ে নিতে পারে। না, না, না—অসম্ভব, অসম্ভব। হার্স্টউড্ শিউরে ওঠে।

হোটেলটায় বসে বসে একদিন শেষ টাকা ক'টাও ফুরিয়ে গেল। পঞ্চাশ

সেণ্ট মাত্র আছে আর। টাকা বাঁচাতে গিয়ে স্বাস্থ্যটা সে বাঁচাতে পারে নি। সে বলিষ্ঠতা আর নেই তার। স্যুটটা আগের মাপের, ঢল্‌ঢলে হয়ে গেছে এখন। সবটা মিলিয়ে অদ্ভুত দেখায় হার্স্ট উডকে।

নাঃ, একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কী বা করবে? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো হার্স্টউড্। আর একটা দিন কেটে গেলো, পুঁজি ঠেকলো শেষ কুড়ি সেণ্টে। কালকে খাবার মতো পয়সাও নেই আর। কাল কী খাবে ও?

মরিয়া হয়ে হার্স্টউড্ এবার ব্রডওয়ের দিকে চললো। ব্রডওয়ে সেণ্ট্রাল হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। মনটাকে এখনও ঠিক করতে পারছে না। একটা মোটাসোটা বেয়ারা পাশের ছোট দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছিল। দেখা যাক্ না ওকে বলে। হার্স্টউড্ এগিয়ে গেল লোকটার কাছে। বেয়ারাই তো।

—ভাই, এখানে কোন কাজ-টাজ খালি আছে বলতে পারো?

লোকটি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হার্স্টউড্ বলে যায়, একেবারে বেকার ভাই, টাকা পয়সাও কিছু নেই। কোন একটা কিছু যাহোক। আগে কী করতাম সে সব বলে আর কী হবে। যদি একটা কিছু করে দিতে পারো, বড় উপকার হয়। দু' চার দিনের জন্যে হোক, তাই, তাই। কিছু একটা করতেই হবে আমাকে। হবে কিছু ভাই?

বেয়ারাটা তাকিয়েই থাকে, প্রথমে কথাটায় সে কোন কানই দিতে চায় না। যখন দেখলো হার্স্টউড্ বলেই চলেছে, সে বললো, আমি কিছু বলতে পারি না, ভিতরে গিয়ে খোঁজ করো বরং।

এতেই হার্স্টউড্ কিন্তু ভরসা পেয়ে গেলো। বললে, ভাবলাম তুমি বোধ হয় কিছু বলতে পারবে।

লোকটা বিরক্তভাবে মাথা নাড়লো শুধু।

হার্স্টউড্ সোজা এবার ক্লার্কের টেবিলে চলে গেল। হোটেলটার একজন ম্যানেজার তখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। হার্স্টউড্ তাঁর দিকে তাকিয়েই সোজা বললো, কোনো একটা কাজ দিতে পারেন স্যার আমাকে, কিছু দিনের জন্যে? একটা কিছু না পেলে আর চলছে না আমার।

ম্যানেজার ওর দিকে তাকালেন এমন ভাবে যেন দৃষ্টিটাই বলছে, হ্যাঁ, সেতো দেখতেই পাচ্ছি।

হার্স্টউড্ আমতা আমতা করে বলে এবার, এখানে এলাম মানে আমি নিজেও এক সময় ম্যানেজারি করেছি—একটা অঘটন ঘটে,'—সে সব কথা আপনাকে আর বলে কী হবে? যদি সপ্তাহ খানেকের জন্যও একটা কিছু দিতে পারেন আমাকে।

ম্যানেজারটির মনে হলো হার্স্টউডের চোখমুখ ছলছল করছে। বললেন, কোন্ হোটেলে ম্যানেজারি করেছেন?

হার্স্টউড্ বললো, হোটেল ঠিক নয়, চিকাগোর ফিজেরাল্ড ময়ের ম্যানেজার ছিলাম আমি প্রায় পনের বছর।

—তাই নাকি? চাকরীটা গেলো কী করে?

হার্স্টউডের চেহারাটা খুঁটিয়ে দেখেন ম্যানেজারটি।

—সে এক নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে। সে কথা এখন আর আলোচনা করে লাভ কি বলুন। যদি আপনি নেহাতই জানতে চান, খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন। এখন আমার অবস্থা তো দেখছেন হযতো বিশ্বাস করবেন না, আজ সারাদিন কিছু খাই নি আমি।

হার্স্টউডেব কথা শুনে ম্যানেজারের দয়া হয়েছিল, অথচ এ রকম একটা লোককে নিয়ে কী করা যায় ভেবে পাচ্ছিলেন না।

ক্লার্ককে ডেকে বললেন, দেখো, ওল্‌সেনকে ডাকো তো।

হেড খানসামা ওল্‌সেন আসতে ম্যানেজার বললেন, ওহে, নিচে তোমার কোন কাজটাজ আছে, এই লোকটিকে দিতে পারো কিছু?

ওল্‌সেন বললো, ঠিক বলতে পারছি না, স্যার। লোক তো সব আছে। তবে আপনি যদি বলেন, একটা কিছু দেখে দেওয়া যায়।

—তাই দাও তাহলে দেখে। আর হ্যাঁ দেখো, কিচেনে নিয়ে যাও একে, উইলসনকে বলে কিছু খাইয়ে দাও।

ওল্‌সেন বললে, আচ্ছা স্যার।

হার্স্টউড্ ওল্‌সেনের পিছু পিছু চললো। ম্যানেজারের সামনে থেকে এলেই

হেড-পোর্টারের ভঙ্গী পাল্টে গেল, যত শালা জুটবে এখানে, নাও কাজ খুঁজে বেড়াও এখন।

হার্স্ট উড্ কোন কথা বললো না। পোর্টারটাকে মনে মনে ঘৃণা করছে সে।

লোকটা বাবুর্চির কাছে গিয়ে বললো, ওহে একে কিছু খেতে দাও, মেজ-বাবুর হুকুম।

লোকটি তাকিয়ে দেখলো হার্স্টউডকে, ওর চোখে ভদ্রলোকের আভাস ছিল বোধ হয় লক্ষ্য করলো সে। ভদ্রভাবেই বললো, বসো।

এমনি করে হার্স্টউড্ ব্রডওয়ে সেণ্ট্রাল হোটেলে চাকরী পেয়ে গেল। ঝাড়ুদারের কাজটা ওকে আর দিতে পারলো না কেউ। ওর কাজ হলো উনুনের আগুনটা ঠিক রাখা, বারান্দার টুকিটাকি কাজ, যা কিছু হাতের কাছে জোটে তাই। বাবুর্চি, খানসামা সবাই ওর ওপরওয়ালা। ওর চেহারাটা দেখে এরা কেউ খুসী হয় নি, তাছাড়া বিমর্ষ গম্ভীর মেজাজ কেউ পছন্দ করে না।

হতাশায় কঠিন হয়ে গেছে হার্স্ট উড্, এদের হম্বি-তম্বি, ঠাট্টা-বিদ্রুপ সবই সহ্য করে সে বিনা প্রতিবাদে। চিলেকোঠার এক কোণে ঘুমোয় সে, বাবুর্চিটা যা দেয় তাই খায়।

সপ্তাহে ক' ডলারই বা পায় সে, তাই বাঁচাবার চেষ্টা করে। ওর শরীরে বেশীদিন তো আর এসব কাজ সইবে না।

ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন ওকে একটা কয়লার দোকানে যেতে হলো। বরফ পড়ে রাস্তাঘাট স্যাঁতসেঁতে পিছল হয়ে আছে। জুতোটা বেশ ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠলো।

ম্যাজমেজে শরীর নিয়ে ফিরে এলো সে। সারাদিন সে বসে বসেই কাটালো যতদূর পারে। অন্যেরা বিরক্ত হলো। শালা নবাবপুত্তুর রে। বিকেল বেলা কয়েকটা ট্রাঙ্ক সরাবার জন্য ওকে ডাকলো একটা খানসামা একটা। বড় ভারী ট্রাঙ্ক সে আর কিছুতেই তুলতে পারলো না। টানাটানি করতে দেখে হেড-খানসামা বললো, কী হলো হে, তুলতে পারছ না?

এতক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করছিল হার্স্টউড্ এবার ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, পারছি না।

লোকটি ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে হার্স্টউডকে। বললো, অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

হার্স্টউড্ বললো, তাই যেন মনে হচ্ছে।

—তাহলে যাও বসে থাকো গিয়ে।

বসতেও পারলো না সে, খানিক পরে কোন মতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। পরের দিনটাও শুয়েই কাটাতে হলো তাকে।

একটা বেয়ারা রাত্রের ক্লার্ককে রিপোর্ট করলো, হুইলারটার অসুখ করেছে।

—কী হয়েছে কি?

—কী জানি খুব জ্বর শুনলাম।

· হোটেলের ডাক্তার হার্স্টউডকে দেখে বললেন, ওকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, নিউমোনিয়া হয়েছে।

অসুখটা সারলো সপ্তাহ তিনেকের মধ্যেই, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পেতে মে মাস এসে গেলো। ভীষণ দুর্ব্বল হার্স্টউড্।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো হার্স্টউড্ নয়, হার্স্টউডের কঙ্কালখানা একটু থলথলে চামড়ায় ঢাকা। মুখটা ফ্যাকাশে, চোখ দুটো বসে গেছে, হাত দুটো শীর্ণ। দু'একটা পুরোনো ছেঁড়া জামা দিয়েছে ওরা, আর খুচরো কিছু পয়সা, এবং উপদেশ—কোন গরীব-খানায় গিয়ে থাকার চেষ্টা করে।

গরীব-খানাতেই এলো সে। থাকার জায়গা শুধু। তারপর ভিক্ষা-বৃত্তির আর কত দেরী?

না খেয়ে তো আর মানুষ বাঁচে না।

সেকেণ্ড এভিনিউতেই প্রথম শুরু করলো সে। পার্ক থেকে বেরিয়ে এক ভদ্রলোক আরাম ক'রে বেড়াতে বেড়াতে আসছিলেন। কাছে আসতে হার্স্ট-উড এগিয়ে গিয়ে বললো, কিছু সাহায্য করতে পারেন আমাকে স্যার।

ভদ্রলোক তাকালেনও না। পকেট থেকে ক'টা খুচরো পয়সা বের করে ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে।

হার্স্টউড বললো, অজস্র ধন্যবাদ স্যার। ভদ্রলোকটি খেয়ালও করলেন না।

পয়সা গুলো কুড়িয়ে নিলো সে। গুনে দেখলো দশ সেণ্ট। প্রথম বারেই কিছু পেয়ে খুসী হলো হার্স্টউড্। লজ্জাও লাগলো, ভিক্ষে করছে সে। ঠিক করলো আর পঁচিশ সেণ্ট হলেই আজকের মতো ক্ষান্ত দেবে সে। আজকের দিনটাতো চলে যাবে।

লোকের মুখ দেখে দেখে ঠিক করে হার্স্টউড্ এর কাছে চাইবে কি চাইবে না। তাও বার দুয়েক কিছুই পেলো না। কেউ দিলো একটা সেণ্ট, কেউ দুটো। প্রথম ভদ্রলোকটির মতো দশ সেণ্ট এক সঙ্গে আর কেউ দিলো না। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আরো গোটা কুড়ি সেণ্ট পেলো সে।

পরের দিনও এমনি। কেউ দরাজ হাতেই দিলো দশ সেণ্ট, কেউ দিলোই না, কেউ দু'এক সেণ্ট। হার্স্টউডের মনে হলো চেষ্টা করলে মুখ দেখে বোঝা যায় কে দেবে কে দেবে না, কোন্ লোকটা ভালো, কোন্ লোকটা খিট্‌খিটে।

এই অবস্থাতেই সে দেখলো একদিন একটা লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে গেলো ভিক্ষা চাওয়ার জন্য। তাইতো, তাকেও যদি নিয়ে যায়? কীই-বা করবে সে। শুধু একটা অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট আশা, হয়তো ভালো একটা কিছু ঘটে যাবে। ভিক্ষে আর করতে হবে না তাকে।

একদিন সকালে সে বিজ্ঞাপন দেখলো ক্যাসিনো কোম্পানী ফিরে এসেছে। ক্যেরীর নাম রয়েছে ওদের পোষ্টারে। এই দুর্দশার কঠিন দিনগুলোতে সে রোজই ভেবেছে ক্যেরীর কথা। ক্যেরী এখন স্বনামধন্যা, অনেক টাকা সে পায় এখন নিশ্চয়ই। তবু তার কাছে যেতে মন ওঠে না। একদিন যখন কিছুই প্রায় মিললো না, সারাদিন উপবাসের পর সে ঠিক করলো, যাই, দেখিই না, এত টাকা রোজগার করছে সে, ক'টা ডলার কি আর দেবে না আমাকে।

পরদিন বিকালে সে ক্যাসিনোর দিকে পা বাড়ালো। অনেকবার ঘোরা-ফেরা করে স্টেজে ঢোকার রাস্তাটা খুঁজে বার করে, পার্কের ধারে বসে রইলো সে। সাড়ে ছ'টার সময় স্টেজে ঢোকার রাস্তাটার কাছে ঘোরাফেরা করতে লাগলো হার্স্টউড্। ব্যস্ত-সমস্ত ভাব যেন কাজে যাচ্ছে সে, অথচ চোখ দুটো তীক্ষ্ণ আগ্রহে চেয়ে দেখে এদিক ওদিক, ক্যেরী যেন ঢুকে না যায়।

অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসতে শুরু করেছেন। হার্স্টউডের এবার সংকল্প

উপস্থিত হয়। ওই বুঝি এলো ক্যেরী। এগিয়ে গিয়ে দেখলো না অন্য আর কেউ।

এখুনি তো আসবে সে, আপন মনে বলে হার্স্টউড্। কেমন করে দেখা করবে সে, কী বলবে? ভয় করে অস্বস্তি লাগে। আবার এদিকে আশঙ্কা হয়, অন্য কোন দিক দিয়ে ঢুকে গেলো না তো ক্যেরী? এদিকে খিদের পেটটা মোচড় দিচ্ছে।

একটার পর একটা গাড়ী আসছে, কতলোক, সুসজ্জিত, হাসিখুসী মানুষ। উদ্বিগ্নচিত্তে দেখে হার্স্টউড্, কখন আসবে ক্যেরী। তারপর একসময় অন্যমনা হয়ে শুধু যন্ত্রের মত লক্ষ্য করে চলে।

. হঠাৎ একটা গাড়ী এসে দাঁড়ালো, গাড়োয়ানটা লাফিয়ে নেমে দরজা খুলে দিলো। হার্স্টউড্ কিছু বলা বা করার আগেই দুটি মহিলা নেমে দ্রুত পায়ে ঢুকে গেলো। হার্স্টউডের মনে হলো, ক্যেরীকে দেখেছে সে। এদেরই একজন ক্যেরী। কিন্তু এত হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এলো সে, হার্স্টউড্ ধরতে পারলো না। আরো খানিক্ষণ অপেক্ষা করলো সে, যদি ও ক্যেরী না হয়। এক সময়ে দেখলো স্টেজের দরজাটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেলো, এবার দর্শকরা আসতে শুরু করেছে। তাহলে ক্যেরীই।

হার্স্টউড্ এবার ফিরলো। ভীড থেকে চলে এসে মনে মনে বললো, কিছু যে খেতেই হবে, আর তো পারি না, ভগবান।

ব্রডওয়ে যখন বিশেষ উজ্জ্বল উচ্ছল আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে, ঠিক এই সময়ে ব্রডওয়ে আর টোয়েন্টিসিক্সথ স্ট্রীটের মোড়ে এসে দাঁড়ায় একটি অদ্ভুত লোক। ব্রডওয়েতে যখন সুবেশ, প্রমোদলিপ্সু নারী-পুরুষ ভিড় জমাতে শুরু করে, হাসি-ঠাট্টা কলধ্বনিতে ভরিয়ে তোলে ব্রডওয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাজার পথে জীবন উপভোগের উপাদান খোঁজে, তখন এসে দাঁড়ায় এই পাগলাটে গোছের লোকটি। আগে কোন সেনা-বাহিনীতে কাজ করতো সে এখন ধর্ম্ম কর্ম্ম করে সে। জীবনে বহু আঘাত বহু কষ্ট সহ্য করে সে ঠিক করেছে পুণ্যলাভের প্রধান রাস্তা হলো দরিদ্রনারায়নের সেবা।

সেবার পথটা কিন্তু তার অভিনব। এটা তার নিজের আবিষ্কার। ঠিক এই সময়ে

এই জায়গায় এসে যারা ওর কাছে আবেদন জানায় তাদের ও রাত্রে থাকার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। তার নিজেরও থাকার জায়গা নেই, সে দিকে তার খেয়াল নেই।

একটা লম্বা কোট পরে, কান পর্য্যন্ত টুপিটা টেনে সে দাঁড়িয়ে থাকে, রাস্তার লোকচলাচল লক্ষ্য করছে। আস্তে আস্তে এসে বসে ওর রাতের অতিথিরা। অনেকেই জানে ওর দয়ার কথা।

সি দিনও সে এসে দাঁড়িয়েছে। একটা পুলিশ যেতে যেতে সেলাম করলো ওকে, ক্যাপ্টেন বলে। রাস্তার একটা ছোঁড়া চেনে ওকে, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। অন্যেরা সবাই চেনে না, এমনি একটা বেকার লোক দাঁড়িয়ে আছে, কেউ খেয়ালই করে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু' একজন করে জুটতে লাগলো। একজন এদিক ওদিক তাকিয়ে এসে পাশটায় দাঁড়ালো, একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এলো, একবার দেখা দিয়ে আবার চলে গেলো ও-পাশটায়। সৈনিকটি কোণ পর্য্যন্ত পায়চারী শুরু করলো শিষ দিতে দিতে।

ন'টা বাজতে ব্রডওয়ের কোলাহল একটু থেমে এলো। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক থেকে দুটি একটি করে লোক সৈনিকটির ধারে পাশে গোল হয়ে দাঁড়ায় যেন ভয়ে ভয়ে।

শীতটা ক্রমশঃ কন্‌কনে হয়ে উঠছে, বোধ হয় আর সহ্য করতে না পেরেই একটি মূর্ত্তি এগিয়ে আসতে থাকে সেই জটলাটির দিকে। ওর ভঙ্গীতে যেন বেশ একটা দ্বিধা-লজ্জা-সংকোচ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ও যেন থামবে না এমনি চলেছে। হঠাৎ সামনে এসেই দাঁড়িয়ে গেলো মূর্ত্তিটা।

ক্যাপ্টেন চিনলো মূর্ত্তিটাকে। কোন আপ্যায়নের রেওয়াজ নেই এখানে। আগন্তুকটি বিড় বিড় ক'রে কি বললো অনুনয়ের ভঙ্গীতে। ক্যাপ্টেন রাস্তার পাশে দাঁড়াতে বললো ওকে ইঙ্গিত করে। এবার আরো ক'টা মূর্ত্তি এগিয়ে এলো এ-পাশ ও-পাশ থেকে। নেতাকে ওরা কেউ প্রথম মূর্ত্তিটার মত সেলামও জানালো না। সোজা কোণটায় রাস্তার পাশে সেই লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

একজন বললো, বাব্বা সাংঘাতিক শীত। আর একজন উত্তর দিলো, যাবে কিনা শালা তাই জানান দিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় আর একটি মূর্তি বললো, এইরে আবার জল হবে মনে হচ্ছে।

দলে এখন গুটি দশেক লোক হয়েছে। এর মধ্যে তিনচারজন চেনে পরস্পরকে, তারাই গল্প করছে। ক'জন একটু সরে দাঁড়িয়েছে। এদের সঙ্গে মিশতে চায় না অথচ সাহায্য চায়।

হঠাৎ গল্প বন্ধ করে দিল ক্যাপ্টেন। এগিয়ে এসে বললো, সবারই শোবার জায়গা চাই তোমদের, য়্যা ?

একটু নড়ে-চড়ে গুঞ্জন করে উঠলো সবাই, হ্যাঁ।

—আচ্ছা লাইন দিয়ে দাঁড়াও সব এখানে, দেখি কী করা যায়, আমার নিজের পকেটে তো এক সেণ্টও নেই।

ট্যারা বাঁকা একটা লাইন হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আবার কেউ কেউ গল্প শুরু করছিল ক্যাপ্টেন ধমক দিয়ে উঠলো, চুপ।

তারপর চলন্ত লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো সে, ভদ্রমহোদয়গণ, এই যে লোকগুলিকে দেখছেন কারো এদের রাত্রে শোবার জায়গা নেই, বিছানা তো দূরের কথা। এই শীতে রাস্তায় থাকতে পারে কেউ, আপনারাই বলুন। বারো সেণ্ট ক'রে হলে এক এক জনের শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আমি। বলুন, কে কে দেবেন আপনারা ?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

—আচ্ছা, ভাইসব, যতক্ষণ কেউ না দেন এখানেই অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। বারো সেণ্ট এমন কিছু বেশী পয়সা নয়, কেউ না কেউ দেবেনই।

একটি যুবক উঁকি মেরে দেখে বললো, এই নিন্ পনের সেণ্ট। এর বেশী আর আমার কাছে নেই।

—এই তো পনের সেণ্ট পাওয়া গেছে। তুমি এগিয়ে এসো। হ্যাঁ, একজন।

একজনের কাঁধটা ধরে ক্যাপ্টেন তাকে মার্চ্চ করিয়ে নিয়ে একটু দূরে দাঁড় করিয়ে দিলো। ফিরে এসে আবার শুরু করলো, তিন সেণ্ট রয়ে গেছে হাতে। এদের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। হাঁ, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো, বারো। বারোজন আছে। আর ন'সেণ্ট হলে আর এক-জনের বিছানার ব্যবস্থা হয়ে যায়। হাঁ, বলুন কে দেবেন ? কে আছেন, মহানুভব।

এবার একটি আধাবয়সী ভদ্রলোক দিলেন পাঁচ সেণ্ট।

—হ্যাঁ, আর চার সেণ্ট। চারটে সেণ্ট হলেই আর একটা লোক শুতে পারে আজকের রাতটা। ভদ্রমহোদয়গণ, আজ বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। আপনাদের ঘর আছে, গরম বিছানা আছে। এদের কথা ভেবে দেখুন একবার।

আর একজন ক'টা সেণ্ট দিলো।

এইতো, দু'জনের হয়েছে। হাতে রইলো পাঁচ সেণ্ট। আর কে দেবেন বলুন সাত সেণ্ট। আর একজনের হয়ে যাচ্ছে তা হলে।

একজন বললেন, আমি দিচ্ছি।

হার্স্টউড সিক্সথ এভিনিউ থেকে বেরিয়ে থার্ড এভিনিউ দিয়ে আসছিল। এখন আর ক্যেরীর সঙ্গে কেমন করে দেখা করা যায়। এগারোটার আগে থিয়েটার ভাঙ্গবে না। গাড়ীতেই আবার চলে যাবে সে। এমন অবস্থায় কি ধরতে পারবে ও। ক্লান্ত অবসন্ন লাগছে, ক্ষিদেয় পেটটা মোচড দিচ্ছে। আজ আজ আর পারবে না সে। কাল দেখা যাবে আবার। কী বা খাবে সে, কোথাই বা শোবে?

ব্রডওয়েতে এসে ক্যাপ্টেনের চারিপাশে জটলাটা দেখে প্রথমে সে ভাবলো কোন পাদ্রী হবে হয়তো। অথবা পেটেণ্ট ওষুধের কোন দালাল। ম্যাডিসন-স্কোয়ার পার্কের দিকে যেতে গিয়ে তার নজর পড়লো সেই দুটি লোক যাদের বিছানা ঠিক হয়ে গেছে। আলোয় চিনতে পারে সে লোক দুটিকে, হার্স্টউডের স্বগোত্র এরা, ওরই মত বেকার হতভাগ্য গরীব। কী ব্যাপার? ফিরে এসে শুনতে লাগলো সে ক্যাপ্টেনের বক্তৃতা।

তারপরে দেখলো লাইনের শেষে এসে দাঁড়ালো আর একটি লোক। হার্স্টউডও দাঁড়িয়ে গেলো লাইনে। আজ ভীষণ ক্লান্ত সে। শোবার একটা জায়গা, বিছানা। একটা কষ্ট তো দূর হবে। কাল দেখা যাবে তারপর।

হার্স্টউডের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের আজ রাত্রের মত ভাবনা নেই আর। একটু সহজভাবে বলছে তারা, পরস্পরের প্রতি কেউ সহানুভূতি জানায়, কেউ নিজের গত দিনের কথা শোনায়। রাজনীতি, ধর্ম্ম, থিয়েটার কিছুই বাদ যায় না।

লাইন-বাঁধা দলটার মধ্যে কেউ আছে টেরা, কেউ খোঁড়া, কেউ হুলো, কেউ হয়তো বোকাধরণের, মাথায় কিছু ঢোকে না তাদের। ওদেরই সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে হার্স্টউড্ রাতের আস্তানার আশায়। দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যাথা হয়ে গেল ওর, এখুনি যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বে সে। শেষ পর্য্যন্ত ওর পালাও এলো।

—বারোটা সেণ্ট ভদ্রমহোদয়গণ। বারো সেণ্ট হলে এই লোকটির একটা বিছানা জোগাড় করে দেওয়া যায়। ভেবে দেখুন আপনারা—

হার্স্টউডের গলা পর্য্যন্ত কী একটা ব্যথা উঠলো, গিলে ফেললো সেটাকে। সত্যিই কিছু একটা, না মানসিক একটা কল্পনা মাত্র তা ও জানে না। ক্ষুধা আর দুর্ব্বলতায় ও কাপুরুষ হয়ে গেছে।

একটি অপরিচিত পথিক শেষ পর্য্যন্ত এগিয়ে এলো ওর জন্যেও। ক্যাপ্টেন সদয়ভাবে হার্স্টউডের ঘাড়ে হাত দিয়ে বললো, যাও ওখানে দাঁড়াও গিয়ে।

অনুগৃহীতদের দলে দাঁড়িয়ে হার্স্টউড্ একটু ভরসা পেলো। পৃথিবীটা সত্যি খারাপ নয় তাহলে, এমনি ভালো সৎলোকও আছে যারা পরের জন্য সাহায্য করে!

পাশের লোকটি বললো, ক্যাপ্টেন বেশ ভালো লোক, না হে, কী বলো।

হার্স্ট উড্ ঘাড়নেড়ে জবাব দিলো, হু। ওপাশ থেকে একজন বললো, ওহ্ আজ মেলা খদ্দের দেখছি।

আর একজন হতভাগ্য বললো, হু তা প্রায় শ'খানেক হবে।

একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। সুসজ্জিত এক ভদ্রলোক গাড়ী থেকে হাতবাড়িয়েই একখানা নোট দিলেন। ক্যাপ্টেন সাদামাঠা একটা ধন্যবাদ জানিয়ে আবার এসে দাঁড়ালো নিজের জায়গায়। গাড়ীটা চলতে শুরু করলে, লোকগুলো ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগলো কে এই দয়ালু লোকটি।

এমনি করে এক সময় দুজন বাদে সবার বিছানা জোগাড় হয়ে গেলো। আর মাত্র আঠারো সেণ্ট হলে বাকী দু'জনেরও হয়ে যায়। কিন্তু শেষ আঠারো সেণ্ট আর বুঝি আসে না। ক্যাপ্টেন এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো—আঠারো সেণ্ট মাত্র ভদ্রমহোদয়গণ, আজ রাতের মত—

হার্স্টউডের সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাবে এবার। এবার লুটিয়ে পড়বে সে রাস্তার ওপরেই। গোঙানিটা কোনরকমে চাপে। আর একটু, একটু কোন রকমে।

শেষ পর্য্যন্ত একটি ভদ্রমহিলা এলেন। বোধ হয়, কোন অভিনেত্রী থিয়েটার থেকে ফিরছেন। সঙ্গে একটি পুরুষ রয়েছে এগিয়ে দেবার জন্যে। হার্স্টউডের মনে পড়ে ক্যেরীর কথা, তার নিজের স্ত্রীর কথা, একদিন সেও এমনি করে নিয়ে যেতো। পুরুষটি এক ডলারের নোট দিলো একখানা।

—ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। আজ রাতের মতো সবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। কালকের জন্যও কিছু রইলো, ধন্যবাদ।—

ক্যাপ্টেন খুসী হয়েছে। ওর দায়িত্বটা নামলো আজ রাত্রের মতো। লাইনটার মাথায় দাঁড়িয়ে সে মিলিটারী ঢঙে বলে, ফরওয়ার্ড। যাত্রা শুরু হলো আস্তানার দিকে। দু'একটা পুলিশ, দোকানের দু'একটা লোক মাথা নাড়ে ক্যাপ্টেনকে দেখে। ওকে চেনে ওরা, গলির মধ্যে একটা পুরোনো বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো দলটি। একটা হোটেলই। সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ক্যাপ্টেন জানে, ওর আশায় বসে আছে কর্ত্তারা।

ক্যাপ্টেন ভেতরে ঢুকে গেলো পাশের দরজা দিয়ে। তারপর গেট্‌টা খুলে হাঁকলো চ'লে এসো সবাই। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে।

সবাই ঢুকে গেলে ক্যাপ্টেন কোট-টা একবার ঝেড়ে নিলো, তারপর রাস্তার অন্ধকারে মিশে গেলো।

হার্স্টউড্ অন্ধকার ঘরের মধ্যে ওর বাঙ্কটায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়লো। মনে মনে বললে, নাঃ, না খেলে বাঁচা যাবে না। কাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতেই হবে।

বত্রিশ

সন্ধ্যাবেলা ক্যেরী অভিনয়ের শেষে হোটেলে ফেরার মুখে প্রসাধনটা ঠিক করে নিচ্ছিল, এমন সময় দরজার কাছে একটা গোলমাল শুনে ফিরে তাকালো সে। গলাটা যেন চেনা লাগছে। কার?

—ছাড়ো হে, ছাড়ো না। মিস্ ম্যাডেণ্ডার সঙ্গেই দেখা করবো আমি।

—আগে কার্ড দিন আপনার।

—ওহ্ হো, এই নাও বাবু। ছাড়ো দিকি এবার।

কোটের খস্ খস্ আওয়াজ শোনা গেল একটা। তারপর দরজায় ঘা পড়লো। দরজাটা খুলতেই ড্রুয়ে এসে ঢুকলো—

আরে, আরে, কী ব্যাপার, ক্যেরী? ঠিকতো কেমন আছো? তোমাকে দেখেই ঠিক চিনিছি আমি।

ক্যেরী এক পা পিছিয়ে এলো।

—কী, আমার সঙ্গে শেক্ হ্যাণ্ডও করবে না না-কি? ও তুমি তো দেখছি পুরো রাজরাণী হয়ে গেছ এখন। ঠিক আছে, তাতে কী? হাত দাও।

ক্যেরী হাতটা বাড়িয়ে দিলো। আর কিছু না হোক ড্রুয়ের এই অমায়িক ব্যবহারের জন্যে কৃতজ্ঞতাও তো আছে। একটু বয়স বেড়েছে ড্রুয়ের, কিন্তু আছে ঠিক তেমনি। তেমনি ধোপ-দুরস্ত ভালো স্যুট, তেমনি বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি টক্‌টকে উজ্জ্বল মুখ।

—গেটের লোকটা ঢুকতে দিচ্ছিল না, জানো। একটা ডলার খসিয়ে তবে ছাড়লো ব্যাটা। দিলাম, তোমাকে তো আগে থেকেই ঠিক চিনেছি আমি। খুব ভালো শো হচ্ছে। তুমি তো একেবারে মাতিয়ে দিয়েছ। এমনি যাচ্ছিলাম, ভাবলাম দেখি কী হচ্ছে। সময় কাটানো আর কি। প্রোগ্রামে অবশ্য নামটা দেখেছিলাম খেয়ালই ছিলো না। তারপর স্টেজে তোমাকে দেখেই চিনলাম, তখন মনে পড়লো নামটাও। চিকাগোতে এই নামেই তুমি নেমেছিলে না? বলো, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি না?

ড্রুয়ের কথা বলার ভঙ্গীতে ক্যেরী অভিভূত হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বলে, হ্যাঁ, ঠিক।

—ঠিক মনে আছে আমার, দেখলে তো! তারপর কেমন আছো?

ক্যেরী বলে, ভালই আছি। ড্রুয়েকে দেখে সে হতভম্ব হয়ে গেছে। একটু পরে বলে, তুমি কেমন ছিলে?

—আমি, বেশ ভালই। এখন তো এখানেই রয়েছি।

—ও তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ছ'মাস হলো, এখানে একটা ব্রাঞ্চের চার্জ্জ নিয়ে এসেছি।

—বাঃ, বেশ ভালো হয়েছে তো।

ড্যুয়ে জিজ্ঞাসা করে এবার, তারপর স্টেজে কবে থেকে নেমেছো?

—তা প্রায় বছর তিনেক হলো।

—বলো কি? এই প্রথম শুনলাম আমি। অবশ্য আমি জানতাম একদিন না একদিন স্টেজে নাম করবে তুমি। আমি বলতাম না, তুমি ভালো অভিনয় করতে পারবে, বলো তুমি?

ক্যেরী হেসে বলে, হ্যাঁ, বলতে তুমি।

—তোমাকে কিন্তু অদ্ভুত ভালো দেখাচ্ছে, এত উন্নতি কারু চট্ করে দেখা যায় না, ঠিক কিনা বলো? তুমি তো একটু লম্বাও হয়েছ, না?

—আমি? তা বোধ হয় একটু হয়েছি।

ড্যুয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ক্যেরীর পোষাক, ওর চুলগুলো, তারপর তাকায় ওর চোখের দিকে। ক্যেরী কিন্তু আগের থেকে সাবধান হয়েছে এখন, চোখ নামিয়ে নেয় সে। স্পষ্ট বুঝতে পারে যে ড্যুয়ে আগের ঘনিষ্ঠতা ফিরিয়ে আনতে চায় আবার।

ক্যেরী রুমালটা, পার্স আর টুপিটা তুলে নেয়। যাবার ইঙ্গিত এটা।

ড্যুয়ে বলে, চলো না আমার সঙ্গে ডিনারে। বাইরে আমার একটি বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যেরী বললো, না, আজ তো হবে না, ভোরবেলা কাজ আছে আমার।

—মরুক্‌গে কাজ। চলো আমার সঙ্গে। লোকটিকে ভাগিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।

ক্যেরী বলে, না, না। আজ হবে না, আজ পারবো না আমি।

—বেশ তা'হলে ডিনার নাই খেলে, একটু গল্প করি এসো।

ক্যেরী ঘাড় নাড়ে, না আজ না, অন্য আর এক সময় কথা হবে এখন।

ক্যেরী লক্ষ্য করে প্রত্যাখানের ফলে ড্যুয়ের মুখের ওপর দিয়ে একটা চিন্তার ঢেউ খেলে গেল। মনে হয় ও যেন বুঝতে পেরেছে অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে পৃথিবীতে। ক্যেরীর দয়া হলো, ড্যুয়ে সত্যি বরাবরই ওকে পছন্দ করতো।

রূঢ় আঘাতটার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যই যেন সে বলে, কাল হোটেলে এসো তুমি। আমার সঙ্গে বরং ডিনার খাবে।

ড্রুয়ের মুখটা আবার উজ্জল হয়ে ওঠে। খুশী হয়ে বলে, বেশ সেই ভালো। কোথায় আছ তুমি?

ক্যেরী বলে, ওয়ালডর্ফে।

—কখন আসব তা'হলে?

ক্যেরী বলে, এই তিনটে নাগাদ।

পরদিন ড্রুয়ে যথাসময়ে হাজির হলো। ক্যেরী কিন্তু নিমন্ত্রণ করে ফেলে অস্বস্তি বোধ করছিল। হাসিখুশী অমায়িক ড্রুয়ের ব্যবহারে সেটা সহজেই উড়ে গেল। ড্রুয়ে আগের মতই খুব গল্প করতে পারে।

এসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, বাঃ বেশ জমকালো হোটেলটা তো।

ক্যেরী বলে, হ্যাঁ, নতুন হয়েছে বটে, কিন্তু বেশ নামকরা হোটেল।

ড্রুয়ে আত্মবাদী একটু বেশী। সে শুরু করলো তার কাহিনী, কেমন করে উন্নতি করলো সে। এক সময় বললো, নিজে একটা ব্যবসা করবো এবার। এক বন্ধু দু'লাখ ডলার দেবে বলেছে।

ক্যেরী বেশ উপভোগ করছিল, ড্রুয়ের গল্পটা। হঠাৎ এক সময় ড্রুয়ে ব'লে বসলো, হ্যাঁ, হার্স্টউড্ কোথায় এখন?

ক্যেরী একটু থতমত খেয়ে গেলো প্রথম। তারপর সামলে নিয়ে বললো, নিউ-ইয়র্কেই আছে বোধ হয়। অনেকদিন দেখা হয়নি আমার সঙ্গে।

ড্রুয়ে একটু ভাবলো। ক্যেরীর উন্নতির পিছনে বোধ হয় হার্স্টউডের প্রভাবই রয়েছে, এই চিন্তাটায় কাঁটার মতো বিঁধছিল ওকে। ক্যেরীর কথা শুনে অস্বস্তিটা দূর হলো। ক্যেরী তাহলে ওর কাছ থেকে চলে এসেছে। যাক্।

ড্রুয়ে ভাবুকের মত বললো, ওরকম একটা কাজ করার মত ভুল আর কী হতে পারে।

কী বলছে ও বুঝতে পারে না ক্যেরী। বলে, কী কাজ?

ড্রুয়ে যেন হাত দিয়ে ঠেলে দেয় ক্যেরীর কথাটা। জানোই তো তুমি।

ক্যেরী বলে, না, আমি তো কিছু জানি না। কী বলছো তুমি, কী কাজটা?

—কেন, চিকাগো থেকে চলে আসার সময় যা করলো—

ক্যেরী বুঝতে পারে না কী বলছে সে। ওকে নিয়ে পালিয়ে আসার

কথাটাই কি বলছে ড্রুয়ে? বলে, কী বল্‌ছ তুমি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

ড্রুয়ে বিশ্বাস করে না ক্যেরী জানে না কিছু। বলে, পালিয়ে আসার সময় দশ হাজার ডলার নিয়ে এসেছিলো সে, জানতে না তুমি?

ক্যেরী স্তম্ভিত হয়ে যায়।—কী বললে? চুরি করেছিলো ও? কী বল্‌ছ তুমি?

ওর গলার স্বরে ড্রুয়ে অবাক হয়ে যায়।—সে কি, তুমি জানতে না?

ক্যেরী বলে, না, আমি কিছু জানি না।

ড্রুয়ে বলে, বাঃ, তুমি নিশ্চয়ই জানতে। কাগজেই তো বেরিয়েছিলো।

—কত নিয়েছিলো বললে?

—দশ হাজার ডলার। পরে অবশ্য প্রায় সবটাই সে ফেরৎ দিয়েছিলো শুনেছি।

ক্যেরী মেঝের কার্পেটের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চিকাগোর পর নিউ-ইয়র্কের এই ক'বছরের ঘটনাগুলো নতুন একটা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কত ছোট-খাট ক্ষুদ্র ঘটনা যেগুলো সে গ্রাহ্য করেনি, বোঝবার চেষ্টাও করেনি, সেগুলোর অর্থ আজ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ক্যেরী মনে মনে ভাবে হার্স্টউড্ টাকাগুলো যে নিয়েছিল সে শুধু তারই জন্যে। ঘৃণার বদলে একটা অনুকম্পা জাগে ওর মনে। হার্স্টউডের মাথার ওপরে কী একটা ভারী বোঝা চাপানো ছিল তা সে স্বপ্নেও বুঝতে পারে নি।

শুধু তারই জন্যে!

ডিনারে বসে ড্রুয়ের মেজাজটা খুলে যায়। সে ধরে নেয় ক্যেরীর মন আবার ফিরে আসছে তার দিকে। অনেক বড় হয়ে গেছে ক্যেরী। তবু তাকে পাওয়া বোধ হয় ওর পক্ষে অসম্ভব নয়। আঃ কী সৌভাগ্য তার। ক্যেরী। সুন্দরী, প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ক্যেরী। ক্যেরীর চেয়ে দুর্লভ কামনার বস্তু আর কী থাকতে পারে ড্রুয়ের কাছে?

সে বলে, আচ্ছা আভেরিতে যেদিন প্রথম থিয়েটারে নেমেছিলে, কেমন নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলে তুমি, মনে আছে তোমার?

ক্যোরী সেদিনের কথা ভেবে হাসে।

—তোমার সেদিনের অভিনয়ের চেয়ে ভালো আর কাউকে করতে দেখিনি আমি, জানো ক্যোরী।

একটু অনুযোগের সুরে বলে, আমি ভাবতাম এমনি করে আমাদের দিনগুলো আনন্দেই কেটে যাবে।

ক্যোরী বাধা দিয়ে বলে, ওসব কথা আর না তোলাই ভালো।

—আচ্ছা, আমার কথা একবার শুনবেও না তুমি—

ক্যোরী উঠে দাঁড়ায় এবার। বলে, আমার থিয়েটারে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখন উঠতে হবে আমাকে।

ড্রুয়ে অনুনয় করে, এক মিনিট, একটুখানি বসো আর। এখনো তো সময় আছে।

ক্যোরী নম্র ভাবেই বলে, না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হলো ড্রুয়েকে। গেটের কাছে এসে বললো, আবার কখন দেখা হবে, ক্যোরী ?

—হবে আবার পরে। আমি তো গ্রীষ্মকালটা এখানেই থাকবো। আচ্ছা গুড্‌নাইট।

— গুড্‌নাইট।

ড্রুয়ে বিমর্ষ হয়ে ভাবে। পুরোনো কামনাটা তীব্র হয়ে ওঠে, ক্যোরী এখন দুর্লভ, সে-জন্যেই বুঝি। ড্রুয়ে ভাবে ক্যোরী তার সঙ্গে ঠিক সদয় ব্যবহার করলো না। ক্যোরী কিন্তু ভাবছে অন্য কথা।

সেদিন রাত্রে ক্যোরী হার্স্টউডকে দেখে চিনতে পারলো না। হার্স্টউড্‌ ক্যাসিনোয় ঠিকই অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে।

পরের দিন রাত্রে ক্যোরী ঠিক মুখোমুখি পড়ে গেল হার্স্টউডের। সেদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েই অপেক্ষা করছিল হার্স্টউড্‌। দরকার হলে আজ সে কার্ডই পাঠাবে। প্রথমে অদ্ভুত চেহারার লোকটাকে দেখে ভয় পেয়ে গেলো ক্যোরী, কেমন ক্ষুধার্ত্ত, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হার্স্টউডের।

চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করে বললো সে, ক্যেরী, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার। শুনবে—

ফিরে দাঁড়িয়ে চিনতে পারলো এবার ক্যেরী। হার্স্টউডের বিরুদ্ধে যতকিছু ধারণাই তার ছিল, সব এই মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেলো। মনে পড়ে গেলো ড্রুয়ের কাছে শোনা কথাগুলো।

ক্যেরী বললো, জর্জ্জ, কী হয়েছে তোমার?

জর্জ্জ বললো, অসুখ করেছিলো। এই ক'দিন মাত্র হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি। আমাকে কিছু দাও, ক্যেরী। ক'টা টাকা অন্ততঃ দাও আমাকে, তোমাকে অনুনয় করছি আমি।

ক্যেরী বলে, নিশ্চয়ই দেবো।

অনেক কষ্টে ঠোঁটটা কামড়ে সে শান্ত হবার চেষ্টা করে। বলে, কিন্তু কী হয়েছে তোমার বলো তো।

পার্সটা খুলে সে যা টাকা ছিলো বার করলো, পাঁচ ডলার একখানা, আর দু'ডলারের দু'খানা নোট।

ক্যেরীর অতিরিক্ত করুণাটাকে যেন সহ্য করতে পারছে না হার্স্টউড্। একটু বিরক্তভাবেই বলে সে, বললাম না অসুখ করেছিলো আমার। ক্যেরীর কাছে টাকা চাইতে তার বুঝি সম্মানে বাধছে।

ক্যেরী বললো, এই নাও। উপস্থিত আমার কাছে এই ক'টাই ছিলো।

হার্স্টউড বলে, ওতেই চলবে এখন। তোমাকে একদিন ফেরৎ দিয়ে দেব ঠিক।

ক্যেরী ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, পথচারীরাও ওকে লক্ষ্য করছে। হার্স্টউডও বুঝতে পারে সেটা।

ক্যেরী বলে, কেন বলছো না আমাকে কী হয়েছে তোমার? কোথায় আছ তুমি এখন?—আর কী বলবে ভেবে পায়না সে।

হার্স্টউড জবাব দেয়, বাওয়ারিতে একটা ঘর নিয়ে আছি। সে তোমাকে বলেই বা কী হবে। এখন আমি ঠিক আছি।

ভাগ্যের করুণায় ক্যেরী অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছে, তার করুণা বা মমতা ভরা

প্রশ্ন হার্স্ট উডের বুকে জ্বালা ধরায়। বলে, যাও, তোমার কাজে চলে যাও এবার। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আর কখনো বিরক্ত করবো না।

কেয়ারী উত্তর দেবার চেষ্টা করলো, তার আগেই হার্স্ট উড্ চলতে শুরু করেছে।

ক'দিন ধরে হার্স্ট উডের শুষ্ক বীভৎস চেহারাটা ক্যেরীর মাথায় ঘুরতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এলো ছবিটা। ড্রুয়ে আর একবার এলো, কিন্তু এবার আর ক্যেরী দেখাই করলো না। বলে দিলো বয়টাকে, বলোগিয়ে, আমি নেই এখন ঘরে।

নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে ক্যেরী একা একা। গম্ভীর অদ্ভুত এক মেজাজ তার। সবাই অবাক হয়।

একদিন ম্যানেজার বললো ক্যেরীকে, আচ্ছা এবার গরম-কালটা লণ্ডনে গেলে কেমন হয়? কী মনে হয় পারবেন না লণ্ডনকে মাতিয়ে দিতে?

ক্যেরী বলে, উল্টোটাও তো হতে পারে, কে জানে? যা ভাল বোঝেন আপনি।

জুনে যাওয়া ঠিক হলো। যাওয়ার তাড়াতাড়িতে ক্যেরী হার্স্ট উডের কথা ভুলে গেলো। ড্রুয়ে আর হার্স্ট উড্ পরে দু'জনেই আবিষ্কার করলো, ক্যেরী নিউ-ইয়র্কে নেই।

খবরটা শুনে হোটেলের লবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠোঁট কামড়ালো খানিক্ষণ ড্রুয়ে। তারপর আপন মনে বললো, নাঃ সেদিন আর ফিরবে না।

তারপর নেমে যেতে যেতে বললো, কীই-বা এমন, ভারী তো। কতো মেয়ে পাওয়া যাবে। মনে মনে সে কিন্তু জানে কথাটা ঠিক নয়। ক্যেরীর মতো মেয়ে কতো পাওয়া যায় না।

হার্স্ট উডের দিনগুলো কাটছে কোনমতে টেনে টেনে। মাসখানেক একটা নাচ ঘরে চাকরী পেয়েছিলো সে। তারপর সেটা যেতে কোনদিন ভিক্ষে করে, কোনদিন না খেয়ে, পার্কে রাত কাটিয়ে দিনগুলো চলতে লাগলো।

শীতের মাঝামাঝি ক্যেরী ফিরে এলো, আবার ব্রডওয়ের থিয়েটারে নামলো সে নতুন একটা বইয়ে, হার্স্টউড্ জানতে পারলো না। ড্রুয়ে জেনেছিল কিন্তু সে আর সাহস করলো না দেখা করতে।

তেত্রিশ

নিউ-ইয়র্ক সহরে সেই ক্যাপ্টেনটির মতো আরো দয়ালু লোক আছে বৈকি। ফিফ্‌টিন্‌থ স্ট্রীটে ছিলো একটা আশ্রম। দরজার কাছে একটা বাক্‌স রাখা আছে, তার গায়ে লেখা থাকে 'দরিদ্রদের রোজ দুপুর বেলায় খেতে দেওয়া হয় এখানে'।

এমনি আছে আরো কয়েকটা। স্বচ্ছল সংসারী লোকদেব নজরে পড়ে না এই সব দাতব্য প্রতিষ্ঠান। যাদের প্রয়োজন তারা ঠিক খোঁজ রাখে। প্রায়ই সাহায্য প্রার্থীদেব ভিড জমে যায়। লাইন দিয়ে দাঁডাতে হয় ক্ষুধা নিবৃত্তিব জন্য। একটি মহিলা দাঁডিয়ে থাকেন, দরজায় গুণে গুণে লোক ঢোকান হিসাব মত। যেদিন বেশী লোক হয়ে যায়, কাউকে কাউকে ফিরে যেতে হয়। সুতরাং ভিড জমে যথাসময়ের আগে থেকেই।

ব্রডওয়ে আর টেন্‌থ স্ট্রীটের মোড়েও একটা রুটির দোকানের মালিক রোজ একখানা করে রুটি দান করেন দু'শোজন, অসহায়কে।

এই দু'টো জায়গাতেই হার্স্টউডকে প্রায় দেখা যায়।

সেদিন বেশ শীত পড়েছে, ভিক্ষা প্রার্থীরা এদিকে ওদিকে বারান্দার নীচে অপেক্ষা করে। থাক্ না এসে তো গেছেই, ঠাণ্ডায় এখন থেকে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? তারপর যখন লোক বাডতে শুরু করলো তখন রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াতে লাগলো ওরা। পিছনে না পড়ে যায় শেষে। সেভেন্‌থ এভিনিউ থেকে বেরিয়ে এসে হার্স্টউড্ একেবারে দরজার ঠিক পাশেই গিয়ে দাঁড়ালো। প্রতিবাদের একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠ্‌লো পিছন থেকে, ওরা আগে থেকে এসেছে।

হার্স্টউড্ একেবারে পিছন ফিরে তাকিয়ে আর সেখানে দাঁড়াতে সাহস করলো না, লাইনের শেষে এসে দাঁড়ালো। প্রতিবাদটা মিলিয়ে গেলে, আলাপ শুরু হলো আঃ দুপুর যে গড়িয়ে গেল।

—তা গেল তো। আমিই তো এসেছি এক ঘণ্টা হয়ে গেলো।

—উঃ কী শীতরে বাব্বা, কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ক'খুড়ি রুটি নিয়ে একটা লোক চলে গেলো রাস্তা দিয়ে।

একজন বললো, উঃ কী দামই হচ্ছে আজকাল জিনিষ-পত্তরের, মাগ্‌গীর বাজার।

—একটা যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধলে বাঁচা যেত, কী বলো হে?

লাইনটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। যারা আগে এসেছে তারা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে খুসী হয়, ভাগ্যিস্ আগে ভাগে এসে গেছি বাবা। একটু ঠেলা-ঠেলি শুরু হলো।—একজন বললো, এই ঠেলছো কেন হে, পঁচিশ পঁচিশ করে তো ঢুকবে বাবা একসঙ্গে। পাবে তো, তুমি তো সামনেই আছ।

স্থানচ্যুত হয়ে হার্স্টউডের মেজাজটা ভাল ছিল না। বললে, হুঁ।

গোলমালটা মাথার দিকেই, পিছনে অধিকাংশ লোকই অধীর আগ্রহে উদ্বিগ্ন হয়ে আছে, তাদের পর্য্যন্ত পৌঁছাবে কিনা কে জানে।

শেষ পর্য্যন্ত মহিলাটি এসে হুকুম দিলেন ঢোকবার। এক এক জন করে পঁচিশ জন ঢুকলো। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দরজাটা আটকে দিলেন মহিলাটি। ছ'জন সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে হার্স্টউড্ একজন।

খানিকপরে হার্স্টউডের পালা এলো। খেয়ে বেরিয়ে এলো হার্স্টউড্ গজ্‌গজ্ করতে করতে। হুঃ, এতকষ্ট এইটুকু খাওয়ার জন্যে। সে যেন রেগে গেছে।

আর একদিন রাত্রে ভাগ্যবানদের দলের বাইরে পড়ে গেল হার্স্টউড্। সে দিন আর খাওয়া হল না ওর। পাঁচ ছ'জন থাকতে ফুরিয়ে গেল দয়ার দান।

এমনি করে কতো দিন আর চল্‌বে? জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হার্স্টউড্ ভেবে দেখলো মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে তার। কতো মূল্যবান্ জীবন, ছেড়ে যাওয়া কী সহজ কথা? কিন্তু দিনের পর দিন এমনি করে বেঁচে থাকবার চেয়ে মৃত্যু বোধ হয় অনেক ভালো। জীবনের মূল্যটা কোথায়? অমূল্য জীবনের আজ কোন মূল্যই খুঁজে পায় না হার্স্টউড্।

এক একদিন যখন অবার জোটে না, শীতে অনাহারে যখন মৃত্যুর মুখোমুখি

এসে দাঁড়ায় সে তখন ভাবে, নিজে থেকেই চলে যাই মৃত্যুর কোলে। জীবনের কী আছে, ওকে দেবার? অনাহার, অসম্মান, গ্লানি, যন্ত্রণা। এই তো শুধু।

রাস্তার কাগজ কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেখে সে ক্যেরীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। গ্রীষ্ম বর্ষা দু'টোই কেটে গেল, ক্যেরীর খোঁজ মিললো না।

কাগজ পড়তে কষ্ট হয় এখন। চোখ দুটো জ্বালা করে, জল আসে। স্তিমিত হয়ে এসেছে দৃষ্টিশক্তি। শেষ পর্য্যন্ত কাগজ পড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিলো সে। সবই শিথিল অকর্ম্মণ্য হয়ে আসছে। একমাত্র আনন্দ এখন ওর শোবার জায়গা পেলে তন্দ্রায় ঢুলে পডা। হার্স্টউডের চেহারা দেখলে আজকাল লোকে অথর্ব্ব পেশাদার ভিখিরী ছাডা আর কিছু ভাবতে পারে না।

পুলিশে ধরে নিয়ে যাবার ভয় দেখায়, একখানা রুটি দিয়েই ভাগিয়ে দেয় হোটেলওয়ালারা, পথচারীরা 'ভাগ্ ভাগ্' বলে খেঁকিয়ে ওঠে।

শেষ পর্য্যন্ত সে ঠিক করে ফেললো, না আর না। দাঁত খিঁচুনি আর তাড়া খেয়ে খেয়ে মনটা খিঁচড়ে গেছে ওর। সারাদিন সবাই তাড়াই দিয়েছে ওকে, একটা সেণ্টও কেউ দিলো না। ও যেন একটা দুষিত রোগে ভুগ্ছে, ছোঁয়াচ বাঁচাতে চায় সবাই।

শেষবারের মত বললো সে, স্যার, কিছু দেবেন দয়া করে? কিছু খাই নি আমি স্যার, ভগবান্ আপনার ভালো করবেন।

লোকটি খেঁকিয়ে উঠলো, ভাগ্ বেটা, ভাগ্, কী হবে তোকে দিয়ে, কাজ করতে পারিস্ না, কুঁড়ে হতভাগা কোথাকার। এক পয়সা দেবো না তোকে।

হাত দুটো গুটিয়ে নিয়ে পকেটে পুরলো হার্স্টউড্। চোখে জল এসে গেলো ওর।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে। কোন কাজের নই, কুঁড়ে হয়ে গেছি আমি এখন। একদিন সবই ছিল আমার, যখন টাকা ছিল। যাক্গে, মরুক্গে, কী হবে আর বেঁচে—।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো হার্স্টউড্ বাওয়ারির দিকে। গ্যাস্টা জ্বালিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলেই বেশ মরে যাওয়া যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। সে-ও তাই করবে।

একটা হোটেলের কথা মনে পড়লো, ছোট ছোট একানে গ্যাসওয়ালা ঘর। বাঃ, ওখানেই যাবে সে, এই সহজ রাস্তা মরবার। কিন্তু তার জন্তেও পয়সা চাই। পনের সেণ্ট ভাড়া লাগবে। তার কাছে তো পনের সেণ্ট নেই। ভাবতে ভাবতে রাস্তায় চলতে চলতে একটি সুবেশ ভদ্রলোককে দেখে সাহস করে এগিয়ে গেলো ও।—স্যার কিছু সাহায্য করবেন আমাকে?

দশ সেণ্টই দেবার ইচ্ছা ছিলো ভদ্রলোকের। কিন্তু অত খুচরো নেই। শেষ পর্য্যন্ত পঁচিশ সেণ্টই দিয়ে দিলেন ওকে নিষ্কৃতি পাবার জন্তে।—যাও, কেটে পড়ো এবার।

চক্‌চকে সিকিটা পেয়ে খুসী হয়েছে হার্স্টউড্‌। বেশ ক্ষিদে লেগেছে, একখানা রুটি কিনে, তারপর দশ সেণ্ট দিয়ে আজকের রাতটা বেশ আরামে কাটিয়ে দিতে পারে সে। রুটি আর বিছানার কথা মনে হতে মরবার কথা ভুলে গেলো ও। যখন অপমান ছাডা আর কিছুই পায় না তখনি মরবার কথা ভাবে হার্স্টউড্‌।

একদিন ভীষণ শীত পড়লো। বৃষ্টির পরে বরফ পডা শুরু হলো। সেদিন রাত পর্য্যন্ত ঘুরে মাত্র দশটা সেণ্ট জোগাড় হয়েছে। কপালটা খারাপই যাচ্ছে ক'দিন থেকে। সন্ধ্যা বেলা বুলেভার্ড আর সিক্সথ্‌ এভিনিউর কাছে ঘুরতে ঘুরতে জুতোটা বেশ শপ্‌শপে হয়ে উঠলো। তলার চামড়া অর্দ্ধেক উঠে গেছে, কোনরকমে টেনে টেনে চলে হার্স্টউড্‌। পুরানো পাতলা কোটটা কান পর্য্যন্ত উঠিয়ে নিয়েছে, টুপিটা টেনে টেনে কান ঢাকতে গিয়ে উল্টো হয়ে গেছে, হাত দুটো পকেটে। এমনি অবস্থায় হাটছে হার্স্টউড্‌।

আপন মনে বলে, ব্রডওয়ে পর্য্যন্ত যাই তো। ফোর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীটে আলো-গুলো জ্বলে উঠেছে, প্রমোদকামী নরনারীর ভিড় শুরু হয়ে গেছে। উজ্জ্বল কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যায় রেস্টুরেণ্টের আড্ডা। গাড়ীগুলোর ভীড়ে রাস্তা চলাই দায়।

এমনি ক্ষুধার্ত্ত দেহ নিয়ে এখানে আসাটাই অন্যায় হয়েছে ওর। পার্থক্যটা বড় বেশী চোখে বাজে।

হার্স্টউড্‌ মনে মনে বললো, আর কেন, এবার তো চুকিয়ে দিলেই হয়। এভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আর লাভ কী?

চেহারা আর পোষাকটা এমনি বীভৎস হয়ে গেছে যে লোকে অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকায় ওর দিকে। ক'জন পুলিশ লক্ষ্য রাখছে ওর ওপর, ভিক্ষে না করে।

বোকার মত তাকায় হার্স্টউড্ উজ্জ্বল রেস্টুরেন্টের সুসজ্জিত টেবিলে সাজানো খাবারগুলোর দিকে। প্যান্ট ভিজে গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে ওর। শপ্‌শপ্ করছে, একটা বিশ্রী আওয়াজ হচ্ছে চলতে গেলে।

আপন মনে বলে, খাও, খাও। তোমরাই খাও। আর কারো দরকার নেই খাবার।

এরপর গলাটা আরো বসে গেলো ওর—উঃ কী ভীষণ শীত। সাংঘাতিক।

ক্যেরীর নামটা জ্বলছিল আগুনের অক্ষরে। "ক্যেরী ম্যাডেণ্ডা" তারপর পড়া যায়, ক্যাসিনো কোম্পানীর নামটা। ক্যেরী নামের আলোটায় উজ্জ্বল হয়ে গেছে ব্রডওয়ে থার্টিনাইন্‌থ স্ট্রীটের মোড়টা। হার্স্টউডেরও নজরে পড়লো। পাশেই ক্যেরীর একটা লিথোগ্রাফ করা ছবি। যেন জীবন্ত, এতো বড়ো।

হার্স্টউড্ একমুহূর্ত্ত তাকিয়ে থাকে, কাঁধটা খাটো করে, যেন একটা পোকা কামড়াচ্ছে ওকে। এতই পরিশ্রান্ত জীর্ণ যে ওর ঠিক পরিষ্কার বোধগম্য হয় না ব্যাপারটা। মনটা ওর বিবশ হয়ে গেছে।

শেষে ক্যেরীকে বলে সে, তাহলে তুমি আজকাল এই হয়েছ। তা বেশ, আমি তোমার উপযুক্ত ছিলাম না। না। কী বলো। তা বেশ ভালো।

একটু দাঁড়িয়ে সে ঠিকভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করে। না, মনটা ওর বশে নেই আর, চিন্তা করার মত শক্তি নেই। টাকার কথাই বোধ হয় ভাবছিল সে। বললে, অনেক তো আছে ওর। কিছু দিক না আমাকে। পাশের দরজার দিকে পা বাড়ালো সে। তারপর ভুলে গেল কী জন্যে কোথায় যাচ্ছিল ওদিকে। থমকে দাঁড়িয়ে হাত দুটো পকেটের মধ্যে আরো ভিতরে চালিয়ে দিলো, যদি একটু গরম হয়। হঠাৎ মনে পড়লো, হ্যাঁ স্টেজের দরজার দিকে যাচ্ছিল ও।

দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল ও। গেট্‌ম্যানটা তাকালো ওর দিকে।—কী হে, তুমি আবার কী মনে করে চাঁদ, এখানে কেন? যা ভাগ্ বলছি।

—আমি একবার মিস্ ম্যাডেওার সঙ্গে দেখা করবো।

—তাই নাকি, বাঃ খোকা বাঃ। গেট্‌ম্যান মজা পেয়ে হাসে। তারপর এক ধমক দেয় জোরে, ভাগ্ বল্‌ছি শালা।

হার্স্টউড্ নড়তে চায় না দেখে ঠেলে বার করে দেয় ওকে। হার্স্টউড্ বোঝাবার চেষ্টা করে, দেখো ভাই, সত্যি বল্‌ছি, মিস্ ম্যাডেওার সঙ্গে দেখা করবো আমি। আমি ঠিক ভালো লোক-ভাই—দাও না একটু ছেড়ে—

আর একটা ধাক্কা দিয়ে হার্স্টউডকে বার করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় গেট্‌ম্যানটা, হার্স্টউড্ পিছলে পড়ে যায় বরফের ওপরে। বেশ চোট্ লেগেছে। অস্পষ্ট একটা লজ্জা অসম্মান বোধ করে সে। কেঁদে ফেলে হার্স্টউড্। তারপর গালাগালি দেয়, হারামজাদা, ছোটলোক কুকুর কোথাকার, তোর মত দশ-বিশটা চাকর ছিল আমার আগে জানিস্।

ক্যেরীর বিরুদ্ধে ওর হিংস্র আক্রোশ জেগে ওঠে একবার, তারপর সেটা পরক্ষণেই মিলিয়ে যায়। সব ভুলে যায় ও।

একটু পরে বলে, আমাকে খেতে দেওয়া উচিত ওর। আমি তো কতদিন খাইয়েছি ওকে।

হতাশমনে আবার ফিরতে লাগলো সে ব্রডওয়ের দিকে। চলতে চলতে অভ্যাস বশে যন্ত্রের মত ভিক্ষা চায় সে। কখনো বা কাঁদে। চিন্তার খেই হারিয়ে এই মাত্র কী ভাবছিল, কী করতে যাচ্ছিল ভুলে যায় সে। বল্গাহীন মনটার, চিন্তাগুলোর কোন নাগাল পায় না সে।

কয়েকদিন বাদে এমনি একটা রাতে সিদ্ধান্ত করে ফেললো হার্স্টউড্। কেমন করে কে জানে! চারটে বাজতে না বাজতেই রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে মেঘে মেঘে। ভারী বরফ পড়তে শুরু হয়েছে। বাতাসটা তীক্ষ্ণ বেগে ঘা মারছে এখানে ওখানে এলোমেলো, বরফগুলো যেন চাঁই হয়ে নেমে আসছে মাটিতে। দু'ইঞ্চি বরফ জমে গেল। মসৃন কঠিন বরফের কার্পেট পেতে দিয়েছে কে রাস্তার ওপর। সাদা ধবধবে নয়, গাড়ী আর মানুষের চলাচলে আধময়লা তামাটে সীসে রঙ হয়ে যাচ্ছে কার্পেটটা। বাওয়ারির দিকে ফিরে যাচ্ছে হতভাগ্য মানুষগুলো কান পর্য্যন্ত টুপি নামিয়ে আলস্টারটাকে টেনে। ব্রডওয়েতে সুখী মানুষরা যাচ্ছে

হোটেলে থিয়েটারে, আড্ডায়। গাড়ীগুলোতে বাতি জলে গেছে এখন থেকেই, আওয়াজটা তত প্রখর নয়। চাকাগুলোর ওপরও বরফ জমছে, ঝরছে।

ক্যেরী তার ওয়ালডর্ফের গরম ঘরে আরাম করে শুয়ে শুয়ে 'পেরি গোরিয়ো' পড়ছে। কে একজন বলেছে পড়া উচিত তার বইটা। পড়তে পড়তে আগ্রহ জাগে বুঝতে পারে সে আগে কীই বা পড়েছে। কত তুচ্ছ তার জ্ঞান বিদ্যা।

খানিক পরে ক্লান্ত লাগতে উঠে আসে জানালার ধারে। তাকিয়ে দেখে ফিফ্‌থ এভিনিউর গাড়ীগুলো।

লোলাকে বলে, কী বিশ্রী বল্‌তো।

লোলা বলে, সাংঘাতিক, বলিস্ না আর। যা বরফ পড়ছে বোধহয় স্লেজে চড়তে হবে।

ক্যেরীর মনে তখনো ফাদার গোরিয়োর দুর্দশার কথা ভাসছে। সে বলে, তুই বুঝি শুধু তাই ভাবছিস্। আচ্ছা আজ রাত্রে যাদের শোবার জায়গা নেই তাদের কী অবস্থা বল্‌তো।

লোলা বলে, ভাবি তো, দুঃখও হয়। কিন্তু কী করতে পারি বল্, আমার আর কী বা আছে।

ক্যেরী হাসলো।

—তোর থাকলেও তুই করতিস্ না কিছু।

—নিশ্চয়ই করতাম। কিন্তু আমার কষ্টের সময় কেউ একপয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি আমাকে জানিস্।

শীতের ঝড়টাকে লক্ষ্য করে ক্যেরী। বলে, কী সাংঘাতিক, নয় রে?

লোলা খিল খিল করে হেসে ওঠে, দেখ দেখ, কীরকম আছাড় খেলো লোকটা। পড়ে গেলে কেমন দেখায় বোকার মত—

ক্যেরী অন্যমনস্কভাবে বলে, আজ ঢাকা গাড়ী নিতে হবে একটা।

দামী আলস্টার থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে ড্রুয়ে এসে ঢুকলো ইম্পিরিয়াল হোটেলের লবীতে। আজকের দিনে তাড়াতাড়িই অফিস থেকে ফিরেছে সে।

এদিকে হোটেলে একা একা কী মন বসে ?• বরফ বাদল আর বিমর্ষতায় হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ছটফট করে সে। ভালো ডিনার, যুবতী মেয়ে, থিয়েটার এর চেয়ে বেশী আর কী চায় ড্রুয়ে ?

লবীর দিকে তাকিয়ে একজনকে দেখে এগিয়ে গেল ও, আরে হ্যারী যে, তারপর আছ কেমন ?

—এই আছি আর কি, চলে যাচ্ছে।

—বিশ্রী দিনটা, কী বলো।

—তাইতো বসে বসে ভাবছি যাওয়া যায় কোথায়।

ড্রুয়ে বলে, চলো আমার সঙ্গে, একখানা জিনিষ যা দেখাবো।

—কী জিনিষ হে ?

—এই ফোর্টিএইট্‌থ স্ট্রীটে, দুটো কোরাস-গার্ল যা আছে মাইরি। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

—ডিনারে নিয়ে এলে কেমন হয় ?

—নিশ্চয়ই। বসো তুমি একটু, স্যুট্‌টা পাল্টে আসি উপর থেকে।

ড্রুয়ের বন্ধুটি বলে, বেশ, আমি এই সেলুনে রইলাম। দাড়িটা চট্‌ করে কামিয়ে নিই ততক্ষণ।

—বহুৎ আচ্ছা। বলে শীষ্‌ দিতে দিতে উঠে গেলো ড্রুয়ে।

চল্লিশ মাইল বেগে দৌড়চ্ছে ট্রেনটা। তারই একটি কামরায় বসে তাস খেলছেন তিনজন।

একটা বেয়ারা হেঁকে গেলো, খানা তৈয়ার।

অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েটি তাসটা ঠেলে দিয়ে বললো, আমার আর ভাল লাগছে না।

মেয়েটির স্বামী বললো, তাহলে চলো ডিনারটা সেরে আসি।

মেয়েটি বললো, উঁহু এখন না।

এই বয়সেও মেয়েটির মা পোষাক সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার, তাঁর দিকে তাকালেই

বোঝা যায় সেটা। তিনি বল্লেন, জেসিকা, টাইয়ের পিন্‌টা ঠিক করে দাও, উড়ে যাচ্ছে।

জেসিকা পিন্‌টা ঠিক করে নিয়ে চুলগুলো একটু হাত দিয়ে গুছিয়ে নিলো।

জেসিকার স্বামী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এত দেখেও আশ মেটে না। একটু পরে বললো,

এরকম ওয়েদার বেশীদিন পোয়াতে হবে না আমাদের। রোমে পৌঁছে যাবো হপ্তা দুয়েকের মধ্যে।

মিসেস্ হার্স্টউড্ চেয়ারটায় আরাম করে বসে হাসলেন। ধনী কৃতী ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারার মধ্যে আনন্দ আছে বৈকি? জেসিকার স্বামীর সম্পত্তির পরিমাণটা তিনি নিজে চোখেই তো দেখে শুনে নিয়েছেন।

জেসিকা বললো, এমন ঝড় বাদল হলে জাহাজটা ঠিক ছাড়বে তো?

ওর স্বামী বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কিছু ভয় নেই। বৃষ্টিতে ওদের সময় পাল্টায় না।

চিকাগোরই এক ব্যাঙ্কারের ছেলে এইসময় করিডর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এলো। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল সে জেসিকাকে। জেসিকা মুখটা ফিরিয়ে নিলো। এমন কিছু লজ্জায় নয়, সৌন্দর্য্যের গর্ব্বটা চরিতার্থ করার জন্যে।

বাওয়ারির কাছাকাছি একটা গলির মুখে চারতলা বাড়ীর নীচে দাঁড়িয়ে আছে হার্স্টউড্। দামী কোট্‌টা এখন ধুলো ময়লা কাদায় চটের মত দেখাচ্ছে প্যাণ্টটা দুটো লম্বা থলের মতো। ভিড়ের মধ্যে অপেক্ষা করছে সে, মাঝে মাঝে পাদুটো ঠুক্‌ছে একটু গরম যদি হয়। ভিতরে যাবার হুকুম হয়নি, এখনো এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধীর ভাবে মিনিট গুনছে সবাই। এই ভিড়টায় একটাও সুস্থ লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না চেষ্টা করলে। রোগা জীর্ণ খিট্‌খিটে মানুষগুলো কন্‌কনে বাতাস আর বরফের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ঠেলাঠেলি করছে। অধিকাংশেরই কোটের হাত ছেঁড়া। হাতগুলো দেখা যাচ্ছে ঠাণ্ডায় বরফে জমে লাল হয়ে গেছে।

মিনিটে মিনিটে ভিড়টা বাড়ছে। একটা গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। গয়

নয়, গল্প কয়ার মত মেজাজ কারো নেই এই বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে। গালাগালি করে ওরা ভাগ্যকে, নিজেদের, হোটেলওয়ালাকে।

—ও শালারা একটু তাড়াতাড়ি করতে পারে না?

—শূয়োরের বাচ্চা পুলিশটার মরণ দেখেছ, ব্যাটার যেন শীত নেই।

—একএকবার মনে হয় দূর ছাই খুনজখম চুরি করে সিং সিং জেলখানায় ঢুকে পড়তে পারলেও এর চেয়ে ভালো ছিল।

একটা দমকা বাতাস আসতে সবাই কুঁকড়ে গায়ে গায়ে মিশে যাবার চেষ্টা করে। ঝগড়া নেই, রাগ নেই, কোন অনুনয় নেই। কেউ আপত্তি করে না, দয়া নয়, এ একটা বিষণ্ণ সহিষ্ণুতা।

একটা গাড়ী পাশ দিয়ে চলে গেল টুং টাং শব্দ করতে করতে। একজন বলে উঠলো, ও শালাদের কাছে শীতের বাবাও যায় না।

—যাবে কেন টাকা আছে যে।

একজন চেঁচিয়ে ওঠে, মর শালারা, মব্, মব্। গাড়ীটা তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

আরো রাত এগিয়ে গেল। দু'একজন পথচারী দ্রুতগতিতে চলে যায়। হতভাগ্য লোকগুলি তাকিয়ে দেখে শার্সির ভেতর দিয়ে আলো আগুন উত্তাপের হাতছানি। কেউ নড়ে না।

ভাঙা গলায় একজন বললো, আজ কী খুলবে না নাকি ওরা।

বন্ধ দরজাটার দিকে তাকায় সবাই করুণ দৃষ্টিতে। বোকা বোবা পশুর মত যেন আঁচড়ে গোঁ গোঁ করে খুলতে চায় বন্ধ দরজাটা। কিন্তু কেউ নড়ে না, শুধু দৃষ্টি দিয়েই খোলাতে চায়।

হার্স্টউড্ দলটার অনেক পিছনে পড়ে গেছে একেবারে খোলা আকাশের নীচে। মাথাটা নামিয়ে ঘাড় কুঁজো করে প্রকৃতির নিষ্ঠুরতা থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে।

দরজার ওপরের কাঁচ দিয়ে এবার একটা আলো দেখা গেল। একটা গুঞ্জন-ধ্বনি উঠলো, আসছে।

সত্যিই দরজাটা খুললো এবার। একমুহূর্ত একটু ঠেলাঠেলি হলো তারপর সবাই ভিতরে ঢুকে গেলো। খাবার নয় শুধু শোওয়ার জায়গা।

পনের সেণ্ট দিয়ে হার্স্টউড্ কোনরকমে টলতে টলতে পা টেনে টেনে চলে গেলো ওর ঘরে। নোংরা ভাপ্সা ঘুপ্চি একটা ছোট্ট ঘর। একটা গ্যাস জ্বলছে মিইয়ে মিইয়ে। পনের সেণ্টে এইটুকুই যা বাড়তি পাওয়া যায়।

খিল এঁটে ভিজে কোট্টা খুলে ফেলে দরজার ফাটলটার মধ্যে গুঁজে রাখলো সে। সোয়েটারটাও খুললো। টুপিটা ছুঁড়ে দিলো টেবিলটার ওপর। তারপর জুতোটা টেনে খুলে ফেলে ধপ্ করে শুয়ে পড়লো।

মনে হলো একটু যেন কী ভাবলো হার্স্টউড্। উঠে গ্যাসটা উসকে দিলে জোরে। তারপর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে বললো, কী হবে বেঁচে? এই তো জীবন!

তারপর শুয়ে পড়লো হার্স্টউড্।

কৈশোরে ক্যেরীর যা কামনা ছিল সবই প্রায় পেয়েছে সে এখন। সবই কিনা বলা যায় না, অনেকখানিই। মানুষ তার আকাঙ্ক্ষার যতটুকু সার্থকতা পায়, ততটুকুই তো সে পেয়েছে। ভালো পোষাক, নিজের গাড়ী, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা সবই আছে। বন্ধু ভক্তের দলও আছে। যারা ওর সাফল্যকে অভিন[illegible] জানায়, ওর সঙ্গে মিশতে পেলে খুসী হয়, গর্ব্বিত হয় এমন অসংখ্য পরিচিত অপরিচিতের দলও তার আছে। একদিন সে এরই স্বপ্ন দেখতো। প্রশংসা, প্রতিপত্তি, খ্যাতি সবই পেয়েছে সে, কিন্তু এসব তুচ্ছ এখন তার কাছে। একাকীত্ব ঘোচেনি তার। একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়ে গেছে ওর জীবনে। একা, একা বড় নিঃসঙ্গ সে। তৃপ্তি নেই।

কাজ থাকে না যখন, চেয়ারটায় বসে দোলে সে। অন্যমনস্কভাবে গান গায়, কিসের যেন স্বপ্ন দেখে।

জীবনের দুটো দিক আছে, একটা বুদ্ধিগত আর একটা আবেগজাত। একটা মন যুক্তি করে বোঝে, তর্ক করে, আর একটা শুধু অনুভব করে।

সেনাপতি, রাজনীতিক প্রথম স্তরের মানুষ, বুদ্ধি নিয়ে কারবার ওদের। কবি ভাবুক বা শিল্পী কিন্তু জীবনটাকে দেখে আবেগ নিয়ে, অনুভূতি দিয়ে।

আদর্শ আকাঙ্ক্ষার কোন পরিমাপ নেই। মানুষ আজ পর্য্যন্ত চিন্তার পরিধি খুঁজে পায়নি। আবেগপ্রবণ মানুষের কাছে পৃথিবীর নিয়মকানুন নীতি-শৃঙ্খলার কোন মূল্য নেই। বড় কঠিন দুনিয়ার নিয়ম, বড় কঠোর তার নীতি। তার বশে চলতে পারে না আবেগবৃত্তি মানুষ। সৌন্দর্য্যের পদধ্বনি তাকে হাতছানি দেয়, এক পলকের দৃষ্টির জন্য সে ছুটে চলে, শেষে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে।

ক্যোরীও এমনি হাতছানির পিছনে ছুটেছে। ক্লান্ত দেহে অবসন্ন মন নিয়ে এখনো সে ছুটছে।

অন্যমনস্কভাবে দুলছে, স্বপ্ন দেখছে, গান গাইছে ক্যোরী রকিং চেয়ারটায় বসে বসে।

সমাপ্ত